ফখরুল মুহাদ্দেসীন- মাওলানা মমতায উদ্দীন-এর জীবন দর্শন ও ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর অবদান

মুহাম্মদ ঈসা কাদেরী

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফখরুল মুহাদ্দেসীন-মাওলানা মমতায উদ্দীন-এর জীবন দর্শন ও ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর অবদান

এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

403534

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধানে ঃ
ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
সিনিয়র অধ্যাপক,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপস্থাপনায় ঃ
মুহাম্মদ ঈসা কাদেরী
এম. ফিল. গবেষক,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ, ঢাকা
১৭ জুলাই, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ
২ শ্রাবণ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ
১০ জমাদিউস সানি, ১৪২৬ হিজরী

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পিএইচ.ডি. (লন্ডন), এম.এ. (ডবল), বি.এ. অনার্স (ঢাকা),
এম.এম. (ঢাকা), এফ.আর.এ.এস

সিনিয়র অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
ইসলামিক ষ্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

دكتور محمد حبيب الرحمن شودرى

الاستاذ الكبير والرئيس السابق
قسم الدراسات الاسلامية ومقارنة الاديان
جامعة داكا، بنغلاديش

DR. A.B.M. HABIBUR RAHMAN CHOWDURY
Ph.D. (London), M. A. (Double), B. A. Hons (Dhaka).
M. M. (Dhaka), F. R. A. S

Senior Prof. & Ex. Chairman
Dept. Of Islamic Studies & Comparative Religion
University Of Dhaka, Bangladesh
Phone : Off. - 505161/277, 505710
: Res. - 862992
Fax : 880-2-835342 831962

Date ....

Ref ....

প্রত্যয়ন পত্র

মুহাম্মদ ‘ঈসা কাদেরী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য পেশকৃত “ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন-এর জীবন দর্শন ও ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর অবদান” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে মুহাম্মদ ‘ঈসা কাদেরী-এর নিজস্ব এবং একক গবেষণা কর্ম। এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে বা এ বিষয়ে এম. ফিল./ পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

403584

এ গবেষণা সন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

এ.হ.র.চৌধুরী ২৭/৭/০৫
....
ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
সিনিয়র অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শব্দসংক্ষেপ নির্দেশনা

অনু ঃ	অনুবাদ
অনূ ঃ	অনূদিত
আ.	আরবী
(আঃ)	‘আলায়হিস সালাম
আনুঃ	আনুমানিক
ইঃ	ইত্যাদি
ইং	ইংরেজী
ঐ.	Ibid
ক	a
খ	b
খ.	খণ্ড
খ্রীঃ/খ্রী.	খ্রীষ্টাব্দ
খ্রী.পূ	খ্রীষ্ট পূর্ব
জ./জঃ	জন্ম
ড.	ডক্টর (পি-এইচ. ডি)
ডাঃ	ডাক্তার (চিকিৎসক)
দ্র.	দ্রষ্টব্য
প.	পরবর্তী
প.দ্র.	পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য
পাণ্ডু.	পাণ্ডুলিপি
পৃঃ/পৃ.	পৃষ্ঠা
বিস্তারিত দ্র.	বিস্তারিত দ্রষ্টব্য
মৃ.	মৃত, মৃত্যু
(রহঃ)	রাহমাতুল্লাহি ‘আলায়হি
(রাঃ)	রাদিআল্লাহু আনহু
শিরো.	শিরোনাম
(সাঃ).	সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং	সংস্করণ
সম্পা	সম্পাদিত
হিঃ/হি.	হিজরী
১ম. খ. ৫০	প্রথম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৪ ঃ ১০	সূরা ৪-এর আয়াত-১০ (কুরআনের ক্ষেত্রে)
১৪২৬/২০০৫	হিজরী ১৪২৬ সন মুতাবিক ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ
তা ঃ বিঃ/তা. বি.	তারীখ বিহীন

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

أ	a	আ
إ	i	ই
أُ	u	উ
ب	b	ব
پ	p	প
ت	t	ত
ث	th	ছ
ج	di,j	জ
چ	c	চ
ح	h	হ
خ	kh	খ
د	d	দ
ڈ	d'	ড
ذ	dh	য
ر	r	র
ڑ	'r	ড়
ز	z	য
ژ	zh	ঝ
س	s	স
ش	sh	শ
ص	s	স
ض	d	দ/য

ط	t	ত
ظ	z	জ/য
ع		'
غ	gh	গ
ف	f	ফ
ق	k.q	ক/ক্ব
ك	k	ক
گ	g	গ
ل	l	ল
م	m	ম
ن	n	ণ/ন
ه	h	হ
و	w	ও/ভ/ব
ی	y	য়
ي	ay	ে
ء		'
ـَ		আ
ـِ		ই/ি
ـُ		উ
ـَ+ا		আ
ـِ+ی		ঈ
ـُ+و		ঊ

অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি

(ক) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখেছেন বা লিখিয়েছেন তাঁর নামের সে বানানই রক্ষিত হয়েছে।

(খ) যে সব আরবী, ফার্সী ও উর্দু শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান-রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেগুলোকে সাধারণতঃ প্রচলিত আকারেই রাখা হয়েছে। যথা-আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, ইমাম, ইন্তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, অযু, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির, কাযী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, খান, গযব, জনাব, জিহাদ, তওবা, তাওরাত, তরজমা, তাশ্‌রীফ, তাস্‌বীহ, তারীফ, দওলত (দৌলত), দফতর, দরূদ, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফযর, মাওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্‌জিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা, মুতাবিক মুনাফিক, মৌলবী, যাকাত, রওযা, রমযান, রহমত, শহীদ, সালাম, সুন্নাত, সুপারিশ, মুসাফির, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, হুকুম ইত্যাদি।

বাংলা ও হিজরী 'অব্দ' গুলোর সমপরিমাণ খ্রীষ্টাব্দ নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

(১) বঙ্গাব্দের সমপরিমাণ খ্রীষ্টাব্দ পেতে হলে প্রাপ্ত বঙ্গাব্দের সাথে ৫৯৩ যোগ করতে হবে, যেমন, ১৩৮৬ বাং + ৫৯৩ = ১৯৭৯ খ্রীঃ

(২) হিজরী অব্দের সমপরিমাণ খ্রীষ্টাব্দ পেতে হলে নিম্নোক্ত সূত্রে ফেলে অংক কষে বের করতে হবে, যেমন,

$$A.H - \frac{3 \times A.H.}{100} + 621 = A.D$$

(Fractions being neglected)

$$\text{হিঃ ১০৮৪} - \frac{৩ \times ১০৮৪}{১০০} + \text{৬২১ খ্রীঃ} = \text{১৬৭২/১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।}$$

(তথ্যসূত্র ঃ ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, মনীষা-মঞ্জুষা, ৩য় খণ্ড, মুক্তধারা, ৭৪, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ঃ ১৯৮৪ খ্রীঃ, পৃঃ ৫০-৫১, ৫৩)

সূচী নির্দেশিকা

পৃষ্ঠা নং

ভূমিকা ৯

প্রথম অধ্যায়
ভৌগোলিক বিবরণ ১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নোয়াখালী জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ১৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ উপজেলা সমূহের পরিচিতি ২০
নোয়াখালী সদর উপজেলা ২০
বেগমগঞ্জ উপজেলা ২৩
চাটখিল উপজেলা ২৬
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ২৮
হাতিয়া উপজেলা ৩১
সেনবাগ উপজেলা ৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নোয়াখালী জেলায় ইসলাম প্রচারে আলেম ওলামাদের ভূমিকা ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর যুগ
(১৮৮৬-১৯৭৪) ৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা ৪০
ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনামল ৪০
পাকিস্তানী শাসনামল ৪৩
বাংলাদেশী শাসনামল ৪৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থা ৪৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সমসাময়িক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ৪৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থা ৪৮
ধর্মীয় শিক্ষা ৪৮
পাশ্চাত্য শিক্ষা ৫৬
সমন্বয়ীয় শিক্ষা ৬২

তৃতীয় অধ্যায়
মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর জন্ম ও শিক্ষা ৬৫

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বংশ পরিচয় ৬৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জন্ম ও শৈশবকাল ৬৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ প্রাথমিক শিক্ষা ৬৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ৭০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বৃত্তি লাভ ৭৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ইংরেজী শিক্ষা ৭৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ শিক্ষকবৃন্দ ৭৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ বৈবাহিক অবস্থা ৯৬

চতুর্থ অধ্যায়
মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর কর্মজীবন ৯৭

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ কলকাতা কেন্দ্রীক ৯৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ঢাকা কেন্দ্রীক ১০১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ছাত্রবৃন্দ ১০২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সহকর্মীবৃন্দ ১৩৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ব্যক্তি জীবনে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) ১৫৩
জীবন যাপন পদ্ধতি ১৫৩
স্বভাব চরিত্র ১৫৪
সমাজ সেবা ১৫৫
ইন্তেকাল ১৫৬

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর অবদান ১৫৭

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ শিক্ষা বিস্তারে অবদান ১৫৮
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ১৫৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পাঠদান পদ্ধতি ১৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ্রন্থ রচনা ১৬১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী সংরক্ষণ ও
তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ পুস্তকসমূহ ১৬২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা ১৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
আধ্যাত্মিক জীবন ১৬৮

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আধ্যাত্মিক সাধক ১৬৯
দ্বিতীয পরিচ্ছেদ ঃ ইলমে মা'রিফাতের পরিচয় ১৭১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পরীবাগের শাহ্ সাহেবের সাথে তাঁর
সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ লাভ ১৭২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ খেযেরী তরীকার বৈশিষ্ট্য ১৭৪
তাঁর উপদেশাবলী ১৭৫

সপ্তম অধ্যায়
তাঁর গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা ১৭৭

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার ২১২

গ্রন্থপঞ্জী ২১৪

আলোকচিত্র ২১৮

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে 'আলিমগণই আল্লাহ তা'আলাকে সঠিকভাবে ভয় করেন।"[১] তাঁরা নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারী হিসেবে দ্বীনের খেদমতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁরা যুগে যুগে সত্য বিবর্জিত অধঃপতিত মানুষদেরকে আলোর পথের সঠিক সন্ধান দিয়ে থাকেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারে 'আলিমগণই মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় পাক-ভারত উপ-মহাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যেসব ওলামায়ে হাক্কানীগণ নিজেদের সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে সমাজে আজীবন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)। মুসলিম মিল্লাতের জন্য তিনি এক জ্বলন্ত ইতিহাস ও অনন্য প্রতিভা। এদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি একজন ইসলামী সাহিত্যিক, গবেষক, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, মুফ্‌তী, ইসলামী চিন্তাবিদ, আরবী সাহিত্য বিশারদ, সূফী ও জ্ঞান সাধক হিসেবে পরিচিত।[২] তিনি আরবী, উর্দূ, ফার্সী, বাংলা ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।[৩] তিনি ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা, বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা, জ্ঞানের প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং আত্ম শুদ্ধি সাধনে প্রসিদ্ধ ছিলেন। স্বভাবত ব্যক্তিগতভাবে যদিও তিনি একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তথাপিও সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত ছিলেন না।

---

[১] انما يخشى الله من عباده العلماء (৩৪ ঃ ৬৮)

[২] 'মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর জীবন ও কর্ম' শীর্ষক সেমিনার, জাতীয় প্রেসক্লাব, ভি. আই. পি. লাউঞ্জ, ২১ আগস্ট, ২০০২।

[৩] 'মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর জীবন ও কর্ম' শীর্ষক সেমিনার, জাতীয় প্রেসক্লাব, ভি. আই. পি. লাউঞ্জ, ২১ আগস্ট, ২০০২।

ইংরেজ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা আলিয়া মাদরাসা[১] হতে তিনি দ্বিতীয় মুজাদ্দিদ মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দ (রহঃ)[২] ও দিল্লীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)[৩]-এর ভাব-শিষ্য পরস্পরায় ইসলামী জ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন তা আজীবন স্বরণীয় হয়ে থাকবে। দেশ-বিদেশের অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট হতে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, আকাইদ, বালাগাত, উসূলুল ফিক্হ এবং ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছেন। তিনি হানাফী মাযহাব[৪]-এর অনুসারী ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী পাক-ভারত উপ-মহাদেশ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে পড়ানো হয়।[৫] তাঁর মতো এতবড় বিদগ্ধ পণ্ডিত, ইসলামী চিন্তাবিদ ও জ্ঞান তাপসের উপর একটি ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন ছিল অথচ আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন ধরণের গবেষণা হয়নি।

---

[১] পলাশী বিপর্যয় উত্তরকালে নব্য ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের মাঝে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ছিল অন্যতম। ১৭৬৫ সালে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব ব্যবস্থা ইংরেজ কোম্পানীর হাতে চলে যাওয়ায় এদেশের মুসলমানগণ ক্রমান্বয়ে মারাত্মক আর্থিক দুরাবস্থায় নিপতিত হয়। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা-দীক্ষা দানে অক্ষম হয়ে পড়েন। এমনকি এককালের বড় বড় মুসলিম পরিবারগুলোও নিজ সন্তানদেরকে উচ্চমানের সরকারি পেশার উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ব্যর্থ হন। এ সময় কলকাতার গণ্যমাণ্য শিক্ষিত মুসলমান প্রতিনিধিগণের একটি দল বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের তরুণদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাংলার তৎকালীন বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর নিকট আবেদন করেন। তাদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে এবং ইংরেজ সরকারের এক বিশেষ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বড়লাট এ প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং ১৭৮০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

[২] মৃ. ১০৩৪ খ্রী.

[৩] মৃ. ১৭৬৩ খ্রী.

[৪] হানাফী মাযহাব-এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন নু'মান বিন সাবিত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)। তিনি ৮০ হিজরী মোতাবেক ৬৯৯/৭০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যুগ শ্রেষ্ঠ এ ইসলামী আইনবিদ বিশ্ববরেণ্য চল্লিশজন আলেমসহ দীর্ঘ ত্রিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৫০ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

[৫] ঢাকা আলিয়া মাদরাসা, আলমশাহ পাড়া কামিল মাদরাসা, চুনতি হাকিমীয়া আলিয়া মাদরাসায় আলিম শ্রেণীতে কাওকাবুদ্দুররী এবং কামিল শ্রেণীতে নি'মাতুল মুন'ইম গ্রন্থদ্বয় পাঠ্যভূক্ত রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি মাদরাসাসমূহে মাওলানার গ্রন্থ দুটি অতীব যত্নের সাথে পড়ানো হয়। এছাড়াও পাক-ভারত উপ-মাহাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর কিতাবগুলো পাঠ্যভূক্ত করা রয়েছে বলে জানা যায়।

তাঁর মতো এমন একজন ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন ও গবেষণা করা প্রয়োজন। যাতে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্ম এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কি ধরণের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন নিকট অতীতে হয়েছে সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারে। এ কারণেই আমি এ মহা মনীষীর জীবন-দর্শন ও ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর অবদান সম্পর্কে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছি। সাথে সাথে এ গবেষণা কর্মে সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবন ও অবদান মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি।

অত্র গবেষণায় মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর জীবন-দর্শন আলোচনায় তাঁর বিশেষ বিশেষ শিক্ষকমণ্ডলী, সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র এবং অন্যান্য মনীষীগণের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত মূল আলোচনায় স্থান পেয়েছে। তাঁদের সময়কাল এবং জন্ম-মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবে অনুসন্ধান করে যাঁদের জন্ম তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি শুধুমাত্র তাঁদের মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করেছি। আর যাঁদের জন্ম-মৃত্যুর কোন তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি সেখানে সেগুলো খালি রেখেছি । শাসক ও বিখ্যাত পেশাজীবীর শাসনকাল ও সংশ্লিষ্ট পেশায় চাকুরীর মেয়াদ খ্রীষ্টিয় সালের মাধ্যমে উল্লেখ করেছি। যেখানে সম্ভব হয়েছে জন্ম ও মৃত্যু সাল এবং সময়কাল নির্দেশের সময় হিজরী সাল উল্লেখ করেছি। প্রয়োজন বোধে একই নিয়মে প্রথমে হিজরী সাল অতপর অবলিগ চিহ্ন দিয়ে সে অনুযায়ী খ্রীষ্টিয় সাল উল্লেখ করেছি।[১] যেসব জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি প্রকাশের তারিখ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ ছিলনা তা অনুল্লেখ রেখেছি । তাঁর রচনাবলী পর্যালোচনা করার সময় মুদ্রিত গ্রন্থাবলী উল্লেখ করেছি। গ্রন্থ আলোচনার বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ উল্লেখ করার পর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছি। যেসব গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি সেগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করেছি। মুদ্রিত গ্রন্থের রচনার সময়কাল, কাতিব, প্রকাশক, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা, কপির সংখ্যা ও প্রকাশনী ইত্যাদি উল্লেখ করেছি। তাঁর সম্পর্কে তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যাপক গ্রন্থ না থাকায় আমাকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হয়েছে। তাঁর পারিবারিক ব্যক্তিবর্গ, নিকটাত্মীয়, ছাত্রবৃন্দ, প্রতিবেশী ও ভক্তবৃন্দের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

---

১. যেমন- ১৪২৬/২০০৫

আমার এ অভিসন্দর্ভে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার সূচনাপর্ব মাত্র। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁর সম্পর্কে অধিক অধ্যয়ন ও গবেষণা কর্ম পরিচালিত হবে। ফলে মানুষ আধ্যাত্মিকতা, সমাজসেবা ও সংস্কার এবং মসজিদ, মাদরাসা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা লাভ করবে। আমি আমার এ অভিসন্দর্ভটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি অধ্যায়ে একাধিক পরিচ্ছেদ দিয়ে তাঁর জীবনের সর্বপর্যায়ের তথ্য সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পেয়েছি। প্রথম অধ্যায়ে নোয়াখালী জেলার ভৌগোলিক বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর যুগ,[১] তৃতীয় অধ্যায়ে জন্ম ও শিক্ষা, চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর কর্মজীবন, পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামী জ্ঞান-গবেষনায় তাঁর অবদান, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক জীবন, সপ্তম অধ্যায়ে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত, অষ্টম অধ্যায়ে উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও আলোকচিত্র-এর মাধ্যমে এ অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করেছি।

অভিসন্দর্ভটি আকর্ষণীয় করার জন্য মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর ছবি, তাঁর বাড়ীর মসজিদ ও মক্তব, তাঁর কবর, মানিকপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছবি সংযুক্ত করেছি। এ অভিসন্দর্ভটি সবদিক দিয়ে সন্তোষজনক হয়তো হয়নি। কারণ এটি একটি নতুন প্রচেষ্ঠা। তাঁর সম্পর্কিত অনেক তথ্যই উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে হয়তো কোন গবেষক এ পথে আরো নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন।

এ গবেষণা কর্মে আমার নির্দেশক হলেন খ্যাতিমান জ্ঞান তাপস, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, বর্তমান সিনিয়র প্রফেসর[২] ডক্টর এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী।[৩] তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমার

---

[১] ১৮৮৬-১৯৭৪

[২] Senior most professors in Bangladesh.

[৩] তিনি ১ মার্চ, ১৯৮৪ সালে নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানার অন্তর্গত- সাত্রাপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক ষ্ট্যাডিজ বিভাগ থেকে বি. এ. (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান এবং ১৯৬৬ সালে এম. এ. পরীক্ষায় কলা অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। এবং ১৯৭৩ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। কর্ম জীবনে তিনি ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি উক্ত বিভাগে ১৯৭৭ সালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৮১-'৮৩ পর্যন্ত তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা (Founding Chairman) চেয়্যাম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৮৪ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং অদ্যাবধী উক্ত পদে কর্মরত আছেন।

প্রতি অসামান্য মমতা নিয়ে যে শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়ে আমাকে গন্তব্যে পৌছতে সহযোগিতা করেছেন এবং নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার অভিসন্দর্ভের আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব। পাশাপাশি অনেক সুধী ও গুণীজন আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্যাবলী দিয়ে কৃতার্থ করেছেন।

আমার সম্মানিত শিক্ষক মহোদয় হতে আমি যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ করেছি। বিশেষত উর্দূ ও ফার্সী বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর আবদুল্লাহ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল বাকী, ডক্টর শফিকুর রহমান, ডক্টর আব্দুল লতিফ প্রমুখ আমাকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় তাঁর জৈষ্ঠপুত্র জনাব মাসুম, চতুর্থ পুত্র সাবেক উপ-রাস্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, বর্তমান আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, পঞ্চম পুত্র জনাব মনছুর আহমদ, তাঁর নাতি কোম্পানীগঞ্জ থানার বসুরহাটের ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের পরিচালক জনাব এরফান উদ্দিন, ভাগিনা জনাব হাজী মোজাম্মেল হক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বিধায় তাদেরকেও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

এছাড়া রাঙ্গুনীয়া আলমশাহপাড়া কামিল মাদরাসার ফকীহ্ মাওলানা মাহমুদুল হাছান, মুফাস্‌সির মাওলানা ইছমাইল হোসাইন, পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা আবদুর রহমান, মাওলানা জামাল উদ্দীন হেজাযী, মাওলানা ফয়জুল আমিন কুতুবী, আমার শ্রদ্ধেয় বড়বোন খাদিজাতুল কোব্‌রা বালিকা মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা মরিয়ম বেগম, দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চুনতী হাকিমীয়া আলীয়া মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আতিকুর রহমান, ছোটভাই নুরুন্নবী, আমজাদ হোসেন রুমেল, সাংবাদিক হেলাল আখন্দ সহ অনেকে আমাকে এ অভিসন্দর্ভটি রচনার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষতঃ ছায়ার ন্যায় পাশে থেকে যে আমাকে এ মহতি কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সার্বক্ষণিক সহযোগিতা, শক্তি ও সাহস

যুগিয়েছে সে হলো আমার খুব-ই নিকটের ছোটভাই মাওলানা হাবিবুর রহমান রাজাপুরী। আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা ও আমার প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী রোকেয়া বেগম আমাকে সার্বক্ষণিক দু'আ ও উৎসাহ যুগিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের নিকটও আমি চিরঋণী। বিভিন্ন গ্রন্থাগার হতে আমি এ অভিসন্দর্ভের উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তম্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম দারুল কুতুব, হাটহাজারী, জামিয়া 'আরবিয়্যাহ ইসলামিয়্যাহ দারুল কুতুব পটিয়া, চট্টগ্রাম রাঙ্গুনীয়া আলমশাহপাড়া কামিল মাদরাসা গ্রন্থাগার।

এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাছেও আমি ঋণী। সর্বোপরি আমাকে এ গবেষণার সুযোগ দেয়ার জন্য আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা ও তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে লাখো শোকরিয়া জানিয়ে এ প্রার্থনা করছি, তিনি যেন মেহেরবানী করে তাঁর এক মহান ওলীর জীবন দর্শনকে সমুন্নত করার প্রয়াস আমার আখিরাতের মুক্তির অসীলা হিসেবে কবুল করেন। আমিন!

তারিখ, ঢাকা
১৭ জুলাই, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ
২ শ্রাবণ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ
১০ জমাদিউস সানি, ১৪২৬ হিজরী

মুহাম্মদ 'ঈসা কাদেরী
এম. ফিল. গবেষক,
শিক্ষাবর্ষ-২০০০-২০০১
রেজি. নং- ব ৮৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

ভৌগোলিক বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নোয়াখালী জেলার ভৌগোলিক অবস্থান

নোয়াখালী (চট্টগ্রাম বিভাগ) বাংলাদেশের দক্ষিণের একটি জেলা। ইহা ২২°৬´-২৩°১৭´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০°৩৮´-৯১°৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[১] আয়তন ৩,৬০০.৯৯ বর্গ কিমি।[২] উত্তরে কুমিল্লা জেলা, দক্ষিণে মেঘনার মোহনা ও বঙ্গোপসাগর পূর্বে ফেনী ও চট্টগাম জেলা এবং পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর ও ভোলা জেলা। বার্ষিক সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৪.৩° সে. এবং সর্বনিম্ন ১৪.৪° সে.।[৩] বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৩০২ মি.মি।[৪] প্রধান নদীঃ বামনী ও মেঘনা।

নামকরণ ঃ বর্তমান নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ১৮২১ সালে ভুলুয়া জেলা,[৫] নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ১৮৬৮ সালে এ জেলাকে নোয়াখালী নামকরণ করা হয়।[৬] উপজেলা ৭, পৌরসভা ৫, ইউনিয়ন ৮৩, মৌজা ৯০৯ ও গ্রাম ৯৭৮।

উপজেলাসমূহ ঃ নোয়াখালী, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি।

পৌরসভাসমূহ ঃ বেগমগঞ্জ, চৌমুহনী, কোম্পানীগঞ্জ, বসুরহাট, নোয়াখালী সদর।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৯৫), বজরা শাহী জামে মজিদ (১১৫০ হি. বেগমগঞ্জ), কালীমূর্তি (সিরাজপুর ইউনিয়ন, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা, অষ্টাদশ শতাব্দী)।

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, সেপ্টে. ১৯৯৩, পৃ. ২৩৪।

২. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৭০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, সেপ্টে. ১৯৯৩, পৃ. ২৩৪।

৬. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৭০।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঃ নোয়াখালী জেলার প্রাচীন নাম ছিল ভূলুয়া। এক সময় ত্রিপুরার পাহাড় থেকে উৎসরিত ডাকাতিয়া নদীর ঘন ঘন বন্যায় ভুলুয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো। বন্যার হাত থেকে এ অঞ্চলের কৃষিকে রক্ষা করার জন্য ১৮৬০ সালে ডাকাতিয়া নদী থেকে রামগঞ্জ, সোনাইমুড়ী এবং চৌমুহনীর মধ্য দিয়ে মেঘনা ও ফেনী নদীর সঙ্গমস্থলে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সুদীর্ঘ খালটি খনন করার পর ১৮৬৮ সাল থেকে 'নোয়া' (নতুন)- এবং খাল থেকে ভুলুয়ার নামকরণ করা হয় নোয়াখালী। ১৮৩০ সালে এ জেলার জনগণ জেহাদ আন্দোলন এবং ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের জন্য ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধী বেগমগঞ্জ উপজেলায় আসেন। ১৭৯০ সাল থেকে নোয়াখালী জেলা অনেকবার জলোচ্ছ্বাস, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়। ১৯৭০ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এ জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ১০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। ১৫ জুন, ১৯৭১ সালে সোনাপুর আহমদিয়া মডেল হাইস্কুল প্রাঙ্গণে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের এক সম্মুখ যুদ্ধে প্রায় ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন গণকবর ঃ কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ১৪নং সুইসগেট সংলগ্ন এলাকা। স্মৃতিস্তম্ভ-৪ (আহমদিয়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সোনাপুর, পি টি আই প্রাঙ্গণ মাইজদী, চৌমুহনী ও সোনাইমুড়ী)। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের নামে সড়ক-৩ (শহীদ নূর মোহাম্মদ, শহীদ মেজর মেজবাহউদ্দীন ও শহীদ জসীমউদ্দীন সড়ক)।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ঃ বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন,[১] আব্দুল মালেক উকিল,[২] বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী,[৩] সার্জেন্ট জহুরুল হক,[৪] জালাল আহমেদ চৌধুরী,[৫] আবদুল বারী,[৬] অধ্যক্ষ লুৎফর হায়দার চৌধুরী,[৭] মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।[৮]

---

১. শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, জন্ম ১৯৫৩, মৃ. ১৯৭১।
২. বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার।
৩. সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।
৪. রাজনীবিদ, জন্ম ১৯৩৫। পাকিস্তানী শাসকচক্র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক করে তাঁকে কোন বিচার ছাড়াই ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী হত্যা করে।
৫. বিশিষ্ট কবি।
৬. কবিরত্ন খেতাবপ্রাপ্ত।
৭. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।
৮. শহীদ বুদ্ধিজীবী।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ মসজিদ ২৭০৪, মন্দির ৫৮, গির্জা ২, মাজার ৭, মহাশ্মাশান ১ ।

জনসংখ্যা ঃ মোট জনসংখ্যা ২৫৩৩৩৯৪, তন্মধ্যে পুরুষ ৪৮.৯১%, মহিলা ৫১.০৯% মুসলমান ৯৩.৪১%, হিন্দু ৬.৪১%, অন্যান্য ০.১৮% ।[১]

শিক্ষার হার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গড় হার ৩৭.১১% । সরকারি কলেজ ৭, বেসরকারি কলেজ ২৩, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১২, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২৯, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৭৬, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩১২, আইন কলেজ ১, মাদরাসা ১৩৭, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং সেন্টার ১, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১, টেক্সটাইল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ১ ।

সুখ্যাত প্রতিষ্ঠান ঃ নোয়াখালী জেলা স্কুল (১৮৫৩), ব্রাদার আন্দ্রে উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৫৭), অরুণচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৪), আহমদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০৬), নোয়াখালী সরকারি কলেজ (১৯৬৩), নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৪), পৌরকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪০), কবিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৮), বসুরহাট এ এইচ সি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১১), বামনী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৪), বসুরহাট ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা (১৯২৩), বামনী আছিরিয়া সিনিয়র মাদরাসা (১৯১৫), বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৫৭), বজরা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯) ।

দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী ঃ জাতীয় নিশান (১৯৮০), অবয়ব (১৯৮০), সাপ্তাহিক জাতীয় বাংলাদেশ (১৯৭০), নোয়াখালী বার্তা (১৯৯১), আজকের উপমা (১৯৯১) । অবলুপ্ত: নোয়াখালী হিতৈষী (১৯২২), পূর্ব বঙ্গবাসী (১৮৮৪), মাসিক আশা (১৯০১), তানজিন (১৯২৬), দেশের বাণী (১৯২৭), ছোলতান (১৯২৪), ত্রিপুরা নোয়াখালী লক্ষ্মী (১৩৪২), নোয়াখালী সম্মিলনী, জাতীয় বাংলাদেশ, উপকূল বার্তা, নয়াবার্তা, ইত্যাদি ।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঃ ক্লাব ৯০, পাবলিক লাইব্রেরি ১৪, নাট্যমঞ্চ ২, নাট্যদল ৫, মহিলা সংগঠন ২, কমিউনিটি সেন্টার ৩, শিশু একাডেমী ১, শিল্পকলা একাডেমী ১, সাহিত্য সমিতি ১, অডিটরিয়াম ২, খেলার মাঠ ৭৪ ।

---

১. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৭১ ।

জনগোষ্ঠী প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ৩০.২৭%, কৃষি শ্রমিক ১৬.৯৯%, অকৃষি শ্রমিক ২.৮৬% মৎস্য ১.৪% ব্যবসা ১২.২৩%, পরিবহণ ২.৪৬%, চাকরি ১৯.৩৯%, অন্যান্য ১৪.৪% ।[১]

ভূমি ব্যবহার ঃ চাষযোগ্য জমি ২২৯৩৮৫ হেক্টর, পতিত জমি ১৭১৩৬ হেক্টর ।[২]

ভূমি নিয়ন্ত্রণ ঃ ভূমিহীন ২১%, প্রান্তিক চাষি ৪১%, ক্ষুদ্র চাষি ২১%, মধ্যম চাষি ১৪%, বড় চাষি ৩% ।[৩]

প্রথম শ্রেণীর আবাদি জমির মূল্য ঃ ০.০১ হেক্টর প্রতি ৫০০০টাকা ।

প্রধান প্রধান কৃষি ফসল ঃ ধান, খেসারি, ইক্ষু, মুগ, ফেলন, আলু, মরিচ, সয়াবিন, চিনাবাদাম, শাকসবজি ও বিভিন্ন ধরনের ডাল ।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসল ঃ তিল, তিসি, পাট, স্থানীয় জাতের ধান ।

প্রধান ফল-ফলাদি ঃ আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, নারিকেল, পেঁপে, তাল, সুপারি ।

মৎস, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগির খামার ঃ গবাদি পশু ৬২, মৎষ্য ৬০, হাঁস-মুরগি ১২৯, হ্যাচারি ৩২, সরকারি পশু পালন কেন্দ্র ১, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ১ ।

যোগাযোগ বিশেষত্ব ঃ পাকা রাস্তা ৮০৪ কিমি, আধাপাকা রাস্তা ৪৮৫ কি.মি, কাঁচা রাস্তা ২,২৭৪ কি.মি, নৌপথ ৩০ নটিক্যাল মাইল, রেলপথ ২৮ কি.মি, রেলওয়ে স্টেশন ৭ ।[৪]

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন ঃ পাল্কি, ঘোড়া, গরু ও মহিষের গাড়ি ।

শিল্প ও কলকারখানা ঃ চৌমুহনী জুট মিল, পাটকল, ধানকল, তৈলকল, ব্রেড ও বিস্কুট ফ্যাক্টরী, আটা ও ময়দা কল, বরফকল, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, সাবান কারখানা, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি ।

কুটিরশিল্প ঃ তাঁত, বাঁশ বেতের কাজ, কামার-কুমার, স্বর্ণকার, মাদুর তৈরির কাজ, সেলাই কাজ, কাঠের কাজ, তামা ও কাসার কাজ ইত্যাদি ।

হাটবাজার ও মেলা ঃ হাটবাজার ২৬৮টি, মেলা ৯টি ।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ঃ নারিকেল, সুপারি, ধান, মাদুর, শুটকিমাছ ।

---

১. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৭১ ।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১ ।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১ ।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপজেলাসমূহের পরিচিতি

নোয়াখালী সদর উপজেলা

আয়তন ১০১৭.৬৬ বর্গ কি.মি । উত্তরে বেগমগঞ্জ ও সেনবাগ উপজেলা, দক্ষিণে হাতিয়া উপজেলা, পূর্বে কোম্পানীগঞ্জ ও সন্দ্বীপ উপজেলা, পশ্চিমে রামগতি ও লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা । প্রধান নদী: মেঘনা (লোয়ার) ও সন্দ্বীপ চ্যানেল । বনভূমি ১০৩.৭১ বর্গ কি.মি ।[১] উপজেলা শহর ৯টি ওয়ার্ড ও ৩৬টি মহল্লা নিয়ে গঠিত । ১৮৭৬ সালে নোয়াখালী পৌরসভা গঠিত হয় । আয়তন ১২.৬১ বর্গ কি.মি । জনসংখ্যা ৭৪৫৮৫, তম্মধ্যে পুরুষ ৫১.৫০%, মহিলা ৪৮.৫০% । জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি ৫৯১৫ জন । শিক্ষার হার ৬০.৭% ।[২] শহরটি পূর্ব নাম ছিল সুধারামপুর ।[৩] মেঘনা নদীর ভাঙ্গনের ফলে ১৯৪৮ সালে শহরটিকে ৮টি কি.মি উত্তরে বর্তমান মাইজদীতে স্থানান্তরিত করা হয় ।[৪]

প্রশাসন ঃ নোয়াখালী সদর থানা সৃষ্টি ১৮৬১ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে । পৌরসভা ২, ওয়ার্ড ১৮, মহল্লা ৪৭, ইউনিয়ন ২১, মৌজা ৩১৫, গ্রাম ২৮৭ ।[৫]

পৌরসভাসমূহ ঃ নোয়াখালী সদর ও কবিরহাট ।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ঃ পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯৫) ।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ মসজিদ ৬৫৫, মন্দির ৪, গির্জা ১. মাজার ২, মহাশ্মশান ১ । তম্মধ্যে সুপরিচিত হলো নোয়াখালী জেলা জামে মসজিদ, খলিল ভূঁইয়া জামে মসজিদ, কবির পাটোয়ারী জামে মসজিদ, শ্রীরাম ঠাকুরের মন্দির ।

---

১. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৭২ ।

২. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭২ ।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, সেপ্টে. ১৯৯৩, পৃ. ২৩৫ ।

৪. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৭২ ।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২ ।

জনসংখ্যা ঃ ৬৫১১৭১, তম্মধ্যে পুরুষ ৫০.২২%, মহিলা ৪৯.৭৮% । মুসলামান ৯৪.১৮%, হিন্দু ৫.৫৯%, অন্যান্য ০.২৩% ।[১]

শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গড় হার ৩০.২% । পুরুষ ৩৬.৫%, মহিলা ২৪% ।[২] কলেজ ১০, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪৮, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮৩, মাদরাসা ৩১, মক্তব ৯৯ ।

সুখ্যাত প্রতিষ্ঠান ঃ নোয়াখালী জেলা স্কুল (১৮৫৩), ব্রাদার আন্দ্রে উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৫৭), অরুণচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৪), আহমদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০৬), নোয়াখালী কলেজ (১৯৬৩), নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪০), কবিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৮) ।

দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী ঃ নোয়াখালী বার্তা, আজকের উপমা, সাপ্তাহিক অবয়ব ।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঃ পাবলিক লাইব্রেরী ১, টাউন হল ১, ক্লাব, ৫ ।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ৩৭.২%, মৎস্য ১.৪%, কৃষি শ্রমিক ১৮.৮%, অকৃষি শ্রমিক ৩.২১%, ব্যবসা ১০.৫৩%, পরিবহণ ২.৩২%, চাকরি ১৪.৮১%, অন্যান্য ১২.৯৯% ।[৩]

ভূমি ব্যবহার ঃ চাষযোগ্য জমি ৬৭.৪৪৯৭.৩৭ হেক্টর । এক ফসলি ৪৬.২%, দো ফসলি ৪৩.১%, তিন ফসলি ১০.৭% ।[৪]

ভূমি নিয়ন্ত্রণ ঃ ভূমিহীন ২২%, প্রান্তিক চাষি ২৫%, ক্ষুদ্র চাষি ৩২%, মধ্যম চাষি ৫% । মাথাপিছু আবাদি জমি ০.১৬ হেক্টর ।[৫]

প্রথম শ্রেণীর আবাদি জমির মূল্য ঃ ০.০১ হেক্টর প্রতি ৭০০০ টাকা ।

প্রধান প্রধান কৃষি ফসল ঃ মরিচ, সয়াবিন, চিনাবাদাম, শাকসবজি ও বিভিন্ন ধরনের ডাল ।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ঃ তিল, তিসি, পাট ।

প্রদান্ ফল-ফলাদি ঃ আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, নারিকেল, পেঁপে, সুপারি ।

---

১. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৭২ ।
২. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭২ ।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩ ।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩ ।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩ ।

মৎস্য ও গবাদি পশুর খামার ঃ হাঁস-মুরগি ৬৪, হ্যাচারি ১৪, গবাদি পশু ৩৪ ।

যোগাযোগ বিশেষত্ব ঃ পাকা রাস্তা ১২০ কি.মি, আধাপাকা রাস্তা ১০০ কি.মি, কাঁচা রাস্তা ৫০০ কি.মি, নৌপথ ৩০ নটিক্যাল মাইল, রেলপথ ৬.৮ কি.মি, রেলওয়ে স্টেশন ৩ ।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় সনাতন বাহন ঃ পাল্কি, ঘোড়া, গরু ও মহিষের গাড়ি ।

শিল্প ও কলকারখানা ঃ চালকল, তেলকল, ব্রেড ও বিস্কুক ফ্যাক্টরি, আটাকল, বরফকল, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি ।

কুটিরশিল্প ঃ তাঁত, বাঁশ ও বেতের কাজ, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, হোগলার পাটি তৈরির কাজ, সেলাই কাজ ।

হাটবাজার, মেলা ঃ হাটবাজার ৫৩, মেলা ৩ ।

উল্লেখযোগ্য হাটবাজার ঃ সোনাপুর দত্তেরহাট, মাইজদী বাজার, খাসের হাট ও কালা মুন্সির হাট ।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ঃ নারিকেল, সুপারি, ধান, মাদুর, শুটকিমাছ ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ আধুনিক হাসপাতাল ২, টিবি ক্লিনিক ১, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৫, পৌর চিকিৎসা কেন্দ্র ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১৮, বেসরকারি হাসপাতাল ৪, বেসরকারি ক্লিনিক ৬, পশু চিকিৎসালয় ১ ।

বেগমগঞ্জ উপজেলা

আয়তন ৪২৬.০৫ বর্গ কি.মি।[১] উত্তরে লাকসাম উপজেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী সদর উপজেলা, পূর্বে সেনবাগ উপজেলা, পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর সদর ও চাটখিল উপজেলা। আয়তন ১৯.১ বর্গ কি.মি। জনসংখ্যা ১৮৪৫২৫, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি ৯৬৬১ জন। এটি একিট উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। শিক্ষার হার ৫৬.৩%।[২]

প্রশাসন ঃ বেগমগঞ্জ থানা সৃষ্টি ১৮৯২ সালে[৩] এবং বর্তমানে এটি উপজেলা। পৌরসভা ১ (চৌমুহনী), ইউনিয়ন ২৯, মৌজা ৩৩৪, গ্রাম ৩৪৩।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ বজরা শাহী জামে মসজিদ (১১৫৩ হি.)।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঃ জনশ্রুতি আছে যে, মুগল আমলে বাংলার সুবেদর শায়েস্তা খান তার স্ত্রী (বেগম) সহ এ এলাকায় সফর করেন। পরবর্তীতে এখানকার নামকরণ করা হয় বেগমগঞ্জ।[৪] ৭ নভেম্বর, ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্তিমিত করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী এক শান্তি মিশনে এখানে আসেন।[৫]

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ঃ স্মৃতিস্তম্ভ ২ (চৌমুহনী ও সোনাইপুর)।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ঃ আবদুর বারী,[৬] অধ্যক্ষ লুৎফুল হায়দার চৌধুরী,[৭] মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী,[৮] শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ মসজিদ ৭৯৭, মন্দির ৪, তীর্থস্থান ১, মাজার ৫। তম্মধ্যে সুপরিচিত হলো বজরা শাহী জামে মসজিদ, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট।

জনসংখ্যা ঃ ৬৭৬১৬৮, তম্মধ্যে পুরুষ ৪৯.২%, মহিলা ৫০.৮%। মুসলমান ৯৪.৫৫%, হিন্দু ৫.৪%, অন্যান্য ০.৫%। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বেগমগঞ্জ বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজেলা।

---

১. বাংলা পিডিয়া, ৭ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৬৮।
২. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬৮।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।
৬. বিশিষ্ট কবি, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'কবিরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত।
৭. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।
৮. শহীদ বুদ্ধিজীবী।

শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গড় হার ৪৪.৪% ।[১] কলেজ ৭, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬২, মাদরাসা ৪২, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৫৩ ।

সুখ্যাত প্রতিষ্ঠান ঃ চৌমুহনী সালেহ আহমদ কলেজ, বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, বজরা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯), ঘাটলা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৫), বেগমগঞ্জ এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, বেগমগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, বেগমগঞ্জ ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ।

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী ঃ বর্তমান দৈনিক জাতীয় নিশান। অবলুপ্তঃ পূর্ব বঙ্গবাসী, নোয়াখালী সম্মিলনী, দেশের বানী , মাসিক আশা, সাপ্তাহিক জাতীয় বাংলাদেশ ।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঃ ক্লাব ৩, পাঠাগার ১০ অডিটোরিয়াম ১, নাট্যমঞ্চ ২, সাহিত্য সমিতি ও শিশু সংগঠন ৩ ।

জনগোষ্ঠির প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ২৩.১৩%, কৃষি শ্রমিক ১৩.০৩%, অকৃষি শ্রমিক ২.৫%, ব্যবসা ১৫.৮২%, পরিবহণ ৩.১৩%, নির্মাণ ১.০১%, চাকরি ২৬.৭১%, অন্যান্য ১৪.৬৭% ।[২]

ভূমি ব্যবহার ঃ চাষযোগ্য জমি ৩০৫৮৭.৬২ হেক্টর। এক ফসলি ৭১%, দো ফসলি ২২.১৪%, তিন ফসলি ৬.৮৬% ।

ভূমি নিয়ন্ত্রণ ঃ ভূমিহীন ৯.৬১%, প্রান্তিক চাষি ৪০.৬৯%, ক্ষুদ্র চাষি ৪২.৭৯%, মধ্যম চাষি ৬.৫৩%, বড় চাষি ০.৩৮% । মাথাপিছু আবাদি জমি ০.০৬ হেক্টর ।

প্রথম শেণীর আবাদি জমির মূল্য ঃ ০.০১ হেক্টর প্রতি ৫০০০ টাকা ।

প্রধান কৃষি ফসল ঃ ধান, মরিচ, চিনাবাদাম ও বিভিন্ন প্রকারের ডাল ।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ঃ তিল, তিসি, অড়হর, চিনা ।

প্রধান ফল-ফলাদী ঃ আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, জাম, পেয়ারা, পেঁপে, সুপারি ।

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার ঃ সরকারি পশুপালন কেন্দ্র ১, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ১, হাঁ-মুরগি ১৭, গবাদি পশু ২ ।

---

[১] বাংলা পিডিয়া, ৭ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৬৯ ।

[২] প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬৯ ।

যোগাযোগ বিশেষত্ব ঃ পাকা রাস্তা ৬১ কি.মি, কাঁচা রাস্তা ১১২ কি.মি, রেল পথ ২১ কি.মি, রেলস্টেশন ৩ ।[১]

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন ঃ পাল্কি, গরু, ঘোড়া ও মহিষের গাড়ি ।

শিল্প ও কলকারখানা ঃ জুট মিল ১, ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ ১, ধানকল ৮৫, ময়দাকল ৭, তেলকল ২৬, রুটি ও বিস্কুট ফ্যাক্টরি ১৪, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ১৪ ব্রিক ফিল্ড ২১, আইসক্রীম ফ্যাক্টরী ১০, প্রেস ৪৩ ।[২]

কুটিরশিল্প ঃ তাঁত, শুটকি মাছ, বাঁশ ও বেতের কাজ, স্বর্ণকার, সেলাই কাজ, কামার, কুমার, কাঠের কাজ ইত্যাদি ।

হাটবাজার ঃ হাটবাজার ৬১ । উল্লেখযোগ্যঃ বেগমগঞ্জ বাজার, চৌমুহনী বাজার, সোনাইমুড়ি বাজার, রাজগঞ্জ বাজার, বজরা বাজার ও বাংলাবাজার ।

খনিজ সম্পদ ঃ প্রাকৃতিক গ্যাস ।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ঃ নারিকেল, সুপারি, শুঁটকি মাছ, চাল, হোগলার চাটাই, বিস্কুট, সরিষার তেল ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, হাসাপাতাল ১, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ৪, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১৮, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র ১, বেসরকারি স্বাস্থ্য ইউনিট ৫ ।[৩]

---

[১] বাংলা পিডিয়া, ৭ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৬৯ ।

[২] প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬৯ ।

[৩] প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬৯ ।

চাটখিল উপজেলা

আয়তন ১৩০.৮৯ বর্গ কি.মি। উত্তরে লাকসাম ও শাহরস্তি উপজেলা, দক্ষিণে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা, পূর্বে বেগমগঞ্জ উপজেলা পশ্চিমে রামগঞ্জ উপজেলা। উপজেলা শহর ৯টি ওয়ার্ড ও ১৮টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ৬.০৭ বর্গ কি.মি। জনসংখ্যা ১৮১৮৭, তম্মধ্যে পুরুষ ৪৮.৪৫%, মহিলা ৫১.৫৫%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি ৪৬৪৪ জন। শিক্ষার হার ৫৪.৮%।[১]

প্রশাসন ঃ চাটখিল থানা সৃষ্টি ১৯৭৭ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয় ১৯৮৩ সালে।[২] ইউনিয়ন ৯, মৌজা ১১৩, গ্রাম ১৩৬।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ মসজিদ ২৮৮, মন্দির ১২। উল্লেখযোগ্যঃ চাটখিল বাজার মসজিদ।

জনসংখ্যা ঃ ১৯৪১৮৫, তম্মধ্যে পুরুষ ৪৮.৪৩%, মহিলা ৫১.৫৭%। মুসলমান ৯৬.২৩%, হিন্দু ৩.৭৫%, অন্যান্য ০.০২%।[৩]

শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গড় হার ৫১.৯%, পুরুষ ৫৫.২%, মহিলা ৪৯.৪%।[৪]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ সরকারি কলেজ ১, বেসরকারি কলেজ ২, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৭, মাদরাসা ১৫, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৮, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৫।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঃ গ্রামীণ ক্লাব ১৪, খেলার মাঠ ১২।

জনগোষ্ঠির প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ২৩.০৮%, কৃষি শ্রমিক ১৬.০৭%, অকৃষি শ্রমিক ২.৬%, ব্যবসা ১৩.০৬%, পরিবহণ ২.৯৭%, নির্মাণ শ্রমিক ১.৩৭%, চাকুরী ২৫.৫%, অন্যান্য ১৪.৮১%।[৫]

---

১. বাংলা পিডিয়া, ৩য় খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (প্রকা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ৩২৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

ভূমি ব্যবহার ঃ চাষযোগ্য জমি ৯৭০২.১৪ হেক্টর। পতিত জমি ১২৫০.১০ হেক্টর। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৮২% ।[১]

ভূমি নিয়ন্ত্রণ ঃ ভূমিহীন ৩২.২৯%, ক্ষুদ্র চাষি ২৮%, মধ্যম চাষি ২৭%, বড় চাষি ১২.৭১% । মাথাপিছু আবাদি জমি ০.০৫ হেক্টর ।[২]

প্রথম শেণীর আবাদি জমির মূল্য ঃ ০.০১ হেক্টর প্রতি ১৪০০০ টাকা ।

প্রধান কৃষি ফসল ঃ ধান,পাট, বেগুন, মরিচ, আখ, বিভিন্ন জাতের তৈল বিজ, পান, সুপারি ।

প্রধান ফল-ফলাদী ঃ আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, জাম, পেয়ারা, পেঁপে, খেজুর, সুপারি ।

হাঁস-মুরগীর খামার ঃ হাঁস-মুরগির খামার ৮ ।

যোগাযোগ বিশেষত্ব ঃ পাকা রাস্তা ১৬৪ কি.মি, কাঁচা রাস্তা ২৩৫ কি.মি, আধাপাকা রাস্তা ৬৮ কি.মি ।[৩]

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন ঃ পাল্কি, নৌকা, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি ।

শিল্প ও কলকারখানা ঃ ধানকল ৫৬, আটা ও মরিচ কল ৩০, বরফকল ৫ । **কুটিরশিল্প** ঃ তাঁত ১৫৭, কাঠের কাজ ৯৯, বাঁশ ও বেতের কাজ ২১৫, পিতলের কাজ ৪৮, পাট ও কাপড়ের কাজ ৩৩, কামার ৭৩, কুমার ৫২, ।

হাটবাজার ঃ হাটবাজার ১৬। উল্লেখযোগ্যঃ চাটখিল বাজার, পাঁচগাঁও বাজার, দশগরিয়া বাজার ও খিলপাড়া বাজার ।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ঃ নারিকেল, সুপারি, ধান, পান, কলা ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৯ ।

---

[১] বাংলা পিডিয়া, ৩য় খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (প্রকা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ৩৩০ ।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০ ।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০ ।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা

আয়তন ৩০৫.৩৩ বর্গ কি.মি। উত্তরে সেনবাগ ও দাগনভূঁইয়া উপজেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী সদর ও সন্দীপ উপজেলা পূর্বে সোনাগাজী এবং মীরসরাই উপজেলা, পশ্চিমে নোয়াখালী সদর উপজেলা। প্রধান নদীঃ ছোট ফেনী ও বামনী। উপজেলা শহর ৬টি মৌজা নিয়ে মাইজদী সড়ক থেকে ৬ কি.মি দক্ষিণে অবস্থিত। আয়তন ৬.৫০ বর্গ কি.মি। জনসংখ্যা ১৭৩৪০, পুরুষ ৫২.৭৭%, মহিলা ৪৭.২৩%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি ২৬৬৮ জন।[১]

প্রশাসন ঃ কোম্পানীগঞ্জ থানা সৃষ্টি ১৮৮৮ সালে। বর্তমানে এটি উপজেলা। ইউনিয়ন ১১, মৌজা ৩৯, গ্রাম ৪১।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ কালিমুর্তি (অষ্টম শতাব্দি)।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ঃ এ উপজেলায় পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সকল যুদ্ধে সদর বি এল এফ এর কমান্ডার অহিদুর রহমান অদুদসহ ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ঃ গণকবর ১।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ মসজিদ ২৪২, মন্দির ১০। সুপরিচিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ বুড়ি মসজিদ (বসুরহাট), জগন্নাথবাড়ি মন্দির (চরহাজাড়ী)

জনসংখ্যা ঃ ১৮৩৩৫১, পুরুষ ৪৯.৭১%, মহিলা ৫০.২৯%। মুসলমান ৯১.৮৫%, হিন্দু ৮.১০, খ্রীষ্টান ০.০৫%।[২]

শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গড় হার ৩৪.৫%, পুরুষ ৪১.৫%, মহিলা ২৭.৮%।[৩] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ সরকারি কলেজ ১, বেসরকারি কলেজ ২, সরকারি হাইস্কুল ২, বেসরকারি হাইস্কুল ২৬, মাদরাসা ৯, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৭, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯।[৪]

---

১. বাংলা পিডিয়া, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (প্রকা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ৪৮২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ..৪৮২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২।

সুখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ বসুরহাট এ এইচ সি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১১, বামনী উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১৪, বসুরহাট ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা ১৯২৩, বামনী আছিরিয়া সিনিয়র মাদরাসা ১৯১৫।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ পাবলিক লাইব্রেরী ৩, গ্রামীণ ক্লাব ২২, লেখার মাঠ ২৬।

জনগোষ্ঠির প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ২৭.১৫%, কৃষি শ্রমিক ১৮.০৮%, অকৃষি শ্রমিক ২.৮৬%, মৎস্য ১.০১%, ব্যবসা ১০.৪৯%, পরিবহণ ২.১২%, চাকুরী ২১.৬৮%, বাড়ী ভাড়া ১.৪৭%, অন্যান্য ১৬.৬১%।[১]

ভূমি ব্যবহার ঃ চাষযোগ্য জমি ২২৯৬৫.২৪ হেক্টর। পতিত জমি ৩৯৪.৫৮ হেক্টর। এক ফসলি ৫৮.৯৩%, দো ফসলি ২৫.১৩%, তিন ফসলি ১৫.৯৪%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ২.২৩%।[২]

ভূমি নিয়ন্ত্রণ ঃ ভূমিহীন ৩৮%, ক্ষুদ্র চাষি ৩০%, মধ্যম চাষি ২২%, বড় চাষি ১০%। মাথাপিছু আবাদি জমি ০.২৬ হেক্টর।[৩]

প্রথম শেণীর আবাদি জমির মুল্য ঃ ০.০১ হেক্টর প্রতি ৮০০০ টাকা।[৪]

প্রধান কৃষি ফসল ঃ ধান, গম, আলু, বেগুন, টমেটো, আখ, মরিচ।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ঃ তিল, তিসি, পাট, চিনাবাদাম, সরিষা ও বিভিন্ন ধরনের ডাল।

প্রধান ফল-ফলাদী ঃ আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, কালজাম, বরই, পেঁপে, সুপারি।

মৎস্য, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার ঃ মৎস্য ৬০, হাঁস-মুরগি ১৮, হ্যাচারি ১।

যোগাযোগ বিশেষত্ব ঃ পাকা রাস্তা ৩০ কি.মি, কাঁচা রাস্তা ৩৫২ কি.মি, আধাপাকা রাস্তা ৯.৫০ কি.মি।[৫]

১. বাংলা পিডিয়া, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (প্রকা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ৪৮৩।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন ঃ পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা ।

শিল্প ও কলকারখানা ঃ ময়দাকল ১০, তেলকল ৩, বরফকল ৮, ওয়েল্ডিং ৫ ।

কুটিরশিল্প ঃ বাঁশের কাজ ৪০, স্বর্ণকার ৩৬, কামার ৩৭, কাঠের কাজ ২৭ ।[১]

হাটবাজার ঃ হাটবাজার ১৯ । উল্লেখযোগ্য: বসুরহাট, তাল মোহাম্মদ হাট, বাংলাবাজার ও নতুন বাজার ।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ঃ নারিকেল, ধান, কলা, কুমড়া, সুপারি, সীম, মুলা, ঢেঁড়স ।[২]

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৭, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১ ।

---

১. বাংলা পিডিয়া, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ৪৮৩ ।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩ ।

হাতিয়া উপজেলা

আয়তন ১৫০৮.২৩ বর্গ কি.মি। উত্তরে নোয়াখালী সদর ও রামগতি উপজেলা, দক্ষিণ ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে মনপুরা উপজেলা। বড় আকারের একটি দ্বীপসহ মাঝারি ও কিছু ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে উপজেলাটি গঠিত। উপজেলা শহর ৩টি মৌজা নিয়ে গঠিত। আয়তন ২৫.৭২ বর্গ কি.মি। জনসংখ্যা ৮০৮৫, পুরুষ ৪৯.৯৩%, মহিলা ৫০.০৭%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ৩১৪ জন। শিক্ষার হার ২৫.২%।[১]

প্রশাসন ঃ হাতিয়া থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয় ১৯৮৩ সালে[২] ইউনিয়ন ১০, মৌজা ৩৭, গ্রাম ৬৯।[২]

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ঃ মাওলানা আবদুল হাই।[৩]

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ মসজিদ ৪১০, মন্দির ১৪। উল্লেখ্যযোগ্যঃ আফাজিয়া বাজার মসজিদ, তমরুদ্দি বাজার মসজিদ এবং উছাখালী বাজার কালীমন্দির।

জনসংখ্যা ঃ ২৯৫৫০১, পুরুষ ৫০.৭৩%, মহিলা ৪৯.২৭%। মুসলমান ৮৭.১৬%, হিন্দু ১২.৩১%, বৌদ্ধ ০.১৬%, অন্যান্য ০.৩৭%।[৪]

শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গড় হার ২১%, পুরুষ ২৭.২%, মহিলা ১৪.৭%।[৫]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ সরকারি কলেজ ১, বেসরকারী কলেজ ২, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৩, মাদরাসা ১৬, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৫, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৭।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঃ গ্রামীণ ক্লাব ২৯, খেলার মাঠ ২২।

জনগোষ্ঠির প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ৩৮.৬৫%, কৃষি শ্রমিক ২৪.২৩%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৭৭%, মৎস্য ৫.৩৭%, ব্যবসা ৮.৬৯%, চাকুরী ৩.৫৮%, অন্যান্য ১৫.৭১%।[৬]

---

১. বাংলা পিডিয়া, ১০ম খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ৪৪০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

ভূমি ব্যবহার ১০ চাষযোগ্য জমি ২৮৩৯৬.২ হেক্টর। পতিত জমি ২৮১৫.৪৬ হেক্টর। এক ফসলি ৩৮%, দো ফসলি ৪৬%, তিন ফসলি ১৬%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৭৫%।[১]

ভূমি নিয়ন্ত্রণ ঃ ভূমিহীন ৫২.১৩%, ক্ষুদ্র চাষি ১৮%, মধ্যম চাষি ২২%, বড় চাষি ৭.৮৭%। মাথাপিছু আবাদি জমি ০.০৯ হেক্টর।[২]

প্রথম শেণীর আবাদি জমির মূল্য ঃ ০.০১ হেক্টর প্রতি ৬০০০ টাকা।

প্রধান কৃষি ফসল ঃ ধান, পাট, আলু, বেগুন, মরিচ, আখ, বিভিন্ন জাতের ডাল, তৈল বীজ, পান, সুপারি।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ঃ তিল, তিসি, সরিষা, আউশ, আমন ধান।

প্রধান ফল-ফলাদী ঃ আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, পেঁপে, খেজুর।

মৎস্য ও হাঁস-মুরগীর খামার ঃ হাঁসমুরগি ১২, হ্যাচারি ১৭।

যোগাযোগ বিশেষত্ব ঃ পাকা রাস্তা ৩৮০ কি.মি, কাঁচা রাস্তা ৮০০ কি.মি, আধাপাকা রাস্তা ২২০ কি.মি।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন ঃ পাল্কি, নৌকা, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি।

শিল্প ও কলকারখানা ঃ ধানকল ১২৫, আটা ও মরিচ কল ১১০, বরফকল ১২।

কুটিরশিল্প ঃ তাঁত ১১০, বাঁশ ও বেতের কাজ ৬৩৪, কাঠের কাজ ১৯৩, পিতলের কাজ ১৪. পাট ও কাপড়ের কাজ ৩৫, কামার ৪৭, কুমার ৩৭।

হাটবাজার ঃ হাটবাজার ৫২। উল্লেখযোগ্যঃ উছখালী, আফজিয়া, তমুরুদ্দিন, চৌমুহনী, সাগরিয়া, জাহাজমারা ও নলচিড়া বাজার।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ঃ নারিকেল, সুপারি, ধান, পান, কলা, মরিচ, ইলিশ মাছ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১০।

---

১. বাংলা পিডিয়া, ১০ম খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ৪৪০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

সেনবাগ উপজেলা

আয়তন ১৫৫.৮৩ বর্গ কি.মি । উত্তরে নাঙ্গলকোট উপজেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী সদর ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পূর্বে দাগন ভূঁইয়া উপজেলা, পশ্চিমে বেগমগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলা । উপজেলা শহর ৬টি মৌজা নিয়ে গঠিত । আয়তন ১৫.৭০ বর্গ কি.মি । জনসংখ্যা ২৩৫৩০, পুরুষ ৪৯.৩৪%, মহিলা ৫০.৬৬% । জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি ১৪৯৯ জন । শিক্ষার হার ৭১.৩% ।[১]

প্রশাসন ঃ সেনবাগ থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয় ১৯৮৩ সালে । ইউনিয়ন ৯, মৌজা ৯৯, গ্রাম ১১১ ।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ মসজিদ ৩১২, মন্দির ১৪ । উল্লেখযোগ্য- সেনবাগ বাজার জামে মসজিদ ।

জনসংখ্যা ঃ ২১৬৩০৯, পুরুষ ৪৮.২৪%, মহিলা ৫১.৭৬% । মুসলমান ৯৪.৮৯%, হিন্দু ৫.০৪%, খ্রীষ্টান ০.০৭% ।[২]

শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গড় হার ২০.৩%, পুরুষ ২৭.০৭%, মহিলা ১২.৮% ।[৩] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সরকারি কলেজ ১, বেসরকারি কলেজ ২, সরকারি হাইস্কুল ২, বেসরকারি হাইস্কুল ২৩, মাদরাসা ১৯, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৯, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪১ ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ গ্রামীণ ক্লাব ১৭, লেখার মাঠ ১৪ ।

জনগোষ্ঠির প্রধান পেশাসমূহ ঃ কৃষি ৩০.১৪%, কৃষি শ্রমিক ১৬.৬৬%, অকৃষি শ্রমিক ১.৯৬%, ব্যবসা ১০.৯৯%, পরিবহণ ২.৫২%, চাকুরী ২৩.৫৪%, অন্যান্য ১৪.১৯% ।[৪]

ভূমি ব্যবহার ঃ চাষযোগ্য জমি ১২১৪৪.৮৮ হেক্টর । পতিত জমি ৯২৩.৫১ হেক্টর । সেচের আওতায় আবাদি জমি ২৪% ।[৫]

ভূমি নিয়ন্ত্রণ ঃ ভূমিহীন ৩২%, ক্ষুদ্র চাষি ৩০%, মধ্যম চাষি ২৬%, বড় চাষি ১২% । মাথাপিছু আবাদি জমি ০.০৫ হেক্টর ।

---

১. বাংলা পিডিয়া, ১০ম খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ২৫২ ।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২ ।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২ ।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২ ।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২ ।

প্রথম শ্রেণীর আবাদি জমির মূল্য ঃ ০.০১ হেক্টর প্রতি ৬০০০ টাকা ।

প্রধান কৃষি ফসল ঃ ধান, পাট, গম, আখ, আলু, বেগুন, তৈল বীজ, পান, সুপারি, বিভিন্ন জাতের ডাল ।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ঃ তিল, তিসি, সরিষা, মিষ্টি আলু, আউস ।

প্রধান ফল-ফলাদী ঃ আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, পেঁপে, খেজুর ।

হাঁস-মুরগীর খামার ঃ হাঁস-মুরগির খামার ১০ ।

যোগাযোগ বিশেষত্ব ঃ পাকা রাস্তা ১৯৪ কি.মি, কাঁচা রাস্তা ২৭৫ কি.মি, আধাপাকা রাস্তা ৮৮ কি.মি ।[১]

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন ঃ পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা ।

শিল্প ও কলকারখানা ঃ ধানকল ৭০,আটা ও মরিচকল ৪৮, বরফকল ৬ ।

কুটিরশিল্প ঃ তাঁত ১৬৮, কামার ৬১, কুমার ৪৮, কাঠের কাজ ১৬৩, পিতলের কাজ ২৫, পাট ও কাপরের কাজ ২৯, বাঁশ ও বেতের কাজ ৪৮০ ।

হাটবাজার, মেলা ঃ হাটবাজার ২২, মেলা ১ । উল্লেখযোগ্য : সেনবাগ বাজার, কানকির হাট, ছমির মুন্সির হাট ও দরবেশ হাট ।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ঃ নারিকেল, ধান, কলা, সুপারি ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৯ ।

---

১. বাংলা পিডিয়া, ১০ম খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, (সম্পা), ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ২৫২ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নোয়াখালী জেলায় ইসলাম প্রচারে আলেম ওলামাদের ভূমিকা

বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ)-এর পৌত্র বলে কথিত মীরানশাহ তাননূরী (রহঃ) সর্বপ্রথম নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন বলে জানা যায়। কল্লা শহীদ (রহঃ) বৃহত্তর নোয়াখালী-ফেনী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন বলে কথিত। তিনি শাহ্‌জালাল (রহঃ)-এর সহচর ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। তরফ বিজয়ী ১২ আউলিয়ারও তিনি একজন। তিনি প্রধানত তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচার করেন। কুমিল্লা খরমপুরে তাঁর মাযার অবস্থিত। ফেনীর শরিসাদিতে তাঁর আস্তানা ছিল। নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে হযরত মীরান শাহ্ (রহঃ)-এর অবদানই সর্বাধিক।[১] হাজীগঞ্জ স্টেশনের ১২ মাইল দক্ষিণে কাঞ্চনপুরে তার মাযার অবস্থিত।

নোয়াখালী অঞ্চলে অনেক পীর-দরবেশ ইসলাম প্রচার করেন তম্মধ্যে হরিচরে মিয়া সাহেব বাগদাদী, আহসান অথবা হাসান শাহ, ইয়াকুবকুরী, আবদুর রাহীম লাহোরী, আজম শাহ, শাহ্ যকীউদ্দনি শাহ, আমীরুদ্দীন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। হযরত শাহ্ জালাল (রহঃ)-এর সাথী বলে কথিত শায়খ জালালুদ্দীন, শায়খ হারুন, শায়খ ইনায়াত করমবস্ত, শায়খ মাহবুব ও মিয়া সাহেব বাগদাদী নোয়াখালীতে ইসলাম প্রচার করেন বলেও কথিত।[২]

ওমর শাহ বা আম্বর শাহ নামে একজন পারস্যবাসী পীর নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানায় অবস্থিত বজরা নামক এলাকায় ইসলাম প্রচার করতেন। আম্বর শাহ, আনওয়ার শাহ শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে হয়। ঐ এলাকার বহু অমুসলিম তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বংশধরগণ পরবর্তী কালে অনেক এলাকায় ইসলাম প্রচারে উল্লেখযোগ্য

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, সেপ্টে. ১৯৯৩, পৃ. ২৩৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

অবদান রেখেছেন। তাঁর নৌকা আকারে অনেক বড় ছিল। এতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এ ধরণের নৌকাকে বজরা বলা হয়। তাঁর নৌকার নাম অনুসারে ঐ এলকার নাম বজরা রাখা হয়। বর্তমানে বজরা বলে একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এটি একটি ঐতিহাসিক স্থান। সেখানে মুগল আমলের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জামে মসজিদ[১] ও মাযার রয়েছে। উপরিউক্ত পীর আম্বর শাহ-এর পরামর্শক্রমে তদানীন্তন দিল্লীর মুগল সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ দিল্লীর আমানুল্লাহ খান ও সানাউল্লাহ খান নামক দুই সহোদরকে স্থায়ীভাবে ঐ এলাকায় বসবাস করতে প্রেরণ করেন। বজরার ঐতিহাসিক জামে মসজিদ ১৭৪১ সালে আমানুল্লাহ খান নির্মাণ করেন। এই মসজিদের অনতিদুরে আম্বর শাহ-এর মাযার অবস্থিত। বজরা জামে মসজিদের প্রধান গেইটের উপরস্থ শিলালিপিতে আমানুল্লাহ নাম উল্লিখিত আছে ।

মাওলানা ইমামুদদীন[২] চৌমুহনী বাজারের আড়াই মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকস্থ হাজীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতার নাম তমুল্লা ভূঁইয়া।[৩] নোয়াখালীর বিখ্যাত দারোগা বাড়ীর সাবের খার নিকট হতে দানসুত্রে সাদুল্লাপুরের বাড়িটি প্রাপ্ত হন এবং ইমামুদ্দীন সেখানে চলে আসেন। সাদুল্লাপুর নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদি হতে চার মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। তিনি শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (রহঃ)-এর নিকট তাসাউফের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দিল্লীর বুযুর্গ শাহ গোলাম আলীর শাগরিদত্বও গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৪] পরবর্তীকালে তিনি সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরেলবী (রহঃ)-এর শাগরিদত্ব গ্রহণ করেন।[৫] তিনি শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) ও মাওলানা আবদুল হাই দেহলবী (রহঃ)-এর সাহচর্যও লাভ করেন। তাঁর মুরশিদের সাথে হজ্জ সমাপনান্তে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৬] মাওলানা ইমামুদ্দীন অনানুষ্ঠানিকভাবে শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)-এর নিকট সিহাহ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর অন্যতম প্রধান খলীফা।

---

১. ১৭৪১ খ্রী.।

২. জন্ম ১৭৮৮ খ্রী, মৃ. ১৮৫৭ খ্রী।

৩. ড. এম. আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৬।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৫. ১২৩৫/১৮২০।

৬. ১৮২৪ খ্রী.।

তিনি বালাকোটের জিহাদে মুরশিদের সাথে শরীক ছিলেন, এতে তিনি গাযী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর ভাই আলীমুদ্দীন ঐ জিহাদে শহীদ হন। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর শাহদাতের পর ইমামুদ্দীন নোয়াখালীতে ফিরে আসেন এবং হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[১] অনেক আলিম ও সুফি-সাধক তাঁর দরবারে আসতেন। মশুরি খোলার শাহ আহসানুল্লাহ (রহঃ) কিছুদিন তাঁর খিদমতে ছিলেন। তিনি তাঁর বহু কারামতের কথা বলে গেছেন।

তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর বড় জামাতা মাওলানা মাহমুদ আলী তার খলিফা ছিলেন। চট্টগ্রামের খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ প্রণীত 'আনওয়ারুন-নায়্যি রায়ন ফী আখবারিল- খায়্যিরায়ন' নামক গ্রন্থে মাওলানা ইমামুদ্দীন ও তদীয় পীরভাই সূফী নূর মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর জীবন ও কর্ম লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি তাঁর আর এক গ্রন্থ আহাদীসুল খাওয়ানীন-এ মাওলানা ইমামুদ্দীনকে ফাযিল, আলিম, আমিল, হাজী, মুজাহিদ, গাযী, ইমামুল মুসলিমীন, বলে অভিহিত করেছেন।[২]

মাওলানা কারামত আলী (রহঃ)[৩] বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় ইসলাম প্রচারকালে এখানে তিনি একটি বিবাহ করেছিলেন। নোয়াখালীর অধিবাসী ড. এম আবদুল কাদের লিখেছেন, ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে এ দেশে যাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক তাঁর নাম মাওলানা কারামত আলী।[৪] এই অবদান কেবল ব্যক্তিগত নহে, বংশানুক্রমিক এবং নোয়াখালীতেই তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক। তিনি নৌকাযোগে অধিক সফর করতেন, যেখানে নৌকা চলিত না সেখানে যেতেন পালকিতে, কখনও বা পদব্রজে।

দরবেশ পাগলা মিঞা[৫] ১২৩০ বঙ্গাব্দ তথা ১৮২৩ সালে ফাজিলপুর ছনুয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। জানা যায় যে, তাঁর পুর্বপুরুষ সায়্যিদ কুতুবুল আলীম ছিলেন কামিল দরবেশ শাহ জালাল (রহঃ)-এর অন্যতম

---

১. ড. এম. আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৪।
২. ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, সেপ্টে. ১৯৯৩, পৃ. ২৩৯।
৩. জন্ম ১৮০০ খ্রী., মৃ., ১৮৭৩ খ্রী.।
৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, সেপ্টে. ১৯৯৩, পৃ. ২৩৯।
৫. তাঁর প্রকৃত নাম সায়্যিদ বাশীরুদ্দীন।

সহযাত্রী। ফেনী ও তৎসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তারকারী দরবেশ পাগলা মিঞা মাত্র ৬৩ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ সালে ইন্তেকাল করেন।[১] তাঁর নিজ আস্তানায় তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা ক্বারী ইবরাহীম (রহঃ) নোয়াখালী জেলার নলুয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি বাল্যকাল হতে সাদাসিধাভাবে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন বিধায় কলকাতার জাকজমকপূর্ণ পরিবেশ তাঁর মনঃপুত হয়নি। তাই তিনি মক্কা শরীফে গিয়ে তথাকার সাওলতিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ঐ মাদরাসায় ইলমে ক্বিরা'আত ও দ্বীনী শিক্ষা শেষ করে তিনি ঐ মাদরাসারই শিক্ষক হন ও ১০ বছর ঐ কাজে নিয়োজিত থাকেন।[২] ঐ সময় তিনি মক্কা শরীফে এক আরব কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুদিন পর তিনি পরিবারসহ দেশে আসেন। দেশে ইলমে ক্বিরা'আত ও ইলমে-দ্বীন শিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দৌলতপুর গ্রামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত ভাবে কুরআন পাকের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ)-এর খলীফা ছিলেন। তিনি সর্বদাই আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কোন কথা বলতেন না। তিনি বিদ'আত এর ঘোর বিরোধী ছিলেন।

বাংলাদেশর ইতিহাসে হাফেজ্জী হুজুর মোহাম্মাদুল্লাহ-এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর খলীফা ছিলেন। তিনি প্রায় দুই শতাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কতিপয় দ্বীনি পুস্তকও রচনা করেন। বিদ'আত, শিরক ও কুসংস্কার দুরীকরণে হাফেজ্জী হুজুরের সবিশেষ অবদান রয়েছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।[৩]

এছাড়াও বটতলী মাদরসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল আযীয, মাওলানা নুরুদ্দীন, মৌলভী ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ নোয়াখালী জেলায় ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নোয়াখালীর প্রায় সকল থানায় স্থানে স্থানে পীর দরবেশদের মাযার রয়েছে।[৪] যাঁদের কারো কারো কিছু পরিচয় জানা গেলেও অনেকের সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর কিছুই জানা যায়না।

---

১. বাংলা ১২৯৩ সনের ১৩ শ্রাবণ, রোজ বুধবার।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, সেপ্টে. ১৯৯৩, পৃ. ২৪০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর যুগ
(১৮৮৬ - ১৯৭৪)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) ১৮৮৬ সালে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানায় জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় বাংলা ছিল বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রদেশ। তাঁর জীবন-পরিক্রমায় পরপর তিনবার শাসনব্যবস্থা (বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) পরিবর্তনের ফলে তদানীন্তন বাংলার রাজনীতিতেও ভিন্নরুচি ও ভিন্ন স্বাদের পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর শৈশব ও যৌবনে এ পরিবর্তনের ধারা কিছুটা প্রভাবিত যা পরবর্তী সময় তার কর্ম ও চিন্তাধারায় প্রকাশ পায়। তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন আমল।

খ) পাকিস্তানী শাসন আমল।

গ) বাংলাদেশ আমল।

নিম্নে তাঁর সমসাময়িক প্রতিটি শাসনামলের আলোচনা তুলেধরা হলো।

ক) ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন

১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের মাধ্যমে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। এ সুবাদে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইংরেজগণ এদেশের বিদ্যামান রীতি-নীতি, শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্কারসাধন করে প্রভূত উন্নতি সাধনের পাশাপাশি এদেশের রাজনীতিতে ঔপনিবেশিক মনোভাবের লালন করেন। ভেদনীতির (Devide and rule policy) শাসন চালিয়ে তারা এদেশের প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় (হিন্দু-মুসলিম)-কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিদ্বিষ্ট করে রাখেন। যার ফল হয় সুদূর প্রসারী। শাসক শ্রেণীর পরিচালিত এ ভেদনীতির শাসনে এদেশীয় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত ও দ্বন্দ্বমুখর হয়ে উঠে।

---

১. বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

২. ১৮৮৬-১৯৪৭।

৩. ১৯৪৭-১৯৭১।

৪. ১৯৭১-১৯৭৪।

৫. Devide and rule policy.

১৯০৫ সালে ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গ আদেশ[1] বাস্তবায়িত করার ফলে উক্ত বিদ্বেষ আরো ঘনীভূত হয়। পুনরায় ১৯১১ সালে এদেশীয় হিন্দু ও কতিপয় বিশিষ্ট মুসলিম নেতার প্রবল বিরোধীতার ফলে ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গ আদেশ রহিত করেন। এতে মুসলিম স্বার্থ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের তিক্ততা এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবধান বেড়ে যায়।

'বঙ্গবিভাগ' ও 'বঙ্গবিভাগরদ' এ দুটি ঘটনা ছিল বিশ শতকে উপ-মহাদেশের সুদূর প্রসারী রাজনীতির গতিধারার একটি প্রারম্ভিক মাইল ফলক। এর ফলে হিন্দু মুসলিম জাতির মধ্যে যেমন পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি এ দুটি জাতির রাজনীতি হয় দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় থেকেই ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ এদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণ এবং উন্নতির স্বার্থে একটি উপযুক্ত রাজনৈতিক মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আদেশ[2] বাস্তবায়িত হওয়ার পর হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের[3] বৈমাত্রেয় ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণে মুসলিম নেতাদের মনে এ ধারণার যৌক্তিকতা আরো দৃঢ়ভাবে বদ্ধমুল করে দেয়। উক্ত ধারণাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে[4] সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সভায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।[5]

---

[1] এ আদেশের মাধ্যমে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গটিত ভূ-খন্ড বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গাসাম এ দুটি প্রশাসনিক প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) এ আদেশ ঘোষণা করেন। উক্ত আদেশের ফলে পশ্চিমঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে পূর্ব বঙ্গাসাম প্রদেশ গঠিত হয়। নবগঠিত প্রদেশ দুটির আয়তন ও লোকসংখ্যা হয় যথাক্রমে ১৪১,৫৮০০ বর্গমাইল ও ৫৪,০০০,০০০ জন এবং ১০৬৫০৪ বর্গমাইল ও ১৪১৫৮০০ জন। কলকাতাকে রাজধানী করে বড়লাটের অধীনে এবং ঢাকাকে রাজধানী করে ছোটলাটের যথাক্রমে বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গাসাম প্রদেশকে ন্যস্ত করা হয়। উভয় বাংলার বিচার বিভাগ পূর্ববৎ কলকাতা হাইকোর্টের অধীন রাখা হয়। (দৈনিক মিল্লাত, ১৯৯০, এয়োদশ সংখ্যা ফিচার পাতা থেকে উদ্বৃত)

[2] ১৯০৫ খ্রী.।

[3] ১৮৮৫ খ্রী.।

[4] ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার শাহবাগ অর্থাৎ এখানকার কলাভবন নওয়াব সলিমুল্লাহ 'প্রণীত মুসলিম অল-ইন্ডিয়া কনফেডারসি'-এর উপর ভিত্তি করে অল ইন্ডিয়া মুসিলম লীগ গঠিত হয়।

[5] ড. এম. আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩২।

১৯১৫ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নওয়াব সলিমুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম লীগ উদারনৈতিক শিক্ষিত মুসলিম যুবশ্রেণী প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁরা রাজভক্তি পরিহার করেন এবং তার পরিবর্তে দেশের স্বায়ত্বশাসন আদায়ের জন্য সংগ্রামী তৎপরতা জোরদার করেন। তাঁরা এ উদ্দেশ্যে দেশে হিন্দু-মুসলিম মিলনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের এ মিলনধর্মী রাজনীতির ধারা ১৯১৬ সালের লাক্ষ্ণৌ চুক্তি থেকে আরম্ভ করে ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'নেহেরু রিপোর্ট' রচিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মোট একযুগ স্থায়ী হয়। মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে পুনরায় মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস-এর রাজনীতি ভিন্ন পথ ধরে এগুতে থাকে। রাজনীতির এ দুটি স্বতন্ত্র প্রবাহ শেষ পর্যন্ত উপ-মহাদেশের মানচিত্র বদলে দিয়ে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের রূপ ধারন করে। ১৯২৪ সালে তুরস্কে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুস্তফা কামালপাশা ক্ষমতা দখল করেন। ইংরেজ শাসনের এই সময় এদেশের মুসলিম উলামাদের রাজনীতিতে দুটি জাতীয়তাবাদী স্রোতধারা প্রবাহিত হয়। যেমন-

১। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দর্শন।

২। 'উলামায়ে ইসলাম' এর-'দ্বিজাতিতত্ব' সমর্থিত রাজনৈতিক দর্শন।

এদেশের অধিকাংশ বিখ্যাত আলেম এবং মুসলিম জ্ঞানী ও গুণীজন জমিয়তে উলামা এ হিন্দে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) রাজনীতি থেকে দুরে থাকলেও কোন রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক ছিলেন তা জানা যায়নি।

১৯৫৩ সালে ভারত শাসন আইন জারী করা হয়। এই আইনের দ্বারা বাংলায় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সুবাদে ১৯৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগ বেশ সাফল্য লাভ করে। মুসলিম লীগ ও প্রজাপার্টি যৌথভাবে সরকার গঠন করে। এর ফলে প্রায় দু'শতাব্দী কাল[১] দুরাবস্থায় জীবন অতিবাহিত করার পর বাংলার জনগণ পুনরায় তাদের রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পায়। ১৯৪৫ সালে ভারতব্যাপী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিজয় লাভ করে। ১৯৪৬ সালে

---

[১] ১৭৫৭-১৯৩৭

বৃটিশ সরকারের মন্ত্রী মিশন ভারতে হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের হটকারিতা ও অনমনীয় মনোভাবের দরুন এ মিশনও ব্যর্থ হয়। ইংরেজ শাসকগণ ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হন যে দেশ বিভাগ ছাড়া ভারতের হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধান অসম্ভব। তাই তারা বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ করেন। এ আইন বলে ১৯৪৭ সালে ১৪ আগষ্ট অখণ্ড ভারত খন্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।

খ) পাকিস্তানী শাসনামল[১] ঃ

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করে ১৯৪৭ সালে ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, চশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের সিলেট জেলা এবং কিছুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য নিয়ে দেশটি গঠিত। পাকিস্তান রাজ্য ভারতের উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত দুটি ভূখন্ডে বিভক্ত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশসহ ভারতের বিভিন্ন স্তান হতে আগত উর্দূভাষী বিহারী সম্প্রদায় বাংলাদেশে আগমন করে। তারা এখানকার কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি-বাকরিতে নিয়োজিত হন। কালক্রমে এরা এদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লেগে যান এবং রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শিল্প-বানিজ্য ও রেলওয়ে প্রধান অঞ্চলে বসবাস করা শুরু করেন।

গ) বাংলাদেশী শাসন আমল[২] ঃ

বাংলাভাষা ভিত্তিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই বাংলাদেশ সৃষ্টি করা হয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভাষার ঐক্যের ভিত্তিতে অর্জিত হয়। তাই এদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমম্বয়ে নিরপেক্ষ সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা চলে। মাতৃভাষা এক না হওয়ার কারণে অবাঙ্গালী মুসলমানগণ দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিকে পরিণত হয়ে যান।

উপরিউক্ত তিনটি শাসনামলে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায়ই ও মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর শিক্ষকতা জীবন এমনকি জীবন সায়াহ্নে আধ্যাত্মিক জীবনে কোন বৈরী প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং তিনি এসব ঘটনাপ্রবাহ গভীর উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করেন।

---

১. ১৯৪৭-৭১
২. ১৯৭১-৭৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থা

বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটে মুগল শাসনামলে। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিক হলো তাদের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ড। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা ছিল অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ।[১]

উনিশ শতকের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের সবচেযে বড় বৈশিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ। দেশের অর্থনীতির অন্য কোন খাতে এত বিস্তার দেখা যায়নি। জঙ্গল ভূমি পরিস্কার করে আবাদ কাজ পরিচালনা দেশের কৃষি অর্থনীতির বড় দিক।[২]

কৃষিযোগ্য পতিত জঙ্গল ভূমি আবাদ করার জন্য অনেক জমিদার আবাদ তালুক সৃষ্টি করে নামেমাত্র খাজনার মধ্য স্বত্বাধিকারীর কাছে তা বন্দোবস্ত দেন। বস্তুত নগদ সেলামী দিয়ে মধ্য স্বত্বাধিকারীরা তালুক কিনে নেন এবং নিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে ঐসব পতিত জমি কৃষিযোগ্য করে তোলেন। মধ্য স্বত্বাধিকারীদের পুঁজি বিনিয়োগ ও উদ্যোগের ফলে উনিশ শতকের কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। প্রধান প্রধান আবাদ এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের সমগ্র উপকূল অঞ্চল, নোয়াখালীর উপকূল অঞ্চল, মেঘনা ব-দ্বীপ এলাকা, সুন্দরবন এলাকা, বরেন্দ্র এলাকার অনেক অংশ এবং উত্তর-পূর্ব বাংলার হাওড় অঞ্চল। বাংলার কৃষি অর্থনীতির ইতিহাসে তুলা, নীল, আফিম, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি অর্থকারী ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব ফসলের সঙ্গে জড়িত ছিল বাংলার কৃষককুল ও অন্যান্য মধ্যবেপারীর ভাগ্য।[৩]

প্রাক উপনিবেশ যুগে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সুতি, রেশম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হতো। চট্টগ্রাম থেকে পূর্ণিয়া পর্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন মানের তুলা উৎপন্ন হতো। সর্বোৎসৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হতো ঢাকায়। আঠার শতকের শেষ দশক থেকে তাতজাত পন্য রপ্তানী হ্রাস পেতে থাকায় তুলার আবাদও কমতে থাকে। বিশ্বযোগাযোগের

---

১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাদেশর ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংরাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩-খ্রী., পৃ.১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

উন্নয়ন ও বিশ্ববাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের প্রথম থেকে নীলের আবাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৫০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার নীলের চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে। চাষীদের জন্য নীল চাষ ছিল একটি অত্যাচারের মাধ্যমে। নীল উৎপাদনে অনিচ্ছুক চাষীদের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে অবশেষে ইউরোপীয় নীল করেরা নীল চাষে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নেয়। ১৮৬০-এর দশকে বাংলার নীল চাষ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। পরবর্তীতে নীলের স্থান দখল করে নেয় আরেকটি অর্থকারী ফসল পাট। পাট উৎপাদন শুরু হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে। ব্যাপক হারে পাট চাষ এবং পাট আশের বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয় ১৮৭০-এর দশক থেকে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে পাট বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে নেয়। কৃষি আয়ের উৎস হিসেবে পাটকে তখন তুলনা করা হয় স্বর্ণের সঙ্গে। কিন্তু এই স্বর্ণ আঁশের স্বর্ণ যুগ শেষ হয় ১৯২৬ সনে। ১৯৩০ সালে পাট অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে।[১]

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ধান চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ জনপদগুলো ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। কৃষি অর্থনীতিতে বর্তমানে আলু, ডাল, পিয়াজ আরো অন্যান্য ফসল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। দেশের অর্থনীতিতে পোষাক শিল্প, মৎস্য ইত্যাদি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু বাস্তব পন্থা অবলম্বন করেন। যেমন- অসহায়, ইয়াতীম ও দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

---

[১] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাদেশর ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংরাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩-খ্রী., পৃ.২১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

একটি দেশ বা জনপদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সে দেশের রাজনৈতিক আধিপত্য ও দর্শনের সঙ্গে জড়িত, বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ব্রাহ্মন্য, বৌদ্ধ ও ইসলামী সংস্কৃতি এবং সর্বশেষ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত হয়েছে ।[১]

সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারায় মুসলমানদের মধ্যেই সামাজিক শ্রেনী বিন্যাস গড়ে ওঠে। তারা কুলীন ও অকুলীন এই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। কূলীন বলতে সৈয়দ, শেখ (আরব), পাঠান, তর্কী ও মুসলমাদের বুঝায়।[২] গরীবরা ছিল সাধারণত অকূলীন। কুলীন মুসলমানরা অকুলীন মুসলমানদের চাইতে নিজদেরকে সভ্য ও শিক্ষিত মনে করত। বিয়ে-শাদীতে একসাথে বসে ভোজন করত না।[৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যের শিক্ষা সভ্যতার প্রসার ঘটায় এবং অর্থনৈতিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় কুলীন সমস্যার অনেকটা বিলুপ্তি ঘটে।[৪]

মাওলানা আকরাম খাঁ তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন-"বাংলার মুসলিম সমাজের পাশাপাশি ইতিহাস জানতে হলে বঙ্গ দেশের ও তার সমসাময়িক হিন্দু অধিবাসীদের ইতিহাসও জানতে হবে।"[৫] ধীরে ধীরে মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের একটি অংশ ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে, ফলে সমাজে বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমান বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশ শতকের শুরু থেকেই মুসলমান লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদগণ আরবী ও ফার্সী ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করেন।[৬]

---

১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাদেশর ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংরাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩-খ্রী., পৃ.১ ।

২. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ রেখা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৮ খ্রী., পৃ.৬৮ ।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩ ।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪ ।

৫. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ অফিস, ঢাকা ১৯৬৫ খ্রী. পৃ. ৫৮-৫৯ ।

৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাদেশর ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংরাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩-খ্রী., পৃ.৭৩১ ।

মুস্তফা নূর উল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন- "শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ অনুকরণে জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ কোট প্যান্ট, সার্ট ব্যবহার করা, ইংরেজী ফ্যাশনে কলার, নেকটাই পরিধান করা, হুক্কা, তামাক ছাড়িয়া সিগারেটের ধুমোদগার করা, আহারের সময় চেয়ার টেবিল ব্যবহার, হাতের পরিবর্তে কাঁটা চামুচ, ছুরি ব্যবহার। হিন্দুর অনুকরণে আচকান, পায়জামার পরিবর্তে ধুতি, চাদর, টুপির স্থলে নগ্নমস্তক ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার নির্দেশন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।"[১]

সমাজের গুটি কয়েক ব্যক্তি ও পরিবারে এ ধরণের চিত্র সাধারণত দেখা যায়। মুসলিম জনসাধারণ কোন সময়ই তাদের সনাতন সভ্যতা থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়নি।

ড. এম. এ. রহিম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন-"বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নয়নে শায়খ, আলিম-উলামা সম্প্রদায় তাঁদের ধর্ম প্রচার মূলত শিক্ষাগত ও মানব হিতৈষনামূলক কার্যাবলীর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেগেছেন। তাঁরা সমাজের নৈতিকতার উন্নয়ন সাধন করেছেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের তাওহীদী ধর্মমত জনপ্রিয় করে তুলেছেন এবং শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তারে সহায়তা দান করেছেন। তাঁরা মুসলমানদের সংহতির মনোভাব সৃষ্টিতেও সাহায্য করেছেন। এবং মুসলমানদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন।"[২]

ফলে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠে। মানুষের আচার আচরণে কথা-বার্তায়, চিন্তা-চেতনায় ইসলামী ভাবধারা বিরাজমান। রাজনৈতিক ভাবে মানুষের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ঐক্যের সুর অনুরণিত। মানুষের সামাজিক কর্মকান্ড ও সংস্কৃতি সেই সমাজের ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠে, মানুষের দৈনন্দিন জবিনে এর ছাপ সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিশেষে বলা যায় যে, মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর সময়ে নোয়াখালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা উপরে বর্ণিত বিবরনের প্রায় অনুরূপ।

---

[১] মুস্তফা নূর উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রী. পৃ. ৭২।

[২] ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংরার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতহাস, ১ম খণ্ড ভূমিকা দ্র., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রী.।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম সাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থা

ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর সময়ে নিম্নলিখিত তিন প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল ।

ক) ধর্মীয় শিক্ষা ।
খ) পাশ্চাত্য শিক্ষা ।
গ) সমন্বয়ীয় শিক্ষা ।

ক. ধর্মীয় শিক্ষা ঃ

এদেশে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ওল্ডস্কীম মাদরাসা শিক্ষা ও কওমী মাদরাসা শিক্ষা নামে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি চালুছিল । কলকাতা আলিয়া মাদরাসা[১] কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতিটি ওল্ডস্কীম মাদরাসা শিক্ষা নামে এবং দারুল উলূম দেওবন্দ[২] কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিটি কওমী মাদরাসা শিক্ষা নামে অভিহিত হত ।[৩]

---

[১] পলাশী বিপর্যয় উত্তরকালে নব্য ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের মাঝে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ছিল অন্যতম । ১৭৬৫ সালে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব ব্যবস্থা ইংরেজ কোম্পানীর হাতে চলে যাওয়ায় এদেশের মুসলমানগণ ক্রমান্বয়ে মারাত্মক আর্থিক দুরাবস্থায় নিপতিত হয় । প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা-দীক্ষা দানে অক্ষম হয়ে পড়েন । এমনকি এককালের বড় বড় মুসলিম পরিবারগুলোও নিজ সন্তানদেরকে উচ্চমানের সরকারি পেশার উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ব্যর্থ হন । এ সময় কলকাতার গণ্যমাণ্য শিক্ষিত মুসলমান প্রতিনিধিগণের একটি দল বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের তরুণদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাংলার তৎকালীন বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর নিকট আবেদন করেন । তাদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে এবং ইংরেজ সরকারের এক বিশেষ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বড়লাট এ প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন । এবং ১৭৮০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন ।

[২] "দারুল উলূম দেওবন্দ" ১২৮৩ হিজরীর ১৫ই মুহাররাম (৩০জুন,১৮৭৬ খ্রী.) উত্তর ভারতের যুক্ত প্রদেশের দেওবন্দ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় । এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানূতূবী (মৃ. ১৮৮০ খ্রী.) । তিনি ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ পরিবারের সদস্য মাওলানা রশীদ উদ্দীনের ছাত্র মাওলানা মামলুক আলী নানূতূবীর সুযোগ্য শিষ্য । ইসলামের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনার উজ্জীবন, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম বিরোধী শক্তি প্রতিহত এবং ম্রিয়মান ভারতীয় মুসলিম শক্তিকে সুসংহত করার নিমিত্তে এ মাদরাসার গোড়া পত্তন হয় । প্রতিষ্ঠানটি হলো মূলত এক শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ । অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠানের প্রণীত পাঠ্যক্রম ও অবকাঠামো অবলম্বন করে উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ধারা চালু রয়েছে ।

[৩] আবুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ১৯৮০ খ্রী., পৃ. ৮ ।

ওল্ডস্কীম মাদরাসা শিক্ষা ঃ

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার[৪] শিক্ষা কাঠামো ও সিলেবাসের অনুসরনে এদেশে অনেক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউশন গড়ে ওঠে।[১] এসব প্রতিষ্ঠানে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, উসুলূল ফিক্‌হ, কালাম, বালাগাত মান্‌তিক, হিকমাত, নাহু, সরফ ও অংক শিক্ষা দেওয়া হত।[২] পরবর্তী সময়ে যুগের চহিদানুযায়ী সাহিত্য, ফারায়িয্‌ (উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন বিদ্যা) ও বিতর্ক বিদ্যা, আকাইদ (ধর্মতত্ত্ব), জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, হাদীস ও ফিক্‌হের ইতিহাস, ইসলামরে ইতিহাস, আধুনিক বিজ্ঞান, ভূগোল ও দর্শনের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৩] ১৯০৩ সালে মাদরাসাকে আলিয়া স্তরে উন্নীত করে তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসে উচ্চতর (কামিল) ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কামিল স্তর প্রথমে তিন বছর মেয়াদী ছিল। পরবর্তী সময় এ সময়সীমা হ্রাস করে দু'বছর মেয়াদী করা হয়। বর্তমানে কামিল শ্রেনীতে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের পাশাপাশি ফিক্‌হ ও সাহিত্যে (আদব) দু'বছর মেয়াদী ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমানে মাদরাসায় সূচীকর্ম, সূতার কর্ম ও সাবান তৈরী ইত্যাদি বৃত্তিমূলক বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া কামিল প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রের জন্য একটি বিশেষ গবেষণা বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগে নির্দিষ্ট হারে আর্থিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে আরবী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় অনেক মূল্যবান গবেষণাকর্ম সাধিত হয়েছে। শুরুতে মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী ও ফার্সী, পরবর্তীতে আরবী, উর্দূ এবং বর্তমানে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্নে মাদরাসার শিক্ষা কাঠামো সমকালীন সমাজ জীবন, আধুনিক বিদ্যা এবং বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ছিল সম্পর্কহীন। তখন প্রাচীন ধারার ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। বর্তমানে বিভিন্ন সময় নানাভাবে পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে আলিয়া মাদরাসার সিলেবাস যুগোপযোগী করা হয়েছে।[৪]

---

১. আবুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ১৯৮০ খ্রী., পৃ. ৮।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

প্রথম প্রথম ঘরোয়াভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হত, তখন বছরে শেষবারের মত একবার পরীক্ষা নেওয়া হত। শিক্ষার্থীর নির্ধারিত কোন কিতাবের পাঠ সম্পূর্ণ করলে প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগত ভাবে নিজস্ব নিয়মে এ পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি তাঁকে পরবর্তী শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য সুপারিশ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সনদ প্রদান করতেন। এ নিয়ম ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও ঝুকিবহুল, কেননা এক ব্যক্তির মর্জির অধীন শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা ন্যাস্ত ছিল। ফলে তাঁর যোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ছিল যথেষ্ট ঝুঁকি। এতে মেধা ও প্রতিভার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই সরকার উক্ত নিয়ম রহিত করে মাদরাসায় ১৮২১ সাল হতে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালূ করেন। ১৮২৯ সাল হতে মাদরাসার মূল ভবনে নিয়মিত বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করা শুরু হয়। ইঙ্গ-আরবী বিভাগের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য হেড মৌলভীকে সভাপতি করে একটি কমিটি এবং ইঙ্গ-ফার্সী বিভাগে একই উদ্দেশ্যে হেড-মাষ্টারের সভাপতিত্বে অপর একটি কমিটি গঠন করে এ পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালু হয়। উভয় কমিটি নিজ নিজ বিভাগের শ্রেণীসমূহের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রশ্নের ইংরেজী অনুবাদসহ উত্তরপত্র শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালকের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হত।

১৯২৭ সালে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড গঠন করা হয়। মাদরাসার অধ্যক্ষ নিজ পদাধিকার বলে বোর্ডের রেজিষ্ট্রার, হেড-মওলবী, সহকারী রেজিষ্ট্রার এবং এসিসটেন্ট ডাইরেকটর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন ফর মোহামেডান এডুকেশন সভাপতি নিয়োজিত হন। তখন হতে উক্ত বোর্ডের অধীনে নিম্নলিখিত নিয়মে মাদরাসাসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ করার নিয়ম চালু হয়।[১]

১। সিনিয়র দ্বিতীয় বর্ষে ৮০০ নাম্বারের একটি আলিম পরীক্ষা।

২। সিনিয়র চতুর্থ বর্ষে ৯০০ নাম্বারের একটি মমতাযুল মুহাদ্দিসীন (এম. এম.) পরীক্ষা ও

৩। কামিল কোর্সের সমাপ্তিতে ১০০০ নাম্বারের একটি মমতাযুল ফুকাহা (এম. এফ) পরীক্ষা।

---

১. আবুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ১৯৮০ খ্রী., পৃ. ১৫।

১৯৪৬ ও ১৯৪৯ সালে এ নিয়ম সংস্কার করে বর্তমানে নিম্নরূপে মাদরাসা আলিয়া ও তৎকেন্দ্রিক ওলডস্কীম মাদরাসাসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।[১] দাখিল (প্রবেশিকা) শেষ বর্ষের সমাপ্তিতে এবং আলিম, ফাযিল ও কামিল প্রত্যেক স্তরে দুই বছর মেয়াদী কোর্স সমাপনের পর বর্তমানে যুগের চাহিদানুযায়ী দাখিল (এস. এস. সি) আলিম (এইচ. এস. সি) ফাযিল (স্নাতক) এবং কামিল ডিগ্রী পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মানে উন্নীত। বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষাকাল ষোল বছরে উন্নীত হয়েছে। এ সময়সীমায় শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত পাঁচটি স্তর অতিক্রম করতে হয়।

১. ইবতেদায়ী তথা প্রাথমিক স্তর পাঁচ বছর।
২. দাখিল তথা এস, এস, সি পাঁচ বছর।
৩. আলিম তথা এইচ, এস, সি দুই বছর।
৪. ফাযিল তথা স্নাতক দুই বছর।
৫. কামিল তথা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট দুই বছর।

ইবতেদায়ী স্তরকে সাধারণ, বিজ্ঞান, ইলমে ক্বির‘আত, তাজভীদ, এবং হিফযুল কুরআন, আলিমকে সাধারণ ও বিজ্ঞান, ফাযিলকে সাধারণ এবং কামিলকে হাদীস, ফিকহ তাফসীর ও আদব বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

নিউস্কীম মাদরাসা ঃ পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি শামসুল উলামা মাওলানা আবু নসর ওয়াহীদ শিবলী নুমানীর[২] চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পূর্ব বাংলায় এক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।[৩] বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর এ পরিকল্পনাটি নিউস্কীম মাদরাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা নামে পরিচিত। নিউস্কীম মাদরাসা শিক্ষা পরিকল্পনায় বিশেষ গ্রন্থের প্রাধান্য অপেক্ষা বিষয়ের প্রাধান্য অধিক। ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সৃজনশীল বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন ও ফিক্হ শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন দেয়া হয়। তদানিন্তন সরকার এ পরিকল্পনা অনুমোদন

---

১. আবুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ১৯৮০ খ্রী., পৃ. ২০।
২. মৃ. ১৯৫৩ খ্রী.।
৩. ১৯১০ খ্রী.।
৪. আবুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ১৯৮০ খ্রী., পৃ. ২১।

করেন এবং ১৯১৫ সালের ১ এপ্রিল হতে এটি কার্যকরী হয়। এজন্য প্রাথমিক ভাবে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর সরকারী মাদরাসা, সরকারী অনুদান প্রাপ্ত পাঁচটি মাদরাসা এবং অগণিত জুনিয়র মাদরাসা নির্বাচিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থও বরাদ্দ করা হয়। এ অর্থ যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হয়। যে সব মাদরাসা এ শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে যেসব প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারী সাহায্য ত্বরান্বিত হয়। অপর পক্ষে প্রাচীন সিলেবাস অনুযায়ী পরিচালিত মাদরাসা সমূহের অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে নানা উপায়ে নিউস্কীম পাঠ্যসূচী সরকারী আনুকূল্য লাভ করে ।

উক্ত নতুন কোর্সের অধীনে শিক্ষার্থীগণ একদিকে আরবী ও ইসলামী জ্ঞানে ওল্ডস্কীম ভুক্ত মাদরাসা শিক্ষার্থীদের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। আর অপর দিকে সাধারণ বিষয়ে আধুনিক শিক্ষাভুক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমপর্যায়ে পৌঁছেন। ফলে, তাঁরা জাগতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানে যুগপৎভাবে পারদর্শী হন। আর এসুবাদে জীবন সংগ্রামে অধিকতর সাফল্যার্জন করেন। ছাত্র শিক্ষকের নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, উৎসাহ ও উদ্যমের ফলেই এ সাফল্য অর্জিত হয়। ড. সাইয়্যিদ মু'আযযম হোসাইন,[১] ড. এম. সিরাজুল হক,[২] ড. ম. এ. বারী,[৩] ড. মুফিয উল্লাহ কবীর,[৪] ড. আবু মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ,[৫] ড. ক্বাযী দীন মুহম্মদ,[৬] ড. মাওলানা এ. এফ. এম. আব্দুল হক ফরিদী, ইয়াকুব শরীফ,[৭] ড. সাইয়্যিদ লুৎফুল হক,[৮] অধ্যক্ষ আবদুল গফুর,[৯] প্রফেসর আবদুল হাই,[১০] সিকান্দার আলী[১১] প্রমুখ দেশখ্যাত পণ্ডিত, গবেষক, লিখক ও আরবীবিদ এ শিক্ষা ব্যবস্থার সোনালী ফসল ।

---

১. প্রাক্তন ভি.সি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২. প্রফেসর এমিরেটার্স. ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল।
৩. প্রাক্তন ভি. সি., জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন ভি.সি., রাঃ বিঃ প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিমক।
৪. প্রাক্তন প্রফেসর ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. প্রফেরস, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যায়।
৭. প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই- আলিয়া ঢাকা।
৮. প্রাক্তন প্রফেসর, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. গবেষক লিখক ও প্রাক্তন ডাইরেক্টর গবেষণা বিভাগ ইফাবা।
১০. প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১১. প্রফেসর আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কালক্রমে নিউস্কীম পাঠ্যসূচী বিষয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এ ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে ব্যুৎপত্তি অর্জন দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত অভিযোগ উত্থাপন করত শিক্ষক, অভিভাবক নির্বিশেষে সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ এ শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এ কারণে উক্ত পাঠসূচী কিছুটা সহজ সাধ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নিউস্কীমভুক্ত মাদরাসায় অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থিগণ যাতে আধুনিক ডিগ্রীধারীদের মত পেশা গ্রহণ এবং উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ পান তাই আধুনিক বিষয়সমূহ বহাল রেখে আরবী, উর্দূ ও ইসলামী বিষয় পাঠ্যসুচী হতে কাট-ছাট করা হয়। এভাবে প্রয়োজনানুপাতে বারবার কাট-চাটের ফলে ক্রমশ এ পাঠ্যসূচী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত আধুনিক পাঠ্যসূচীর সমপর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। ফলে নিউস্কীমভূক্ত মাদরাসাসমুহ ইসলামিক উচ্চ বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত হয়।

নিউস্কীমভূক্ত মাদরাসা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের যেকোন বিভাগে ভর্তি যোগ্য বিবেচিত হন। কিন্তু তখন পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার কোন প্রকার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এটি ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এর পরিধিও ছিল অতি সীমিত। সুতরাং ঢাকা শহরের উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজসমূহের সিলেবাস প্রণয়ন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে ঢাকায় একটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয়। বাংলার নিউস্কীমভূক্ত মাদরাসার সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণভারও উক্ত বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত হয়।[১] সরকারি শিক্ষা বিভাগ ১৯১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের নিউস্কীম (কলকাতা আলিয়া ব্যতিত) পর পর দু'টি শ্রেণী চালু হয়।[২] শ্রেণীদ্বয় ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট শ্রেণী নামে অভিহিত। উভয় শ্রেণীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশকৃত সিলেবাস প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ে উক্ত শ্রেণীদ্বয় এবং মাদরাসা স্তরের চারটি শ্রেণীর সমন্বয়ে ১৯১৯ সালে (বর্তমানে নজুরুল কলেজ) ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজে রূপান্তর করা হয়।[৩] এভাবে ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রাম, হুগলী ও সিরাজগঞ্জ মাদরাসাও একই পরিণতি লাভ করে।

---

১. নিউস্কীমভূক্ত মাদরাসা, আতাউর রহমান কমিটি ১৯৫৭ খ্রী.।

২. আব্দুল হক ফরিদী, মাদরাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ। (ঢাকা. বা/এ ১৯৮৫) পৃ. ৬৬।

৩. ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী, Commission on National Education (s. M. sharif commission)- 1958 report.

কওমী মাদরাসা শিক্ষা ঃ

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠানের প্রণীত পাঠ্যক্রম ও অবকাঠামো অবলম্বন করে এদেশে ধর্মীয় শিক্ষার আরেকটি স্বতন্ত্র ধারা চালু হয়। এ ধারাটির নাম কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠানের প্রণীত পাঠক্রম ও অবকাঠামো অবলম্বন করে উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার একটি স্বতন্ত ধারা চালু রয়েছে। এ ধারাটির নাম কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা।

"দারুল উলূম দেওবন্দ" এর পরিচালনা, পাঠদান ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরিচালনা ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও নিশ্চিত করার জন্য দারুল উলূমে আটটি বিশেষ মূলনীতি অনুসৃত হয়। উক্ত মূলনীতিসমূহ উসূল এ-হাস্তেগানা নামে অভিহিত।[১] এগুলোর সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১। মাদরাসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ এবং অন্যান্যদেরকেও এ বিষয়ে উৎসাহ দান।

২। শিক্ষার্থীদের পানাহারের সংস্থান করার প্রতি নযর দেওয়া এবং যথাসম্ভব তাঁদের আহার্যের মান বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকা।

৩। ব্যবস্থাপক ও শুরা (পরামর্শ সভা) সদস্যগণ সদা সর্বদা মাদরাসার শৃঙ্খলা বিধান ও সৌন্দর্য্য রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সজাগ, সচেতন ও সচেষ্ট থাকবেন। তাঁরা হবেন পরমত সহিষ্ণু। যদি তাদের কেউ মতামত প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন তা হলে মাদরাসার মূল ভিত্তিরই ক্ষতি সাধিত হবে।

৪। মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী সমচিন্তা ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন এবং তাঁরা পার্থিব স্বার্থান্বেষী আলিমের মত স্বার্থপর ও পর মুখাপেক্ষী হবেন না। তাহলে মাদরাসার ভাগ্যে কোন কল্যাণই জুটবে না।

৫। বছর শেষে নির্ধারিত নিসাব (পাঠ্যসূচী) সমাপ্ত করা আবশ্যক।

---

১. সাইয়্যিদ মাহবুব রিযভী, তারীখ, এ দারুল উলুম দেওবন্দ। দেওবন্দ, ১৩৯৭/১৯৭৭), ২ঃ১৫৩-৫৪।

৬। আয়, আমদানী, নির্মাণ ও ইমারত প্রভৃতি কাজে এক প্রকার নিঃস্বতা বজায় রেখে চলতে হবে এবং ধনীর চেয়ে গরীবের অনুদানকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া বাঞ্চনীয় হবে।

৭। সব রকমের সরকারি অনুদান অথবা সাহায্য সার্বিকভাবে পরিহার করা হবে।

৮। সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মুখলিস (নিঃস্বার্থ) ব্যক্তির দান ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। যারা চাঁদা দানের মাধ্যমে সস্তায় নাম কিনতে ইচ্ছুক এবং অসৎ উদ্দেশ্যে দান করে থাকে তাদের অনুদান বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রম (নিসাবে তা'লীম) ঃ নিম্নলিখিত কতিপয় বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে দারুল উলূম দেওবন্দ-এর পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে[১]-

১. ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার।
২. আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি উৎসাহ দান।
৩. মহানবী (সাঃ)-এর সুন্নাতের সঠিক অনুসরণ।
৪. হানাফী ফিক্হ-এর ব্যাপকতা দান।
৫. মাতুরিদী মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।
৬. সব ধরনের বিদ'আতের মূলোৎপাটন এবং
৭. বিদেশী শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্র সৃষ্টি।

উনবিংশ শতাব্দীর তিনটি বিশেষ মাদরাসা দিল্লীর রহিমিয়া মাদরাসার হাদীস ও তাফসীর, লক্ষ্ণৌ মাদরাসার ফিক্হ ও কালাম এবং খায়রাবাদ মাদরাসার মান্তিক ও হিকমার সমন্বয়ে এ পাঠক্রম প্রণীত।[২] শতাব্দীকাল ব্যাপী এ সিলেবাস অপরিবর্তীত রয়েছে, তবে যুগের চাহিদানুসারে এর মুল কাঠামো বহাল রেখে সময় সময় অন্তর্ভূক্ত বিষয়সূচী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। উপ-মহাদেশের সকল কাওমী মাদরাসাসমূহে এ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়।

এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেনী অপেক্ষা অধিক গ্রন্থ বেশী গুরুত্ব পায়। পাঠ্য পুস্তকের পাঠ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়। গোটা শিক্ষাকাল প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর এবং তাকমীল এ চার স্তরে বিন্যস্ত। দারুল উলূম-এ মোট সাতটি বিভাগ রয়েছে।

---

[১] সাইয়িদ মাহবুব রিয্ভী; প্রাগুক্ত, খঃ ১, পৃঃ ৪২৯-৩২।
[২] এম. এ. বাকী প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

যেমন ঃ

(১) আরবী,
(২) ফার্সী,
(৩) ফাতওয়া,
(৪) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা (তিব্ব),
(৫) তাবলীগে দ্বীন,
(৬) শ্রুতিলিপি (হস্তাক্ষর) বিদ্যা, এবং
(৭) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ।

কাওমী মাদরাসাসমূহের শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতিও প্রায় অনুরূপ। এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, ধর্মীয় পূর্নগঠন এবং ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে এসব মাদরাসার প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানেও কাওমী মাদরাসায় শিক্ষিত আলিমগণ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, শিক্ষকতা, ইমামতি এবং ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে সমাজের প্রশংসনীয় সেবায় নিয়োজিত আছেন।

খ. পাশ্চাত্য শিক্ষা

পাশ্চাত্য শিক্ষা অসাম্প্রদায়িক এবং ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধ। সর্বোতভাবে এ শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী। ভারত উপ-মহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. নিম্নগামী পরিশ্রবণ নীতি অনুসৃত অর্থাৎ মুষ্টিমেয় সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী বুদ্ধিমানকে শিক্ষাদান করলে তা ক্রমশ নিম্নস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন পানির উপরিভাগে কোন দ্রবণীয় বস্তু ছড়িয়ে দিলে তা ধীরে ধীরে নিম্নের জলে মিশে যায় সেরূপভাবে শিক্ষিতের প্রভাব অশিক্ষিতের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত নীতি অনুসারে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে সুশিক্ষিত করে সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।
২. এ শিক্ষা মুক্ত চিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ।
৩. এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শীর্ষদেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিম্ন স্তরে থাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়।
৪. পাশ্চাত্য শিক্ষা বিজ্ঞান ভিত্তিক ও প্রগতিশীল। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণ জীবনের উন্নয়ন।
৫. ব্যবহারিক ও কারিগরী জ্ঞানদানের ব্যবস্থা থাকে।

Encyclopaedia of Britanica-তে ভারতীয় উপ-মহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপে ব্যক্ত করা হয়-

"The central purpose was to impart western learning. English was the sole medium of instruction. The educational program was top heavy, the education of a few in the universities was considered more important than the education of the masses. "

অর্থাৎ এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন। ইংরেজী ছিল এ শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। এ শিক্ষা কার্যক্রম ছিল খুব ভারী। এর আওতাধীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্ব সাধারণকে শিক্ষিত করার চাইতে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোককে শিক্ষিত করে তোলার প্রতিই অতীব গুরুত্ব দেওয়া হতো। পাশ্চাত্য শিক্ষাক্রম এদেশে ছয়টি স্তরে বিন্যস্ত ঃ

১. প্রাথমিক পাঁচ বছর।
২. মাধ্যমিক পাঁচ বছর।
৩. উচ্চ মাধ্যমিক দুই বছর।
৪. স্নাতক দুই বছর।
৫. স্নাতক (সম্মান) তিন বছর ।
৬. স্নাতকোত্তর বা মাষ্টার্স এক বছর।

উক্ত নিয়মে এ শিক্ষার শিক্ষাকাল মোট ষোল বছর। স্নাতক সাধারণ (পাস) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এম. এ. প্রথম পর্ব ও শেষ পর্বে এক বছর অন্তর দুটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হয়।

বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপ-মহাদেশে পর্তুগীজ ধর্ম যাজকগণ সর্বপ্রথম আধুনিক শিক্ষাধারা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেন। এ পর্তুগীজ মিশনারিগণ সর্বপ্রথম বঙ্গ-ভারত-পাকিস্তানে আগমন করেন। তাঁদের পূর্বে কোন ইউরোপীয় এ দেশে আসেননি। তাঁরাই সর্ব প্রথম এদেশে ইউরোপীয় আদর্শে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৫৫৬ সালে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁদের পেছনে পেছনে ইউরোপের প্রায় সব দেশের বণিকরা এ দেশের উপকূলে উপস্থিত হন। ক্রমে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করে স্বীয় প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ

এবং সে সঙ্গে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট বঙ্গ -ভারত- পাকিস্তানে খ্রীষ্টর্ধম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলে ১৬৪৮ সালে কোম্পানী সনদ আইন পুনঃপ্রবর্তীত হওয়ার সময় পার্লামেন্ট কর্তৃক মিশনারী বিষয়ক একটি ধারা এতে সন্নিবিষ্ট হয়। এ ধারায় কোম্পানীকে বঙ্গ-ভারত-পাকিস্তানে ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে ধর্মযাজক নিযুক্ত করতে ও শিক্ষা প্রচারের জন্য স্কুল স্থাপন করতে বলা হয়। এ ধারাটি প্রবর্তনের ফলে এ উপ-মহাদেশের মিশনারীদের শিক্ষামূলক কার্যকলাপ খুবই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফলে ১৭০০ সালে খ্রীষ্টিয় জ্ঞান প্রচার সমিতি স্থাপিত হয়। এ সমিতির মাধ্যমে অনেকগুলো দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত এসব স্কুলে প্রধানত ইংরেজী প্রচলিত থাকলেও ভারতীয় ভাষাতেই নানা বিষয় শিখানো হতো। বস্তুত পক্ষে এদেশবাসীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও মানসিক দৈন্য হতে নিস্তার দেওয়া ছিল মিশনারীদের উদ্দেশ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে এদেশে মিশনারীদের অন্যতম অবদান নারী শিক্ষার প্রসার। মিশনারীগণই মেয়েদের জন্য প্রথম আনুষ্ঠানিক স্কুল স্থাপন করেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৫৮ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষনায় বঙ্গ-ভারত-পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের একাধিপত্যের আশা নির্মূল হয়। এবং তাঁদের ধর্মান্তাকরণ প্রচেষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। শিক্ষার সংগঠন হতে শুরু করে বিষয়বস্তু, পদ্ধতি. সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির উপর তাঁদের চিরস্থায়ী প্রভাব এখনও বর্তমান। তাঁরাই এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণী নির্দিষ্ট পিরিয়ড, পাঠ্যপুস্তকের প্রচলন এবং প্রতি রবিবার ছুটির দিন ধার্য্য করেন। একটি মিশ্রিত শ্রেণীর পরিবর্তে একাধিক শিক্ষক ও বিভিন্ন শ্রেণী ব্যবস্থা সম্পন্ন বিদ্যালয় তাঁরাই প্রবর্তন করেন।

১৮১৩ সালে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনর্বিবেচনার কালে আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয় যে, ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছুই বলা হয়নি। তাই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠান, পাঠদানপদ্ধতি ও শিক্ষার মাধ্যম এসব প্রশ্নে মতদ্বৈততা, তিক্ততা, আর বিভ্রান্তি দেখা দেয়। ফলে তিনটি মতের উদ্ভব হয়।

১. এক দলের অভিমত ছিল এই যে, বৃটিশ শাসকদের কর্তব্য ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-ভান্ডারটিকে সুসমৃদ্ধ ও পুষ্ট করে তোলা।

২. অপর দল এই মত পোষণ করেন যে, এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রচলন করা দরকার।

৩. তৃতীয় দল মনে করেন ভারতীদেরকে কোম্পানীর কাজে উপযোগী করে গড়ে তোলার সহায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

এভাবে ভারতবর্ষে শিক্ষা বাস্তাবায়নের কর্মপন্থা নিয়ে এই তিনটি মতকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চলতে থাকে। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কোন একটি মতকে সমার্থন করার পরিবর্তে তিনটি মতকেই সমর্থন ও অসর্মথন করতে থাকেন। ফলে শিক্ষা বিস্তারের আইনগত দায়িত্ব বাস্তবে রূপায়িত হতে অনেক বিলম্ব হয়। ১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন গঠিত হয়। উক্ত কমিটি সংস্কৃতি ও আরবী শিক্ষার অগ্রগতিতে উৎসাহ দেন এবং দশ বছরের মাঝে নিম্ন লিখিত কর্মসমূহ সম্পাদন করেন।

১. কলকাতা, মাদ্রাজ ও কাশীতে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় পুনর্গঠন।

২. ১৮২৪ সালে কলকাতা সংস্কৃতি মহাবিদ্যালয় এবং আগ্রা ও দিল্লীতে দুটি প্রাচ্যবিদ্যা কলেজ প্রতিষ্ঠা।

৩. সংস্কৃতি ও আরবী ভাষায় পুঁথি পুস্তকের পুনঃমুদ্রণ এবং সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় ইংরেজী পুস্তকসমূহ অনুবাদ।

এভাবে কমিটির প্রাচ্যবিদ্যা বিস্তারে সচেষ্ট হন। কমিটির এ প্রচেষ্টায় বাধ সাধলেন এদেশীয় প্রগতিপন্থী ব্যক্তিগণ। রাজা রাম মোহন রায় ছিলেন এদের নেতৃত্বে। তিনি মনে করলেন যে, ইংরেজী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন দ্বারাই এদেশের সত্যিকার উপকার হবে। তাই তিনি ১৮২৬ সালে একটি শিক্ষা সংস্থা গঠন করেন এবং একলক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ১৮২৭ সালে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য একটি ইংরেজী শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি গভর্ণর জেনারেলকে এক স্মারকলিপির মাধ্যমে বিজ্ঞান, রসায়ন ও শরীরবিদ্যা প্রভৃতি আধুনিক ও প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার আবেদন জানান। কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরসও একটি ডেসপাসে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রাচীন বিদ্যার অনূশীলন নিস্প্রয়োজন ও প্রায় ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেন।

লর্ড মেকলের নিম্নগামী পরিশ্রবণ নীতি (১৮৩৩) বাস্তাবায়িত হওয়ার ফলে সংস্কৃত আরবী শিক্ষা সরকারী আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হয়। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারের জন্য সরকারি অর্থ সাহায্য অনুমোদন দেয়া হয়। এ নীতির ফলেই ইংরেজী বঙ্গ–ভারত ও পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি ভাষায় মর্যাদা লাভ করে।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি সনদেই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সূচিত হয়। এ পটভূমিকায় কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই এক শিক্ষা সনদ রচনা করেন। এ সনদ রচনা কমিটির সভাপতি ছিলেন 'চার্লস উড' নামক জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তা। তাঁর নাম অনুসারে এ সনদ উডের ডেসপাস নামে অভিহিত। এটি একটি দীর্ঘ দলিল। এতে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়। ডেসপাসটি বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারত উপ-মহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম পদক্ষেপ বা দিশারী বলেও আখ্যায়িত।[১] ডেসপাসের উল্লিখিত কয়েকটি বিশেষ বিষয় নিম্নে আলোচনা করা গেল-

১. এদেশীয় শিক্ষা চর্চা, বিশেষত এদেশীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি ও এদেশীয় আইন-কানুন বিষয়ে জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করা।

২. মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা।

৩. শিক্ষা-বিভাগ সংগঠন, বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে পৃথক পৃথক শিক্ষা বিভাগ খোলা ও একজন শিক্ষক অধিকর্তার পরিচালনাধীনে ন্যস্ত করা।

৪. কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ অর্থাৎ প্রধানতঃ পরীক্ষা গ্রহণনীতি প্রবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হবে যেসব বিষয়ে উন্নত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা কলেজসমূহে নেই সেসব বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা এবং আইন, স্থপতিবিদ্যা, সংস্কৃতি, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি এদেশীয় প্রাচীন ভাষাসমূহের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা চালনো।

৫. নারীশিক্ষা প্রবর্তন করা।[২]

ডেসপাসে এদেশ শিক্ষা বিস্তারে ইংরেজ কোম্পানীর উদ্দেশ্য নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা হয় ঃ

---

[১] মোমিন উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

ভারতীয়দের সকল শ্রেণীর উপযোগী শিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাদের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধানে সাহায্য করা ইংল্যান্ডের অবশ্য কর্তব্য। এটা এক পবিত্র দায়িত্বও বটে। কেননা পাশ্চাত্য (ইউরোপীয়) শিক্ষায় শিক্ষিত হলে ভারতীয়গণ বৈষয়িক উন্নতি লাভে সমর্থ হবে। এর ফলস্বরূপ তারা প্রচুর পরিমানে কাঁচামাল উৎপন্ন ও ইংল্যান্ডের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে। সুতরাং ইংল্যান্ডও প্রভূত লাভবান হবে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয়গণ শিক্ষিত হলে কোম্পানী অল্প বেতনে কর্মচারী নিয়োগ করার সুযোগও লাভ করবেন।[১]

উডের ডেসপাসের সুপারিশের আলোকে ১৮৫৭ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হলো বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। কেননা উক্ত তিনটি বিদ্যাপীঠের পূর্বে এ ভূ-ভাগে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়না। উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির চারণ ক্ষেত্র কয়েকটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল নিম্নে উল্লেখ করা গেল।[২]

১. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।[৩]
২. বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।[৪]
৩. উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।[৫]
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।[৬]
৫. দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।[৭]
৬. আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়।[৮]
৭. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়।[৯]

---

[১] মোমিন উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

[২] Common wealth Unversities Year book 1993. (Association of comonwealth Universities). 21-N. PP. 1038. 1459. 1077. 1172. 1019.

[৩] প্রতিষ্ঠা ১৮৮৭ খ্রী.।

[৪] প্রতিষ্ঠা ১৯১৫ খ্রী.।

[৫] প্রতিষ্ঠা ১৯১৮ খ্রী.।

[৬] প্রতিষ্ঠা ১৯২১ খ্রী.।

[৭] প্রতিষ্ঠা ১৯২২ খ্রী.।

[৮] প্রতিষ্ঠা ১৯২৭ খ্রী.।

[৯] প্রতিষ্ঠা ১৯৭৪ খ্রী.।

গ. সমন্বয়ীয় শিক্ষা ঃ

ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরূপ থাকার কারণে এদেশীয় মুসলমানগণ বেশ কিছু দিন যাবৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা এড়িয়ে চলেন। ১৮৫৭ সালের পর তাদের চিন্তা ধারায় পরিবর্তন আসতে থাকে। ধীরে ধীরে তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। অবশ্য এর কিছুদিন পূর্বে ১৮৫৩ সালে মুসলিম শিক্ষার অগ্রদূত নওয়াব আবদুল লতীফ কলকাতা মাদরাসায় ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেন।[১] তাঁর উদ্যোগে মাদরাসায় এ্যাংলো ফার্সিয়ান (ইংরেজী ও ফার্সী) বিভাগ খোলা হয়।[২] তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। তিনি সরকারের নিকট মুসলিম ছাত্রদের জন্য উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী করেন। এর ফলে ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এ প্রতিষ্ঠানে সব সম্প্রাদায় ও শ্রেণীর ছাত্রগণ শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন।[৩] তিনি হুগলী মাদরাসায় আরবী ও ফার্সী বিভাগ এবং ইংরেজী ও ফার্সী বিভাগের শিক্ষার মান উন্নত করার সুপারিশও করেন। মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি আবদুল লতীফ বড়লাট লর্ড মেয়োর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮১৭ সালে ৭ আগষ্ট ভারত সরকার মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষা সম্পর্কে এক প্রস্তাব পাস করেন। এ প্রস্তাবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।[৪]

১. সব সরকারি স্কুল ও কলেজের মুসলিম ছাত্রদের জন্য প্রাচীন ও প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

২. মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে ইংরেজীর জন্য উপযুক্ত মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৩. মুসলমানদেরকে স্কুল স্থাপনের প্রচেষ্টায় সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে।

৪. মুসলমানদেরকে প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কাজে উৎসাহ দেওয়া হবে। এসব ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হলো।

---

[১] এম. এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-৪৬, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৩।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।
[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

শিক্ষা-পদ্ধতি যাতে মুসলমানদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয়বিধ প্রয়োজন মিটাতে পারে সেজন্য আবদুল লতীফ নানাভাবে চেষ্টা করেন।[১] নওয়াব আবদুল লতীফ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করে তাঁদেরকে মাঝে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করতে এবং শিক্ষা ও সামাজিকতায় তাঁদের মাঝে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করতে এবং শিক্ষা ও সামাজিকতায় তাঁদেরকে শিক্ষিত ইংরেজ ও হিন্দুদের সমকক্ষ করে তুলতে ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমিতি বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে মুসলমানদের শিক্ষা ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করে এবং ইহা তাদের স্বার্থের ব্যাপারে সরকারের উপদেষ্টা সংস্থার দায়িত্ব পালন করে।[২] আবদুল লতিফ মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য ধারা সংযোজনের চেষ্টা করলেও এজন্য কোন স্বতন্ত্র সিলেবাস প্রণয়ন করে যাননি। উইলিয়াম উলফেনসন হান্টার নামক জনৈক ইংরেজ সিভিলিয়ন মন্তব্য করেন যে, আমাদের এমন একটা উদীয়মান মুসলিম জেনারেশন গড়ে তোলা উচিত যারা নিজস্ব সংকীর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ও মধ্যযুগীয় ভাবধারার গন্ডিতে আবদ্ধ না থেকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের নমনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। নিজ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণের মত উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষার সাথে তাদেরকে কর্মজীবনে লাভজনক পেশায় অংশগ্রহণের উপযোগী ইংরেজী শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে।[৩] তিনি এদেশের স্কুলগুলোতে কিছুটা আরবী ও ফার্সী প্রবর্তন করার সুপারিশও করেন। তিনি আরো বলেন যে, এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলমান ছাত্রগণের মাঝে ক্রমান্বয়ে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।[৪] তাঁর এ পরামর্শ অনুযায়ী পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে উক্ত দুটি ভাষা প্রবর্তন করা হয়।

নওয়াব আবদুল লতীফের সমসাময়িক মুসলিম চিন্তানায়ক ও সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ[৫] আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নৈতিক ও বৈষয়িক মুল্যবোধের সমন্বয় করে এদেশীয় মুসলমানদের

---

১. এম. এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

২. আব্দুল লতীফের মাই পাবলিক লাইফ, রহীমদ্দীন, মোহামেডান লিট্যারারী সোসাইটি হতে উদ্ধৃত।

৩. ডব্লিউ ডব্লিউ হন্টার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

৪. ডব্লিউ ডব্লিউ হন্টার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

জন্য একটি শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ন করেন উক্ত লক্ষ্যে তিনি একটি পৃথক পাঠ্যক্রমও তৈরী করেন। অতঃপর তাঁর চিন্তাধারাকে বাস্তবতা দানের উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর ভারতের আলীগড় নামক স্থানে একটি বিদ্যালয় (মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল) স্থাপন করেন। পরবর্তী সময় এ প্রতিষ্ঠান ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নতি হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকাঠামো পরবর্তীকালে বঙ্গ- ভারত- পারিকস্তান উপ-মহাদেশে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় এক সুদূরপ্রসারী অনুপ্রেরণা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতীয় মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত।[১]

---

[১] A large part of Aligarh's singificance, its meaning. Lies in this image and the imagination of those who created it, quite aside from any assesment of how influential they were in the society at large. But even such a culcerd account of social experience of Aligarh's founders and First students. for example in order to understand how being Muslim could salient a political identity. David lalivelel, Aligarh's First Genaration (London Oxford U.V press. 1935). PP. 346).

তৃতীয় অধ্যায়

জন্ম ও শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বংশ পরিচয়

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর বংশ পরিচয় সম্পর্কে তাঁর সন্তানাদি ও নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রাপ্ততথ্য সূত্র মতে মাওলানার পূর্ব পুরুষদের বাড়ী ছিল নোয়াখালী সদর থানার অন্তর্গত ছবির পাইক আবদুল্লাহ মিয়া হাটের আবদুল্লাহ মিয়ার বাড়ী। বাড়ীটি নদীর ভাঙ্গনে পড়লে মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর পিতামহের বড় ভাই মুসলিম উদ্দীন ভূঁইয়া বর্তমান মানিকপুর বাড়ীটির পতিত জমি স্ত্রী বানু বিবির নামে ক্রয় করে সেখানে বাড়ী নির্মাণ করেন।[১]

উল্লেখ্য যে, মাওলানার দাদারা ছিলেন দুইভাই । মুসলিম উদ্দীন ভূঁইয়া ও জৈন উদ্দীন ভূঁইয়া। মুসলিম উদ্দীন ভূঁইয়া সেই সময়ে আকিয়াব তথা রেঙ্গুনে ওকালতী করতেন। মুসলিম উদ্দীন ভূঁইয়ার ছোট ভাই জৈনউদ্দীন ভূঁইয়া পূর্বের বাড়ীতে দুই ছেলে জান ভূঁইয়া ও জলিশ ভূঁইয়াকে রেখে মারা যান।[২] মুসলিম উদ্দীন ভূঁইয়ার স্ত্রী বানু বিবির বাবার বাড়ী ছিল ফেনী জেলার দাগন ভূঁইয়া থানার কান্দারপাড় গ্রামে।[৩] তারা নিঃসন্তান হওয়ায় মানিকপুর নতুন বাড়ীতে আসার সময় দুই ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

---

১. আবুল কাসেম। তিনি মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর নাতী। তিনি অগ্রনী ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন। বর্তমানে অবসর নিয়ে মাওলানার প্রতিষ্ঠিত মক্তব, মসজিদ ও মানিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের তাদারকী করেন। সাক্ষাৎকার; ২৯ জুন ০৫।

২. ডাঃ এরফান উদ্দীন। তিনিও মাওলানার নাতী। তিনি নোয়াখালীর বসুরহাট শেখ মুজিব মহাবিদ্যালয়ের পশু সম্পদ বিভাগের অফিসার হিসাবে অবসর নিয়ে বর্তমানে কোম্পানীগঞ্জ থানার বসুরহাট পৌরসভার ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সাক্ষাতকার; ২৯ জুন, ০৫।

৩. আবুল কাসেম। সাক্ষাৎকার, ২৯ জুন ২০০৫।

মুসলিম উদ্দীন ভূঁইয়া মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী বানু বিবি দুই দেবর পুত্রকে বাড়ীর সামনের মসজিদের তত্ত্বাবধানের জন্য বাড়ীর সম্পদ ওয়াকফ করে কান্দারপাড় নিবাসী নিজ ভাই আবদুল বারিক বরকান্দাজ-এর নিকট চলে যান।[১]

নিম্নে ছকের মাধ্যমে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর বংশ তালিকা উল্লেখ করা হলো।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর দাদারা ছিলেন দুই ভাই।[২]

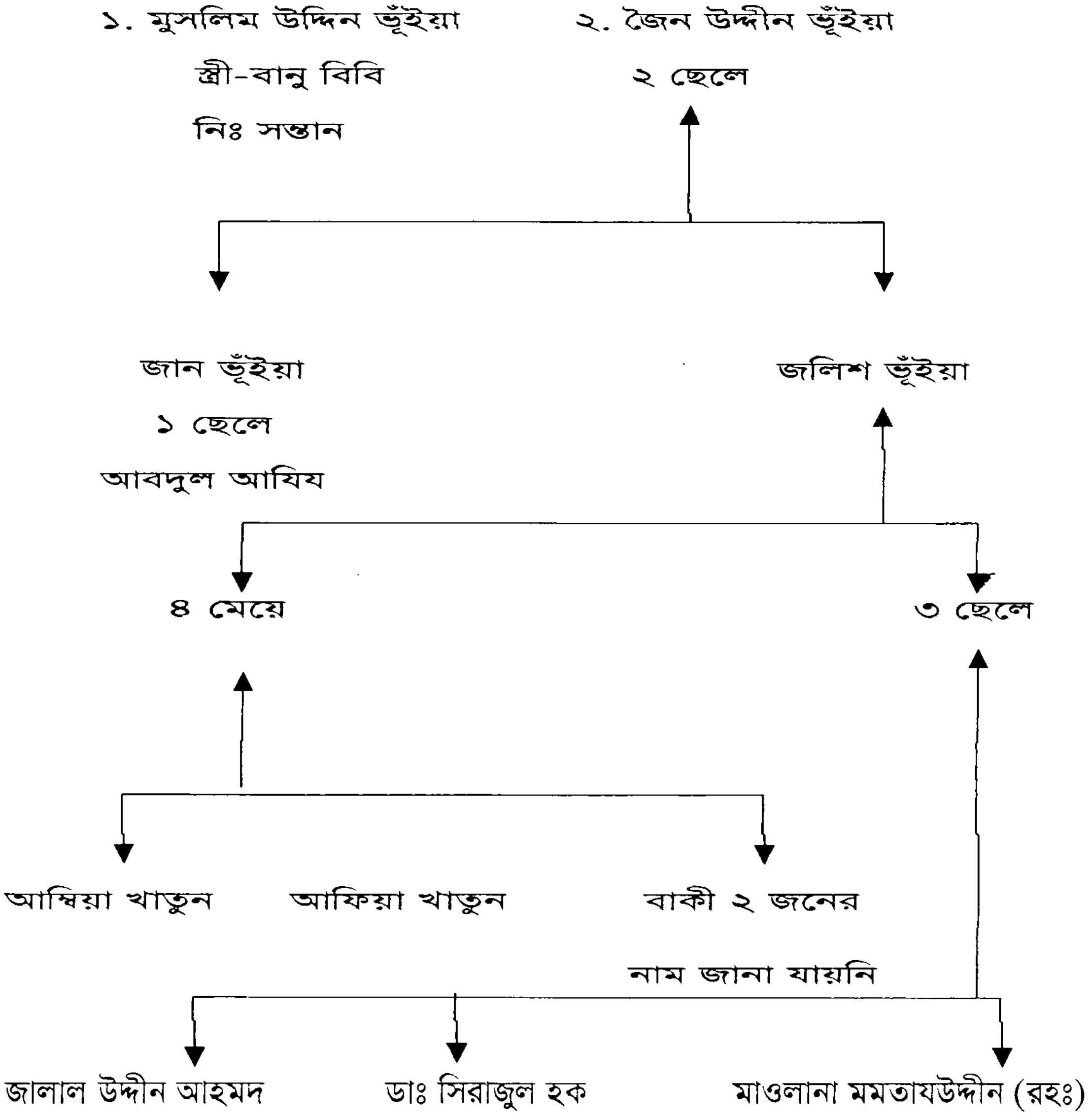
১. মুসলিম উদ্দিন ভূঁইয়া
স্ত্রী-বানু বিবি
নিঃ সন্তান
২. জৈন উদ্দীন ভূঁইয়া
২ ছেলে
জান ভূঁইয়া
১ ছেলে
আবদুল আযিয
জলিশ ভূঁইয়া
৪ মেয়ে
৩ ছেলে
আম্বিয়া খাতুন
আফিয়া খাতুন
বাকী ২ জনের
নাম জানা যায়নি
জালাল উদ্দীন আহমদ
ডাঃ সিরাজুল হক
মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)

---

[১] ডাঃ এরফান উদ্দীন, সাক্ষাৎকার, ২৯ জুন, ২০০৫।

[২] আবুল কাশেম, সাক্ষাৎকার, ২৯ জুন, ২০০৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম ও শৈশবকাল

জন্ম ঃ ইসলামী জ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের অনুসন্ধানী পাঠক, গবেষক, বিদগ্ধ লেখক, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক আলেম, দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক, জ্ঞান তাপস, তাফসীর ও হাদীস বিশারদ এবং পরিবাগের বড় মাওলানা নামে খ্যাত[১] মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) ১৩০৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৬ সালে বাংলা ১২৯২ সনের ১৮ অগ্রহায়ন রোজ বুধবার তৎকালীন ঢাকা বিভাগের নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার মানিকপুর গ্রামে[২] এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জলিস ভূঁইয়া, মাতার নাম নেসা বিবি।

শৈশবকাল ঃ ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) শৈশবকাল নিজ বাড়ীতে অতিবাহিত করেন। পরহেযগার পিতা-মাতার অতুলনীয় আদর যত্নে শিশু মমতাযউদ্দীন বেড়ে উঠতে লাগলেন।[৩] শৈশব হতেই তাঁর আচার-আচারণ ও স্বভাব-চরিত্রে ব্যতিক্রমধর্মী ভাব পরিলক্ষিত হয়। ধ্যান-ধারনা ও চাল-চলনে তিনি অন্যান্য শিশুদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র বৈশিষ্টমন্ডিত ছিলেন। তিনি শিশুকাল হতেই অহেতুক কথাবার্তা বলা এবং খেলাধুলায় লিপ্ত হয়ে অযথা সময় নষ্ট করতেন না। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ও পরিমন্ডলের মনস্তাত্বিক প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বে ক্রমান্বয়ে পরিস্ফুটিত হতে লাগলো। এ ধারা অবলম্বন করেই তাঁর শৈশব, কৈশোর ও শিক্ষা জীবন ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকে।

---

১. শফিউল আযম, "বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সমাজসেবক মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমাদ" দৈনিক ইনকিলাব, ২ এপ্রিল ১৯৯০।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, সেপ্টে. ১৯৯৩, পৃ. ২৩৪।

৩. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, আউলিয়াদের জীবন, "আলেমে হাককানী, আরেফেরাব্বানী হযরত মাওলানা মমতায উদ্দীন", দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ আগষ্ট ১৯৯৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক শিক্ষা

তাঁর মহান পিতা জনাব মুহাম্মদ জলীস ভূঁইয়া ছিলেন একজন সৎ, নম্র ও ধার্মিক। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিক্ষানুরাগী। তাঁর মাতা ছিলেন পরহেযগার, নেককার একজন মহিয়সী নারী।[১] শিশু মমতাযউদ্দীন ইসলামী ঐতিহ্য ধন্য পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় শিশু বয়সেই পবিত্র কুরআন শিক্ষা করেন। এরপর তিনি নিজ গ্রামের সার্কেল স্কুলে ভর্তি হন।[২] ১৯০২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর নোয়াখালী জেলার সদরে প্রাইমারী সেন্টার পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন ও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।[৩]

বাল্যকাল থেকেই মোক্তারী পড়ার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। কেননা সে যুগে মুক্তারী পেশার খুব খ্যাতি ছিল। তাই তিনি মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির ফিস ও বই-পত্র কেনার জন্য বাবার নিকট টাকা চাইলে তাঁর মাতা এতে আপত্তি জানিয়ে বললেন- “মমতাযউদ্দীন যখন আমার গর্ভে ছিল তখন আমি মহান আল্লাহর দরবারে এই বলে পতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে আমি তাকে আরবী পড়াবো”।

তাঁর মাতার এ মহান উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে পিতা জলীস ভূঁইয়া তাঁকে খাঁটি ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় থানা সদরের একটি মাদরাসায় নিয়ে যান। মাদরাসার হেড মওলভীর উপদেশ শুনে তাঁর হৃদয়ে এক অলৌকিক শক্তি নাড়া দিয়ে উঠে। তিনি অনুভব করলেন এক মহা সত্য তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পরেরদিন তিনি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে জ্ঞান পিপাসা নিবারণে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

১৯০২ সালের নভেম্বরের শেষের দিক হতে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ৪ বছর তিনি মাদরাসায় গভীর মনোযোগ সহকারে আরবী তথা ইসলামী শিক্ষা অধ্যায়ন করেন।

---

[১] মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, আউলিয়াদের জীবন, “আলেমে হাককানী, আরেফেরাব্বানী হযরত মাওলানা মমতায উদ্দীন”, দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ আগষ্ট ১৯৯৩।

[২] সার্কেল স্কুল বলা হত তৎকালীন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে।

[৩] শফিউল আযম, “বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সমাজসেবক মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমাদ” দৈনিক ইনকিলাব, ২ এপ্রিল ১৯৯০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

বালক মমতাযউদ্দীন কৃতিত্বের সাথে মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন।[১] দু'বছর পুরাতন সিলেবাসে লেখা পড়া করার পর পরবর্তীতে নতুন সিলেবাস প্রণীত হলে সে অনুসারে শিক্ষাক্রম চালিয়ে যান।

উল্লেখ্য, ভর্তি হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি মেধাবী ও চরিত্রবান ছাত্র হিসেবে ছাত্র শিক্ষক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি মাদরাসার প্রতিটি শ্রেণীতে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ন হতে লাগলেন। এভাবে বিশেষ সুনামের সাথে তিনি ১৯০৭ সালে দাখিল, ১৯১০ সালে আলিম, ১৯১৩ সালে ফাযিল এবং ১৯১৬ সালে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে ফখরুল মুহাদ্দিসীন (হাদীস শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী) পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন।[২]

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার সিলেবাস ঃ ১৭৮০ সালে মোল্লা মদন যখন কলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড মৌলভী নিযুক্ত হন, তখন তিনি মাদরাসায় দরসে নেজামী পাঠ্যভুক্ত করেন। কারণ তখনকার দিনে পাক-ভারতের অন্যান্য মাদরাসায় দরসে নেজামীই প্রচলিত ছিল।

দরসে নেজামীর পরিচয় ঃ আজ হতে প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে লক্ষ্ণৌ শহরের বিখ্যাত আলিম মরহুম মোল্লা নেজামউদ্দীন সোহালী মাদরাসা শিক্ষার জন্য একটি সিলেবাস প্রস্তুত করেছিলেন এবং পাক-ভারতের আলিম সমাজ কর্তৃক উক্ত সিলেবাস গৃহীত হয়। উক্ত সিলেবাসটি মোল্লা নেজামউদ্দীনের নামানুসারে দরসে নেজামী নামে খ্যাতি লাভ করে। তিনি ১০৮৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৬১ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

---

১. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, আউলিয়াদের জীবন, "আলেমে হাককানী, আরেফেরাব্বানী হযরত মাওলানা মমতায উদ্দীন", দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ আগষ্ট ১৯৯৩।

২. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত।

দরসে নেজামীর বিষয়বস্তু ঃ তখনকার দিনে দরসে নেজামীতে হাদীস ও তাফসীর সিলেবাসভূক্ত ছিল না। কারণ সেকালের আলিমগণের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও বিধানসমূহ অবগত হওয়া।[১] এদিকে মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে শরীয়তের সমুদয় হুকুম আহকামকে ফিক্‌হ শাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা করে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ গভীরভাবে শিক্ষা লাভ করলে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়। অবশ্য ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ-র পূর্ণ জ্ঞান নির্ভর করে আরবী সাহিত্যে পূর্ণ জ্ঞান ও মানতিক এবং ফালসাফার (দর্শন শাস্ত্র) গভীর জ্ঞানের উপর।

দরসে নেজামীর বিশেষত্ব ঃ দরসে নেজামীর পাঠ্য বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করলে এমন জ্ঞান সঞ্চার হয়, যদ্বারা অদেখা-অজানা আরবী কিতাবসমূহ ও সহজবোধ্য হয়ে পড়ে।

দরসে নেজামীতে হাদীস-তাফসীর সংযোজন ঃ আজ হতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ হিজরী ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রকে দরসে নেজামীতে সংযুক্ত করা হয়। কারণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয় যে, ইমামগণের যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, সে বিষয়ে হাদীসের শ্রেণী, স্তর এবং মানের তত্ত্ব অবগত হওয়া এবং হাদীস বর্ণনাকারী সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান রাখা একান্ত আবশ্যক। এই কারণে হাদীস শাস্ত্রকে পাঠ্যভুক্ত করা হয়। সেই হতে আজও উহা মাদরাসা পাঠ্য সিলেবাস ভূক্ত হয়ে রয়েছে।[২]

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার শ্রেণী বন্টন ঃ সে যুগে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার পাঠ্য বিষয়সমূহ দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। তম্মধ্যে সর্বনিম্ন শ্রেণীর নাম ছিল 'জামাতে দহম' (বা দশম শ্রেণী) এবং সর্বোচ্চ শ্রেণীর নাম ছিল জামাতে উলা (বা প্রথম শ্রেণী)। অর্থাৎ আজকালকার শ্রেণী বিন্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। পরীক্ষায় ইংরেজী ও ফার্সী বিষয় দুটি কেবল ইচ্ছাধীন ছিল। এছাড়া আর সকল বিষয় বাধ্যতামূলক ছিল। কালভেদে এই সিলেবাসে কিছু কিছু রদবদল হলেও উপরিউক্ত পাঠ্য পুস্তকসমূহ ১৯৮০ সাল হতে ১৯০১ সাল পর্যন্ত মোট ১২০ বৎসর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় প্রচলিত ছিল।

---

১. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ১৩৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

সর্বপ্রথম পরীক্ষা গ্রহণ ঃ আজ হতে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮২১ সালে ১৫ আগষ্ট কলকাতা আলিয়া মাদরাসার ছাত্রদের সর্বপ্রথম সরকারি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বৃটিশ রাজত্বকালে ইহাই ছিল পাক-ভারতের সর্বপ্রথম পরীক্ষা। কারণ এ সময়ে কলকাতা আলিয়া ব্যতীত পাক-ভারতে অন্য আর কোন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই পরীক্ষা কলকাতা টাউন হলে গৃহীত হয়েছিল। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারি হতে আরম্ভ করে বড় বড় কর্নেল, সেক্রেটারী এবং কলকাতা শহরের শিক্ষিত ও গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমানগণ পর্যন্ত টাউন হলে এসে সমবেত হন। ১৮২১ সাল হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কলকাতা আলিয়ার পরীক্ষা গ্রহণের সেই একই প্রথা প্রচলিত রয়েছে।[১]

পাঞ্জম শ্রেণী সংযোজন ঃ ১৯০১ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার পরিচালক কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে, কলকাতা আলিয়াতে হাদীস, তাফসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অতঃপর জামাতে উলাকে সিনিয়র 'সালে চাহারম' নাম দিয়ে এক বৎসরের কোর্স 'সালে পাঞ্জম' ক্লাস খোলা হয়। সালে পাঞ্জম ক্লাসে হাদীসের মিশকাত শরীফ এবং তাফসীরের তাফসীরে জালালাইন নামক কিতাবদ্বয়কে সিলেবাসভুক্ত করা হয়। তিন-চার বৎসর এই ক্লাসটি চলেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ছাত্র অভাবে সালে পাঞ্জম নামক শ্রেণীটি উঠিয়ে দেয়া হয়।[২]

টাইটেল শ্রেণী বিভাগ সুচনা ঃ জমাতে উলা পাস করার পর বাংলাদেশের ছাত্রগণ হাদীস ও তাফসীর পড়ার জন্য দলে দলে যখন হিন্দুস্থান যেতে আরম্ভ করল, তখন মাদরাসা কমিটির সদস্যগণ কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় টাইটেল বা স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলার আবশ্যকতা অনুভব করলেন। ১৯০৮ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি সিহাহ সিত্তার কিতাব, উচ্চস্তরের ইল্‌মে কালাম, ইল্‌মে মান্‌তিক, ইল্‌মে ফালসাফাহ্‌, উচ্চপর্যায়ের তাফসীরসমূহ এবং ইসলামের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য নেসাব কমিটি সরকারের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবের সারাংশ ছিল এই-

---

[১] আব্দুস সাত্তার, উর্দূ তারিখে মাদ্রাসা আলিয়া, পৃ. ৬১।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

ক) জমাতে উলা বা সালে চাহারম পাস করার পর স্নাতকোত্তর টাইটেল ক্লাসের প্রত্যেক শাখায় ৩ বৎসর অধ্যয়ন করতে হবে।

খ) শেষ পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে কমপক্ষে ৭০ নম্বর অর্জন করতে হবে। এই পরীক্ষায় হাদীস শাখায় উত্তীর্ণদের ফখরুল মুহাদ্দিসীন উপাধিতে ভূষিত করা হবে।

গ) এই টাইটেল ক্লাসটি শুধুমাত্র কলকাতা আলিয়া মাদরাসাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সরকার উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলো মেনে নিয়েছিলেন।[1]

১৯০৮ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় টাইটেল ক্লাস খুলে উহাতে নুতন নুতন বই সিলেবাসভুক্ত করা হলে সে সময় শিক্ষকের বিশেষ অভাব দেখা দেয়।

টাইটেলের জন্য নুতন শিক্ষক নিয়োগ ঃ কলকাতা আলিয়া মাদরাসার টাইটেল খোলার পর এখানে শিক্ষাদানের জন্য আরও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই জন্য কানপুর হতে হযরত মাওলানা ইসহাক বর্ধমানীকে এবং দিল্লী হতে তাফসীরে হাক্কানীর প্রণেতা বিখ্যাত মুফাস্‌সির মাওলানা অবদুল হক হাক্কানীকে এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রধান মাওলানা আবদুল্লাহ টৌকীকে আনা হল। ইহা ছাড়া রামপুর স্টেট মাদরাসার প্রিন্সিপাল যুগশ্রেষ্ঠ দর্শন শাস্ত্রের ইমাম মাওলানা ফজলে হক রামপুরীকে এবং বিহার হতে মাওলানা আবদুল ওহাব বিহারীকে টাইটেল শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

টাইটেল পরীক্ষার ফলাফল ঃ অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে টাইটেল শ্রেণীর লেখাপড়া আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু ৩ বৎসর পর সেন্টার পরীক্ষায় দেখা গেল যে, দুই-এক নম্বরের জন্য কোন পরীক্ষার্থী ৭০ পর্যন্ত নম্বর পাইনি শুধু তাই নয় ১৯০৮ সাল হতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত[2] এই দীর্ঘ ৭ বৎসরের মধ্যে একজন প্রার্থীও টাইটেল পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি। শিক্ষা বিভাগ হতে ইহার কৈফিয়ত তলব করা হল।

---

[1] মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ১৩৯।

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

উত্তরে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, শতকরা ৭০ নম্বর পাসের জন্য নির্ধারণ করা অবৈধ হয়েছে। কারণ জগতের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাসের নম্বর শতকরা ৭০ রাখা হয়নি। আবার কোন কোন কিতাব যেমন তফসীরে তাবারী ৩০ খন্ড ও তাফসীরে কাশশাফের ৩ খন্ড পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় উহা পাঠদান করা শিক্ষকের জন্য এবং উহা হতে জ্ঞান লাভ করে পরীক্ষাদান ছাত্রদের জন্য অসাধ্য ব্যাপার ছিল। ইহার পর শিক্ষা বিভাগ মাদরাসা কমিটির সুপারিশ মতে পাসের হার শতকরা ৫০ নম্বর ধার্য করলেন এবং তফসীরে কাশশাফের ১ম খন্ড ও তফসীরে তাবারীর ১ম খন্ড শুধু পাঠ্যভুক্ত করার অনুমতি দান করলেন।

ইতিহাসের প্রশ্নে মতবিরোধ ঃ সে সময়ে টাইটেল ক্লাসের ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন সিরাতুন্নবী গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ)। তিনি একদা টাইটেল শেষ পরীক্ষায় কতিপয় প্রশ্ন করেন, যার মধ্যে হযরত ইবরাহীম নবীর যুগে বিবাহ তালাকের কি প্রথা প্রচলিত ছিল, তা উল্লেখ কর- এরূপ একটি প্রশ্ন ছিল।

এই প্রশ্নটি নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। প্রিন্সিপাল ও রেজিষ্ট্রার মি. হার্লি প্রশ্নটি পাঠ্যভূক্ত বলে এবং ছাত্রগণ প্রশ্নটি পাঠ্য বহির্ভূত বলে মন্তব্য করতে লাগলেন। মি. হার্লির দলীল যেহেতু আদম (আঃ) হতে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত। অতএব হযরত ইবরাহীম (আঃ) বিষয়ক প্রশ্ন পাঠ্য তালিকাভূক্ত হবে।[১]

আমাদের পরীক্ষার পর ইসলামের ইতিহাসের পাঠ্য তালিকায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ধার্য করা হয়। টাইটেল পরীক্ষায় পাসের জন্য শতকরা ৫০ নম্বর ধার্য করার পর ১৯১৫ সালে সর্বপ্রথম সিলেট নিবাসী দুইজন প্রার্থী মাওলানা রমিজউদ্দীন ও মাওলানা বোরহান উদ্দীন টাইটেল পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ফখরুল মুহাদ্দিসীন উপাধি লাভ করেন।[২]

---

১. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ১৩৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৃত্তি লাভ

ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) ১৯১৬ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে হাদীস বিভাগে কামিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখায় মুহাম্মদ মুহসিন[১] ও সরকারি বৃত্তি লাভ করেন।

১। যে দানবীর বাংলার দরিদ্র মুসলামানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের কল্যাণের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিপুল সম্পত্তি মুক্ত হস্তে দান করেছেন, তিনি হলেন হাজী মুহম্মদ মুহসীন।

বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর দান অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়। গরিব, মেধাবী মুসলমান ছাত্ররা যাতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে সে জন্য তিনি কলকাতায় ১৮০৬ সালে তাঁর তৎকালীন এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি দিয়ে 'মুহসীন ট্রাষ্ট' গঠন করেন।

মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য হাজী মুহম্মদ মুহসীন হুগলী জেলায় একটি কলেজ ও একটি মাদরাসা স্থাপন করেন এবং এসব প্রতিষ্ঠান তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির আয় দিয়ে পরিচালিত করেন। তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুহসীন ট্রাষ্ট গঠন করেছিলেন তা কার্যকর হয়নি। সকল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা শিক্ষার জন্য এই অর্থ লাভ করত। অধঃপতিত দরিদ্র মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের যে উদ্দেশ্যে মুহসীন তাঁর সম্পত্তি দান করেছিলেন তা পূরণ হয়নি।

অবশেষে ১৮৭৩ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফ, স্যার উইলিয়াম হান্টার প্রমুখ ব্যক্তিদের আন্তরিক চেষ্টায় মুহসীন ট্রাষ্টের অর্থ শুধু বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এবং গরিব ও মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করার ব্যবস্থা করে যান। ফলে শত শত দরিদ্র, মেধাবী মুসলমান ছাত্র এ ট্রাস্ট থেকে বৃত্তি লাভ করে জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করার সুযোগ পায়। এতে সমাজের শিক্ষা বিস্তারের কাজ সহজ হয়। বিপুল সম্পদের মালিক হয়েও হাজী মুহসিন অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

সমাজের জনহিতকর কাজে তিনি সব সম্পত্তি ব্যয় করেছেন। মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তারের ভূমিকার জন্য তিনি চির অম্লান ও চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইংরেজী শিক্ষা

১৯০৬ সালের শেষের দিকে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তখন হতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত মাদরাসায় আরবী বিভাগে মাইনর ক্লাশ পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আলিয়া মাদরাসার দোতলায়[১] চারটি বড় কামরা ছিল। আরবী ক্লাশ শেষ হওয়ার পর প্রত্যেক কামরায় একজন মাস্টার[২] এক ঘন্টা করে ক্লাশ নিতেন। হেড মাস্টার সাহেব মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে যে ছাত্রকে যে ক্লাশের উপযুক্ত মনে করতেন তাকে সেই ক্লাসে পড়ার অনুমতি দিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক ক্লাশে টাইটেল ক্লাশের ছাত্র, জুনিয়র ক্লাসের ছাত্র ও সিনিয়র ক্লাশের ছাত্র মিশ্র হয়ে যেত। এই ক্লাশগুলোতে শুধুমাত্র ইংরেজী সাহিত্য[৩] শিক্ষা দেয়া হত। মমতাযউদ্দীন এই ক্লাশের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। ১৯১০ সাল হতে ম্যাট্রিকের ইংরেজী সাহিত্য ও গ্রামার প্রভৃতি ফাযিল ক্লাশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়।[৪] সেই সুবাদে মাওলানা মমতাযউদ্দীন আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালেই আরবী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষায় বুৎপত্তি অর্জন করে ফেলেন।

পরবর্তীতে ১৯১৬ সালে ফখরুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী লাভ করার পর ইংরেজী শিক্ষায় আরও বুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।[৫] এবং সেখান হতে ১৯১৮ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় গোল্ড মেডেলসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তাঁর পিতা জান্নাতবাসী হলে তিনি সংসার জগতের কঠিন সংগ্রামে নেমে পড়েন। আর সেই সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ থেকে নিজেকে গুটিয়ে দেন।[৬]

---

[১] মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ১৪১।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

[৫] শফিউল আযম, "বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সমাজসেবক মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমাদ" দৈনিক ইনকিলাব, ২ এপ্রিল ১৯৯০।

[৬] শফিউল আযম, প্রাগুক্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিক্ষকবৃন্দ

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) অভিজ্ঞ, দায়িত্ববান, কর্তব্য পরায়ণ ও স্বনামধন্য ইসলামী বিশেষজ্ঞ উস্তাদের শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন। তাঁর উস্তাদগন সবাই গভীর পান্ডিত্যের পাশাপাশি চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্নেহবাৎসল্য ও নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। তাঁদের সান্বিধ্যে যে এসেছে সেই সফল হয়েছে। তিনি আজীবন তাঁর উস্তাদগণের অবদানের কথা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে গেছেন। নিম্নে মাওলানা মমতাযউদ্দীনের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন উস্তাদগণের পরিচিতি দেয়া হলো।

শামসুল উলামা মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী

মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ আমীর। মাওলানা হাক্কানী ১২৬৭ হিজরী মুতাবেক ১৮৫০ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতৃপুরুষগণ তেবরেজের শাসনকর্তার বংশের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। তৈমুর বংশীয়দের রাজত্বকালে তাঁর পিতৃপুরুষগণ দিল্লীতে আগমন করেন।[২]

তিনি মাওলানা লুতফুল্লাহ আলীগড়ী ও লক্ষ্ণৌর মুফতি ইউসুফ-এর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং দিল্লীর মাওলানা নজির হোসাইন ওরফে মিয়া স্যাহেবের নিকট হতে হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। কাদিয়ানী প্রভৃতি লা-মাযহাবী দল তাঁকে যমের মত ভয় করত। হিন্দু পন্ডিত ও ইংরেজ পাদ্রীগণের জটিল প্রশ্নের তিনি ইসলামসম্মত সঠিক ও সরল উত্তরদানের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন।[৩]

---

[১] মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৫১।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে উসূলুল ফিক্হ-এর প্রসিদ্ধ কিতাব হুসামী এর ব্যাখ্যা আলিম সমাজে বিশেষ ভাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এছাড়া তারিখে বনী ইসরাইল, তারিখে বায়তুল মুকাদ্দাস, আল বায়ানো ফি উলুমিল কুরআন যাতে তিনি আসমানী কিতাব তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুরের সাথে কুরআন পাকের তুলনামূলক আলোচনা করে সকল ধর্মের সাথে ইসলামের বিশেষত্ব প্রদর্শন করেছেন। কিতাবখানা ৬৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সহজ উর্দূ ভাষায় কুরআন পাকের তরজমা এবং আট খন্ডে সমাপ্ত তাফসীরে হাক্কানী তাঁর জ্ঞান সমুদ্রের জ্বলন্ত প্রমাণ।[১]

মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী তাফসীরে হাক্কানীর জন্যই চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। মুসলিম জাহানে তাঁর রচিত এই তাফসীর একটি অদ্বিতীয় অবদান। ১৯১২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড মৌলভীর পদ খালি হল। এ সময় মাদরাসার কর্তৃপক্ষ মাওলানা আবদুল হক হাক্কানীকে এ পদে অধিষ্ঠিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই মর্মে তাঁর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মাওলানার পক্ষ হতে কোন উত্তর আসলোনা। তখন গভর্ণরের খাস দূত নওয়াব স্যার শামসুল হুদাকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি অনেক বিনয়-আরজ করে মাওলানাকে উক্ত পদ গ্রহণের জন্য রাযী করান।[২]

১৯১২ সালের মধ্যভাগে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড মৌলভীর পদ অলংকৃত করেন।[৩] এই মহাপুরুষ ১৯১৫ সালে দিল্লীতেই পরলোকগমন করেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর পীর হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রহঃ)-এর মাযারের নিকটে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

---

১. মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৫১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

শামসুল উলামা মাওলানা নাযের হাসান দেওবন্দী

মাওলানা নাযের হাসান দেওবন্দের অধিবাসী এবং মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর হাদীস শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় উস্তাদ ছিলেন।

১৯১৪ সালে মাওলানা নাযের হাসান কলকাতা আলিয়া মাদরাসার এডিশনাল হেড মৌলভীর পদে আমন্ত্রীত হন এবং মাওলানা আবদুল হক হাক্কানীর ওফাতের পর অস্থায়িভাবে তিনি হেড মৌলভীর পদ অলঙ্কৃত করেন।[১]

হাদীস শাস্ত্রের অদ্বিতীয় এই মহাপন্ডিতের বর্ণনাধারাও ছিল অপূর্ব। তিনি মুসলিম শরীফের সবক দান করতেন।

১৯১৭ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসের উস্তাদ নিযুক্ত হন। এই মহাপুরুষ ১৯২৩ সালে ঢাকাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন।[২]

শামসুল উলামা মাওলানা মুফ্তী আবদুল্লাহ টৌকী

মাওলানা আবদুল্লাহ টৌকী মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ীর নিকট মা'কুলাত (দর্শন) এবং দিল্লীর প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তা মাওলানা নাযির হাসান ওরফে মিয়া সাহেবের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করে শিক্ষা সমাপ্তির সনদ লাভ করেন। তিনি সেকালে পাক-ভারতে ফিকহ, হাদীস এবং মা'কুলাতের প্রসিদ্ধ উস্তাদ ছিলেন।

নিজের যোগ্যতা বলে মাওলানা টৌকী লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল এবং পরে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর প্রফেসর নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯১৭ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড মৌলভী নিযুক্ত হন।[৩] মাওলানা টৌকী একজন বিশিষ্ট লিখক ছিলেন। তাঁর প্রণীত হামদুল্লাহ নামক প্রসিদ্ধ কিতাবের ব্যাখ্যা এবং উসূলে হাদীসের নোখবাতুল ফিকর নামক কিতাবের ব্যাখ্যা জগদ্বিখ্যাত। ১৯২০ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে অবসর গ্রহণ করেন।

---

[১] মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৫৬।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

শামসুল উলামা মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ) সেরহদী

শামসুল উলামা মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মর্দান জেলাস্থ মারতুম তহসীলে আনুমানিক ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম আবদুর রহমান ওরফে জোয়াদ শাহ। হযরত জোয়াদ শাহ একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন।

শাহ সূফী তালেব শহীদ নামে মাওলানা সফিউল্লাহ সাহেবের একজন মামা ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত আলিম ও ওলীয়ে কামিল ছিলেন। মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ) এই বুযুর্গের নিকট হতে জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার শিক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে এই বাতেনী শিক্ষাই তাঁর অন্তরে আল্লাহ প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আল্লাহর ইশ্‌কে পাগল হয়ে দিনের পর দিন তিনি বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন গভীর রাতে তিনি এক কবরস্থানের নিকট দিয়ে যেতেছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেনঃ 'সফিউল্লাহ! এদিকে এস এই ডাকের দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, এক বৃদ্ধ অর্ধ শায়িত অবস্থায় কবর হতে তাঁকে ডাকতেছেন। এই শায়িত ব্যক্তি ছিলেন অতি বড় একজন বুযুর্গ। তাঁর হাতে ছিল চুড়ি এবং মাথায় ছিল মেয়েদের ন্যায় লম্বা চুল। চির নিদ্রার মধ্যে থেকে তিনি সাধনা করতেন। মেয়েদের মত পোষাক ছিল বলে তাঁকে হামজা বেগম বলা হত। তিনি মাওলানা সফিউল্লাহকে ডেকে নিকটে বসালেন এবং তাঁকে এমন শিক্ষা দান করলেন, যার কারণে তিনি যা পড়তে পারতেন না তা পড়ে নিতেন এবং দুর্বোধ্য বিষয়ও সহজে বুঝে নিতেন।

এখান হতে তিনি পেশোয়ার জেলার বামখেল নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং মনের উদাসীনতা হ্রাসের জন্য তিনি ওলীয়ে কামেল হযরত লালাজি কেবলার হাতে বাইয়াত হন। হযরত লালাজির নাম ছিল শাহ আবদুল হক। সীমান্ত প্রদেশে তিনি লালাজী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই লালাজী কেবলার ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ আবদুল কাইয়ুম হতে মাওলানা সফিউল্লাহ ফয়েজ লাভ করেন। শাহ আবদুল কাইয়ুম সীমান্ত প্রদেশে বামখেলের বাদশাহ সাহেব বাবা নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

---

১. মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৫৭।

হযরত লালাজী (রহঃ) কেবলার দরবার হতে বের হয়ে মাওলানা সফিউল্লাহ পাহাড়িয়া এলাকার বহু শিক্ষা বিশারদের সংশ্রবে আসেন এবং নানা প্রকার বিদ্যার অধিকারী হন। পীর-মুর্শিদের আদেশ হল, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার চেয়ে শিক্ষাদান করা ভাল কাজ। এরপর তিনি রামপুর ষ্টেটে আগমন করলেন এবং মান্তিক ও ফালসাফা (তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র) শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র রামপুর সরকারি মাদরাসায় গিয়ে শিক্ষাপদ্ধতি অবলোকন করলেন।

১৯০১ সালে তিনি রামপুর ছেড়ে কলকাতা আগমন করেন এবং করিম বখস ব্রাদার্স প্রেসের মালিকের বাড়িতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা উক্ত প্রেসের মালিক কোন একটি মাস'আলা জিজ্ঞাসা করলে তার সন্তোষজনক উত্তরে তিনি বুঝতে পারলেন যে, মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ) একজন উচ্চস্তরের আলিম। এদ্ব্যতীত কয়েকজন মাদরাসার ছাত্রও তাঁর নিকট পড়তে আরম্ভ করে এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (রহঃ) চাঁদনী চকের মাদরাসায় তাঁকে মাসিক ২০ টাকা বেতনে মুদাররিস নিযুক্ত করেন।

ইতোমধ্যে মীর রহমান আলী সাহেব তাঁকে মাসিক ৩০ টাকা বেতন দিয়ে কলকাতাস্থ রমজানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার কাজে যোগদানের অনুরোধ জানালে তিনি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন এবং রমজানিয়া মাদরাসায় চলে আসেন এবং অতি দক্ষতার সাথে শিক্ষা দান করতে থাকেন। তখন একমন চাউলের দাম ছিল মাত্র দুই টাকা। এদিকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় তখন ছালে পাঞ্জাম নাম দিয়ে একটি নুতন ক্লাস খোলা হয়েছিল। উক্ত ক্লাসের জন্য আলিমগণের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা হয়েছিল।

এই সংবাদ পেয়ে তাঁর জনৈক দেশীয় হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁকে উক্ত পদের জন্য দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করেন। তিনি এতে অমত প্রকাশ করলে উক্ত ব্যক্তি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি বললেন, আমি যথাস্থানে দরখাস্ত দিয়ে রেখেছি।

ইতিমধ্যে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার ইংরেজ প্রিন্সিপাল ড. রস রমজানিয়া মাদরাসার লাইব্রেরীতে কিছু দুষ্প্রাপ্য কিতাবের সন্ধান

জানতে পেড়ে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড মৌলভী মাওলানা আহমদকে সঙ্গে নিয়ে একদিন হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন। মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ) তখন ছাত্রগণকে ফার্সী ভাষায় তাফসীরে জালালাইন পড়াচ্ছিলেন। কারণ তিনি তখন উর্দূ বলতে পারতেন না। ড. রস ফার্সী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ)-এর ভাষণ শুনে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন।

ড. রস এই সুযোগে মাওলানা সফিউল্লাহ(রহঃ)কে ডেকে নিয়ে আসলেন এবং কলকাতা আলিয়ার এডিশনাল হেড মৌলভীর পদে কাজ করতে অনুরোধ করলেন। ১৯০৪ সালের ২০ এপ্রিল মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ) রমজানিয়া মাদরাসা ছেড়ে মাদরাসা-ই-আলিয়ার কাজে যোগদান করেন। এডিশনাল হেড মাওলানার পদে তখন এই চাকুরীর বেতন গ্রেড ছিল ১৫০-৮০০ টাকা।

মাদরাসা-ই-আলিয়াতে তিনি মোল্লা সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সর্বসাধারণ মাওলানার উপর মোল্লা উপাধিকে প্রাধান্য দিত বলে তিনি মোল্লা উপাধি বর্জন করেন। তিনি দাদাজী উপাধিটি খুব পছন্দ করতেন যার ফলে তাঁর পরিবার তথা বিশেষ বিশেষ মহলে তাঁকে দাদাজী বলে ডাকা হত। আজও তিনি দাদাজী বলে ভক্ত-অনুরক্ত মহলে সুপরিচিত রয়েছেন।

মানতিক ও ফালসাফার উচ্চস্তরের কিতাব হামদুল্লা, সাদরা প্রভৃতি কিতাব তিনি কখনও হাতে নিয়ে পড়াতেন না, মুখস্থ পড়াতেন। এমন সংক্ষেপে বিষয়ের মূলবস্তুসমূহ বুঝিয়ে দিতেন যাতে ছাত্রগণ শেখ আবু আলী সিনার নিকট পড়ছে বলে মনে করত।

তাফসীরে কাশ্‌শাফ পড়াবার কালে মনে হত তিনি যেন আল্লামা যামাখশারীর সাথে যোগাযোগ রেখে পড়াচ্ছেন। অথচ কাশ্‌শাফের লিখক মু'তাযিলা আকিদার লোক ছিলেন বলে নিজের ঘরে তিনি কখনও কাশ্‌শাফ রাখিতেন না। ছাত্রদের নিকট হতে কিতাব নিয়ে পড়াতেন।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ ২৪ বৎসর সময় অতিবাহিত করেছেন। তদুপরি হজ্ব উপলক্ষে দীর্ঘ ৪ মাস একই সাথে

থাকার ও একই উটের পিঠে একাধিকক্রমে ৩০/৪০ দিন ভ্রমণ করার সুযোগও লাভ করেছিলেন।

হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ সেরহদি (রহঃ) কলকাতা আলিয়া মাদরাসার এডিশনাল হেড মৌলভী হিসেবে যোগদান করেছিলেন একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতার আলিয়ার নিয়ম ছিল যে, হেড মৌলভীর পদ খালি হলে এডিশনাল হেড মৌলভী সেই পদের জন্য নির্বাচিত হবেন। কিন্তু মাওলানা সফিউল্লাহর যুগে যখনই উক্ত পদ খালি হয়েছে এবং তাঁকে উক্ত পদের প্রার্থী হওয়ার জন্য বলা হল তখনই তিনি নিম্নোক্ত হাদীসটি পাঠ করে উক্ত পদপ্রার্থী হতে অস্বীকৃতি জানালেন। হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- হে মায়ায! সর্দারী চাহিও না, যদি তোমাকে উহা দেওয়া হয় তবে তোমাকে সাহায্যও করা হবে। সবশেষে মাওলানা মাজেদ আলীর বিদায় গ্রহণের পর মাদাসার সকল শিক্ষক একত্রিত হয়ে মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ) কে বললেন, "হুযুর! আপনার কারণে আমাদের সকলের প্রমোশন বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং তাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।" শিক্ষকদের এ কথা শুনে তিনি যেন বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং তিনিই সকলের ক্ষতির কারণ হয়ে আছেন মনে করে হেড মৌলভীর পদ গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর মাদরাসা-ই-আলিয়ার এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯২৯ সালে তিনি চাকুরী হতে অবসর নেন।

হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ) ১৯৪৭ সালের ৮ জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন এবং কলকাতার ১৮/১নং চাক্কু খানসামা লেনে তাঁর বাড়ির পার্শ্বস্থ স্থানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

তিনি তাঁর সময়ের কুতুবুল আউলিয়া বা ওলীগণের শিরোমনি ছিলেন। তাঁর জ্যৌষ্ঠপুত্র আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল গফুর বড় ভাইয়া নামে পরিচিত ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। স্বাধীনতার পর তিনি হিজরত করে শান্তিনগর ঢাকায় বাসস্থান নির্মাণ করেন এবং মৃত্যুর পর তথায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতি বৎসর তাঁর মাযারে ইসালে সওয়াবের উরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অসংখ্য ভক্ত এতে যোগদান করে থাকেন। দাদাজী মোল্লা সফিউল্লাহ মরহুমের কারামতের বয়ান সম্বলিত জীবনী গ্রন্থ তারই ভক্ত মৌলভী আবদুল ওহাব কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

শামসুল উলামা মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহইয়া সাহসারামী

শামসুল উলামা মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহইয়া সাহসারামী ১৮৮৬ সালে বিহার প্রদেশের শাহবাদ জেলার অন্তর্গত সাহসারাম পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] মাওলানা আবদুল ওহাব বিহারীর নিকট হতে তিনি দর্শনশাস্ত্রের সবক গ্রহণ করেন এবং মাওলানা আহমদ হোসাইন কানপুরীর নিকট হতে এর পূর্ণতার সনদ হাসিল করেন। এছাড়া দেওবন্দের শায়খুলহিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান হতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে পূর্ণতার সনদ হাসিল করেন।

বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্তির সনদ লাভ করার পর তিনি সাহারানপুরের বিখ্যাত মাযহারুল উলূম মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯০৯ সালে তিনি মাত্র ৬০ টাকা মাসিক বেতনে কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়াতে শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্য দ্বারা তিনি ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে থাকেন। অতঃপর ১৯২৯ সালে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়ার হেড মৌলভীর পদ অলঙ্কৃত করেন। সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৪২ সালে তিনি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন।

মাওলানা ইয়াহইয়া সাহসারামী (রহঃ) তিরমিযী শরীফের একটি অদ্বিতীয় নোট বা টিকা লিখেন। এতে খুশি হয়ে বৃটিশ সরকার তাঁকে শামসুল উলামা উপধিতে ভূষিত করেন। তিনি একাধারে ১২ বৎসর বুখারী শরীফের পাঠদান করেছিলেন। তিনি যেমন তেজস্বী, সূক্ষ্মদর্শী ও আধুনিক ভাবাপন্ন ছিলেন, তেমনি উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন আলিম ছিলেন। তিনি ফতহুল বারীর হাশিয়া-নোট প্রভৃতি দেখে বুখারী শরীফের দরস দিতেন। ১৯৫১ সালে এই মহাপুরুষ স্বীয় জন্মভূমি সাহসারামে ইহলোক ত্যাগ করেন। সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

শামসুল উসুল উলামা মাওলানা সা'আদাত হোসাইন

তিনি বিহার প্রদেশের আরা জেলার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪২ সালে তাঁর জন্ম হয়।[২] প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্রথমত লক্ষ্ণৌ নিবাসী মুফতী ইউসুফ সাহেবের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে দিল্লীর প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্র বিশারদ উস্তাদ নাযির হোসাইন ওরফে মিয়া সাহেবের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা সমাপ্তির সনদ লাভ করেন।

---

১. মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৬১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

অতঃপর তিনি বিহার প্রদেশের এক মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পরতে থাকে। যার ফলে তিনি প্রসিদ্ধ সাহারানপুর মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে অতি দক্ষতার সাথে শিক্ষাকার্য চালাতে থাকেন।

এদিকে তৎকালীন কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল তাঁর গুণ ও জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে তাঁকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করার জন্য আহবান জানালে ১৮৮৬ সালে তিনি উক্ত কার্যে যোগদান করেন।[১]

একদিন তিনি ক্লাসে শিক্ষাদানকালে বললেন, দেখ এই বাক্যের ব্যাখ্যা মৌলভী আবদুল হাই কি লিখিয়াছে।

তাঁর এই বাক্য শুনে সকলে আশ্চর্যান্বিত হল। কারণ মাওলানা আবদুল হাইয়ের মত একজন উচ্চস্তরের আলিম এবং উচ্চস্তরের বহু গ্রন্থের প্রণেতা ভারত বিখ্যাত আলিমকে তিনি মৌলভী বললেন এবং মন্তব্য করলেন যে, কঠিন স্থানে সকল আলিম কলম ধরে না। তাঁর এই মন্তব্যে জনৈক ছাত্র প্রশ্ন করল–হুযুর! মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের সাথে আপনার কি পরিচয় আছে? তিনি উত্তরে বললেন–হ্যাঁ জি! মৌলভী আবদুল হাইয়ের পিতা মাওলানা আবদুল হালিম ও জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের পুত্র মাওলানা হাফেজ আহমদ প্রমুখ আমরা মুফতী ইউসুফ সাহেবের নিকট একই ক্লাসে পড়তাম। এই কারণে মৌলভী আবদুল হাইকে আমি আমার নিজ পুত্র রসুল হামিদের ন্যায় জানি।

তাঁর এই বর্ণনা শুনে সকলে হতবাক হয়ে গেল এবং তিনি যে একজন অতি উচ্চস্তরের আলিম তা বুঝতে আর কারও বাকি রইল না।

শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন

কলকাতা নিবাসী শামসুল উলামা হযরত মাওলানা বেলায়েত হোসাইন ১২৬৩ হিজরী সালে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর পিতা মাওলানা খায়রাত হোসাইন বর্ধমান জেলার জজ ছিলেন। সে কারণে তাঁর পিতা মাওলানা খায়রাত হোসাইনও কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়া হতে জমাতে উলা পাস করেছিলেন।

---

১. মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৫৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

মাওলানা বেলায়েত হোসাইন ১৮৫৬ সালে যখন মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদী মাদরাসা-ই-আলিয়ার হেড মৌলভী হয়ে আসেন তখন তিনি জমাতে উলা ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। জমাতে উলা পাস করার পর তিনি ফাযিলে খায়রাবাদীর সঙ্গে রামপুর গিয়ে তাঁর নিকট মানতিক ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন। অতঃপর এই বিষয়ে পূর্ণতার সনদ লাভ করে মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৮৭৮ সালে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং শেষ বয়সে সহকারি হেড মৌলভীর পদে উন্নীত হন। অবশ্য হেড মৌলভীর অবর্তমানে তাঁকে অনেক সময় হেড মৌলভীর কাজও করতে হতো। তিনি ছিলেন পাক-ভারতের তৎকালীন একজন সুপ্রসিদ্ধ মুফতী। তাঁর কয়েক হাজার ফতোয়া কয়েক খন্ড কিতাব আকারে রক্ষিত ছিল।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন বলেন, ১৯০৬ সালে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) কলকাতা মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার সময় মাওলানা বেলায়েত হোসাইন সাহেবই ছিলেন সকলের চেয়ে বয়োঃজ্যেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি হিদায়া কিতাবের অদ্বিতীয় উস্তাদ ছিলেন। তিনি অতি দয়ালু এবং নরম তবিয়তের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নির্মল চরিত্রের বর্ণনা দেওয়া দুঃসাধ্য। গরীব অসহায়দের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু।

যে সকল ছাত্র তাঁর নিকট হিদায়ার একটি সবকও পড়েছে সে জীবনে কখনও তাঁকে ভুলিতে পারে নাই। আলিম সমাজে তাঁর সম্বন্ধে একটি উচ্চধারণা ছিল যে, তাঁর নিকট ফিক্‌হ পড়া ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমামের নিকট ফিক্‌হ পড়ার সমতুল্য। ১৯১১ সালের কথা। তিনি একদা ক্লাসে বললেন, অবসর গ্রহণের পর আমি লিল্লাহ হাদীস তাফসীর পড়াব।

জনৈক ছাত্র বলল, তা হলে আমরা কি আর হিন্দুস্থানে হাদীস পড়তে যাব না? (সে কালে মাদরাসা-ই-আলিয়াতে হাদীস-তাফসীর পাঠ্যভূক্ত ছিল না বলে ছাত্রগণ জামাতে উলা পাস করে হাদীস ও তাফসীর পড়ার জন্য হিন্দুস্থানে যেত)।

উক্ত ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন- দেখ আমি হিন্দুস্থানের আলিমদের পদধুলির সমানও নই, তবে আমার চেয়ে এক শব্দ বেশি জানার লোকও হিন্দুস্থানে কেউ নেই।

উল্লেখ্য যে, তিনি হাদীস পড়ছিলেন, বুখারী শরীফের টিকা লিখক মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট এবং মা'কুলাত ও দর্শন পড়ছিলেন, মাওলানা খায়রাবাদীর নিকট। এই পড়াতেই তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জ্ঞাতসারে কোন গুনাহ করি নাই, তবে অজানা গুনাহ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারবনা।' প্রকৃতপক্ষে কলকাতাবাসী তাঁকে ফেরেশতা সদৃশ বলে মনে করত।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বলেন, "এ নগণ্য তাঁর নিকট হিদায়া ও মসনবী শরীফ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।" তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য সরকার তাঁকে শিক্ষকতার সুযোগ দানের নিমিত্ত ১০/১২ বৎসর তাঁর চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, মাদরাসা হতে অবসর গ্রহণ করার পর সমস্ত কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে হাফিযে কুরআন আখ্যায়িত হন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা ড. হেদায়েত হোসাইনও শামসুল উলামা উপাধি লাভ করে একই পরিবারে দুইজন শামসুল উলামা হওয়ার গৌরব একমাত্র তাঁরাই অর্জন করেন। সুযোগ্য পিতার গুণধর পুত্র পিতার অবসর গ্রহণের পর মাদরাসা-ই-আলিয়ার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ বহুদিন যাবত তিনি অতি যোগ্যতার সাথে পালন করেন। শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন ১৯২২ সালে হজ্জব্রত পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। সৌভাগ্যক্রমে মাওলানা মমতাযউদ্দীনও সেইবার হযরত মাওলানা সফিউল্লাহর (দাদাজী মোল্লাহ সাহেব) সঙ্গে মক্কা শরীফে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) আরও বলেন, হজ্বে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমি একদিন হযরত মাওলানা বেলায়েত হোসাইন সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি এবং একত্রে একই জাহাজে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় কিনা জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি বলেন, আমি হজ্বের পর মদীনা শরীফেই থেকে যাব এবং সেখানে বাকি জীবন হাদীস শরীফ পড়ানোর কাজে নিযুক্ত থাকব। এই কারণে আমাকে সপরিবারে যেতে হবে। একমাত্র বড় ছেলে ড. হেদায়েত হোসাইনকে কলকাতায় রেখে যাব। এই সকল সাংসারিক ঝামেলা মিটাতে আমার অনেক দেরি হয়ে যাবে। তুমি বরং এখানকার এই জাহাজেই চলে যাও। তাঁর অনুমতিক্রমে এ নগণ্য হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ)-এর সাথে বোম্বাই অবস্থানরত জাহাজে চড়ে হজ্বের ৩২ দিন পূর্বে মক্কা শরীফ গিয়ে উপস্থিত হয়।"

হযরত মাওলানা বেলায়েত হোসাইন সপরিবারে হজ্বের মাত্র ৪/৫ দিন পূর্বে জিদ্দায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেকালে আরব দেশে মোটর গাড়ির প্রচলন ছিল না। উটের পিঠে চড়েই যাতায়াত করতে হত। উটের কাফেলা যাতে ২/১ দিন সময় লাগবে বলে মুয়াল্লিম তাঁর পরিবারস্থ সকলের থাকার জন্য জিদ্দায় একটি দোতলা বাড়ি ঠিক করে দিল। তিনিও সপরিবারে সেই বাড়িতে উঠলেন। শেষ রাত্রে যখন তিনি মসজিদে আযানের শব্দ শুনতে পেলেন তখন মসজিদে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। দ্বিতলের সিঁড়িটি ছিল অতি সংকীর্ণ। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় হঠাৎ পা পিচলে তিনি পড়ে যান এবং একখানা হাত ভেঙ্গে হাড় বের হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হল, ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। মুয়াল্লিম তাঁকে সেই অবস্থায়ই মক্কা শরীফে নিয়ে যায়। অন্যদের সাহায্যে তিনি খানা-এ কা'বায় উপস্থিত হয়ে তওয়াফ ক্রিয়া সমাধা করেন। হজ্বের দিন ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি আরাফাতের ময়দানে চলে যান এবং ঠিক হজ্বের খুৎবার মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ যোহরের শেষভাগে আরাফাতের ময়দানেই ইহরাম অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আসরের সময় আরাফাতের এক প্রান্তে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। পবিত্র মক্কায় অবস্থান করার উদ্দেশ্যেই তিনি ঘর হতে বের হয়েছিলেন আর সেই মক্কাতেই চিরদিনের জন্য থেকেও গেলেন।

শামসুল উলামা লুৎফর রহমান বর্ধমানী

মাওলানা লুৎফর রহমান পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নামক প্রসিদ্ধ মাদরাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাক-ভারতের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা লাভ করেন। এতদোপলক্ষ্যে তিনি জৌনপুরে মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ খান ও আলীগড়ের মাওলানা লূৎফুল্লাহ আলীগড়ীর নিকট হতে মানতিক ও ফালসাফা (তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র) ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্তির সনদ লাভ করেন। অতঃপর মাওলানা নাযির সাহান ওরফে দিল্লীর মিয়া সাহেবের নিকট হতে হাদীস শাস্ত্রের সনদ লাভ করেন।[১]

---

[১] মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৭৭।

শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৮৮২ সালে তিনি জৌনপুরের যে মাদরাসা হতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন সেই মাদরাসার শিক্ষক হয়ে শিক্ষাদান করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর যশ ও কীর্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে। পরে মাদরাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল মাদরাসা-ই-আলিয়াতে শিক্ষকতা করার পর তিনি ভূপাল স্বাধীন ষ্টেটের ইসলামিয়াত বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। ভূপাল হতে অবসর গ্রহণ করে তিনি নিজ অঞ্চলে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন এবং সেখানেই তিনি শিক্ষা দানে ব্রতী হন।

১৯০৩ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক তিনি শামসুল উলামা খেতাব প্রাপ্ত হন। ১৯০৯ সালে পূণরায় তাঁকে মাদরাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে তিনি চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি মাদরাসার উচ্চতম ক্লাসসমূহে কঠিনতম বিষয়সমূহ পড়াবার জন্য দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর বাসনা অনুযায়ী মাদাসার হেড মৌলভী তাঁকে টাইটেল ও ফাযিল শেষ বর্ষের কঠিনতম বিষয়সমূহ পড়াতে অনুমতি দান করেন।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বলেন, "তাঁর নিকট চারখানা কিতাব পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। চোখের জ্যোতি নষ্ট হওয়ায় তিনি কিতাব দেখিতে পাইতেন না সত্য কিন্তু কিতাবের মূল অর্থ ও বিষয়বস্তুর উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার ছিল। তাঁর শিক্ষাদান নীতি ছিল যে, ক্লাসের কোন এক ছাত্র পাঠ্য বইয়ের কয়েকটি বাক্য পড়ে যেত এবং তিনি উক্ত বাক্যসমূহের বিষয়বস্তু অতি সহজে ও সংক্ষিপ্তভাবে ছাত্রদিগকে বুঝিয়ে দিতেন। অবশেষে ছাত্রগণকে সবক বুঝেছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করতেন। যখন সকল ছাত্র বুঝেছি বলে মত প্রকাশ করত, তখন তিনি তাঁদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি আদায় করে পূণরায় সম্মুখে অগ্রসর হতেন। তবে টাইটেল ক্লাসে এক এক পরিচ্ছেদ পড়ার পর তার সারাংশ সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিতেন।"

তিনি অতি মেধাবী ও দক্ষ আলিম ছিলেন। তর্ক ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁর অসাধারন পাণ্ডিত্য ছিল। এই জন্য তিনি এই বিষয়ে নিজেকে অদ্বিতীয় বলে গর্ববোধ করতেন। অবশ্য তাঁর এই গর্ব অনর্থক ছিল না। কার্যক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অদ্বিতীয় হওয়ার প্রমাণ দিতেন। সেকালের বড় বড় আলিমও তাঁর এই দাবি মেনে নিয়েছিলেন।

তিনি জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক শেখ আবু আলী সিনার রচিত শেফা নামক গ্রন্থের সমালোচনা লিখে চল্লিশ স্থানে ভুল প্রমাণ করে হিন্দুস্থানের প্রত্যেক বিখ্যাত আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন এবং কোন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর সেই সমালোচনার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি।

ফার্সী ভাষায় তিনি যুগের অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় আলিম ছিলেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত খাকানী নামক কাব্য গ্রন্থখানা যা জগতে শ্রেষ্ঠতম ও কঠিনতম গ্রন্থ বলে প্রসিদ্ধ, তিনি উহাকে কারিমা নামক ফার্সী ভাষায় সহজতর কিতাব খানার ন্যায় পড়ে যেতেন। আবার কখনও তিনি খাকানী ও উরফী নামক কাব্য গ্রন্থদ্বয়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে কাব্য রচনা করতেন এবং প্রমাণ করে দিতেন যে, তাঁর রচিত কাব্য ইহাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং তাঁদের চেয়ে উত্তম।

সেকালে তিনি ফার্সী ভাষার একজন শীর্ষস্থানীয় কবি ছিলেন। জগদ্বিখ্যাত কবি শেখ সাদী ও হাফিজ সিরাজীর জন্মস্থান সিরাজ শহরের মাটি দিয়ে তিনি গঠিত বলে তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-

অর্থাৎ, "লুৎফর রহমানকে সিরাজের পবিত্র মাটি দ্বারা গঠন করা হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে বর্ধমানের ভূমিতে ফেলা হয়েছে"।

তাঁর কাব্যে মানতিক ও ফালসাফার পরিভাষা ব্যবহার করা হত। তাঁর কাব্য পূর্বকালীন কবিদের কাব্যের ন্যায় ভাবপূর্ণ হত। তাঁর এক উস্তাদের ওফাতের সংবাদ পেয়ে তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে দীর্ঘ কাব্য রচনা করেছিলেন তার প্রথম কবিতাটি নিম্নরূপ- "আমার অন্তরে দুঃখ ও অনুতাপের আগুন এত প্রখর ছিল যে, যদি তা অন্তর হতে বের করতাম তাহলে সমগ্র বিশ্ব পুড়ে হযরত জিব্রাইলের পাখাতে গিয়েও আগুন ধরে যেত।

ভূপালের রানীর সিংহাসনে আরোহণ উৎসব উপলক্ষে তিনি সুলতানুল কাসায়েদ নামে সুদীর্ঘ এক কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যখানা মুদ্রিত হয়ে বিদেশের বহু স্থানে প্রচারিত হয়।

তাঁর লিখিত কাব্যসমূহ সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনটির নাম দেওয়া হয়েছে উজ্জ্বল চকচকে মুক্তাসমূহ। উক্ত সংকলনের এক কপি আজও মাদরাসা-ই-আলিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে।

গুণের আদর ঃ

ক) একমাত্র বাঙালি শিক্ষাবিদ আলিম হযরত মাওলানা লুৎফর রহমানই নিজ বিদ্যাগুণে হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র ভূপালের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

খ) তৎকালীন হিন্দুস্থানের বিখ্যাত আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জৌনপুর মাদরাসাতে তিনি কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাংলার আলিমদের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয় বলা যেতে পারে।

গ) বৃটিশ সরকারের আমলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট ছাড়া কেহ সরকারি চাকুরীতে ঢুকতে পারত না, কিন্তু মাওলানা লুৎফর রহমান অন্ধ হয়েও বিনা পরীক্ষায় মাদরাসা-ই-আলিয়ায় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এর একমাত্র কারণ ছিল যে, তিনি অসাধরণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

ঘ) ১৯১০ অথবা ১৯১২ সালে লন্ডনস্থ পাক-ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেট হযরত মাওলানা লূৎফর রহমানের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মাসিক ৫০ টাকা হারে আজীবন বৃত্তি মঞ্জুর করেছিলেন। এই ধরণের বৃত্তি পাক-ভারতের দ্বিতীয় কোন আলিম পেয়েছিলেন কিনা তাহা জানা নেই।

১৯১৭ সালে তিনি কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়া হতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯২১ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

হযরত মাওলানা ফজলুল হক রামপুরী (রহঃ)

মাওলানা ফজুলুল হক রামপুরী (রহঃ) ১২৭৮ হিজরী সালে রামপুর ষ্টেটে জন্মগ্রহণ করেন।[১] ১০ বৎসর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফয করেন। অতঃপর তিনি হিন্দুস্থানের বিভিন্ন শিক্ষাবিদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

প্রথমত তিনি বেরিলীর মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ভূপালের সরকারি মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তারপর তিনি রামপুর সরকারি মাদরাসায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

---

[১] মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৭৯।

তিনি একজন খ্যাতনামা আলিম ছিলেন। তাঁর "মির যাহেদ উমূরে আম্মা" নামক কিতাবের ব্যাখ্যা পাক-ভারতের সর্বত্র অতি প্রসিদ্ধ। মানতিক ও ফালসাফা বিষয়ে তিনি ছিলেন পাক-ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয় আলিম। প্রসিদ্ধ দরুসুল বালাগাত গ্রন্থের আরবী ব্যাখ্যাও তিনি প্রকাশ করেন।

মাদরাসা-ই-আলিয়ার তৎকালীন প্রিন্সিপাল ড. স্যার ডেনিসন রস মাওলানা ফজলুল হকের সুখ্যাতি শুনে তাঁকে মাদরাসা-ই-আলিয়া শিক্ষকতা করার জন্য আহবান জানান। ড. রসের আহবান তিনি গ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ সালে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

যেদিন মাওলানা ফজলুল হক সাহেব শিক্ষক হিসেবে মাদরাসা-ই-আলিয়ায় প্রথম যোগদান করেন, সেইদিনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা গেল। যখন মাওলানা সাহেব মাদরাসায় উপস্থিত হলেন, তখন ছাত্রগণ তাঁকে দেখার জন্য ক্লাস হতে বের হয়ে পড়ে। শিক্ষক-ছাত্র সকলের মধ্যে যে কি এক আনন্দ! সকলেই গর্ববোধ করতে লাগলেন যে, সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমকে তাঁরা কাছে পেয়েছেন।

উস্তাদগণ একে একে তাঁর সাথে করমর্দন করতে লাগলেন। একজন সিনিয়র শিক্ষক প্রকাশ্যে বলেই উঠলেন ঃ আজ বঙ্গভূমি আপনার শুভাগমনে গৌরবান্বিত। প্রিন্সিপাল রস অফিস হতে বেরিয়ে এসে তাঁর সাথে করমর্দন করলেন। মাদরাসার হেড মৌলভী সাহেব অফিস হতে বের হয়ে এসে তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন এবং হেড মৌলভী ও প্রিন্সিপাল মাওলানা ফজলুল হক সাহেবকে টাইটেল প্রথম বর্ষের ক্লাসে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। উক্ত ক্লাসে ছিল ফাযিল পাস বৃত্তিধারী ছাত্রগণ। মাওলানা রামপুরীকে পড়াতে দিয়ে প্রিন্সিপাল ও হেড মৌলভী সাহেব পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় একজন ছাত্র একখানা কিতাব তাঁর সম্মুখে রেখে দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ভাই এটা কি কিতাব? উত্তরে ছাত্র বলল, হামদুল্লাহ। তিনি বললেন- ২০ বৎসরের মধ্যে কখনও এই কিতাব দেখে পড়াই নাই। তুমি বরং কিতাব দেখে পড়ে যাও। আমি উহার সারমর্ম বলে দিব। এই কথা শুনে ছাত্রটি প্রায় দুই পাতার মত পড়ে গেল। অবশেষে মাওলানা বলতে লাগলেন- ইহা ঐ বিষয়ের আলোচনা যাতে শেখ আবু আলী সিনা এই বলেছেন,

ফারাবী এই বলেছেন, ইমাম রাযী এই বলেছেন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের অভিমতে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে। তবে এখানে আমার মত এই, যাতে কোন প্রকার প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখন তোমরা কিতাবের সাথে মিলালে বুঝতে পারবে যে, গ্রন্থকার যা বলতে চেয়েছিলেন তার সারাংশ ইহাই। ছাত্রগণ তখনই কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল যে, তিনি যা বলেছেন তাই সঠিক। ঘন্টার পর ক্লাস হতে বের হলে প্রশ্ন করা হলঃ আপনার শিক্ষাদান শুনে ড. রস কি বললেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ যা বলার ছিল তাই বলেছে। ড. রস তা যদি না বুঝে থাকেন তবে তাঁর বোধশক্তির চিকিৎসা করুন। এমনই ছিল তাঁর নিজ পাণ্ডিত্যের উপর আত্মবিশ্বাস।

মাওলানা সাহেবের সাথে তাঁর পুত্র হাফিজ আফজালুল হকও আগমন করেন এবং মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া হতে ফাযিল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১০ সালে রাজপুরের নওয়াব তাঁকে রামপুর সরকারি মাদরাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করায় তিনি নিজ মাতৃভূমিতে চলে যান। ১৯৪০ সালে তিনি রামপুর শহরে ইহলোক ত্যাগ করেন।

403554

শামসুল উলামা মাওলানা হাফেয মুহম্মদ ইসহাক বর্ধমানী

তিনি ১৮৭০ সালে বর্ধমান জেলার কৈথুন নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১] নিজ গ্রামে ফার্সী শিক্ষা লাভ করে মঙ্গলকোটের বিখ্যাত আলিম মাওলানা মুহাম্মদ-এর নিকট প্রাথমিক পর্যায়ে আরবী শিক্ষা লাভ করেন। অতপর কানপুর প্রসিদ্ধ জামেউল উলূম মাদরাসার প্রধান পদে নিযুক্ত ছিলেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)। এই মাদরাসা হতে তিনি শিক্ষা সমাপ্তির সনদ লাভ করেন। অতপর তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে মাওলানা থানভী (রহঃ) তাঁকে উক্ত মাদরাসার শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। মাওলানা তানভীর সংস্পর্শে এসে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আরও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। এমনকি মাওলানা থানভী (রহঃ) মাদরাসার কাজ ছেড়ে গ্রন্থ রচনায় ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন, তখন তিনি মাওলানা ইহসাক সাহেবকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

---

[১] মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (র), মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৮১।

মাওলানা ইসহাক সাহেবকে হিন্দুস্থানের এতবড় এক মাদরাসার প্রধান পদে নিযুক্ত করায় হিন্দুস্থানের বড় বড় আলিমের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যায় যে, একজন বাঙালিকে কেন এই পদে নিযুক্ত করা হল? এই তুমুল আন্দোলনের জবাবে হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ) তাঁর এক দীর্ঘ নিবন্ধে লিখেছিলেন, আমি খুব ভেবে-চিন্তে দেখেছি যে, আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে এত বড় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাধা করার যোগ্যতা একমাত্র ইসহাকের মধ্যেই রয়েছে। এ কাজে আমি স্বদেশী ও বিদেশীর দিকে লক্ষ্য করিনি বরং মাদরাসার উপকারার্থেই আমি এই কাজ করেছি।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বলেন, "হযরত মাওলানা ইসহাক (রহঃ) একদা আমাদের পাঠদানের সময় বলেছিলেন যে, এক সময় পাঞ্জাব হতে ৫/৬ জনের একটি বাছাই করা হাদীস শাস্ত্রের দক্ষ আলিম দল আমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমার ক্লাসে বসে আমার পাঠদান শুনতে থাকেন। অবশেষে বিদায়ের সময় তারা এই মন্তব্য করে যান যে, অর্থাৎ আহা যদি আপনি বাঙালি না হতেন তাহলে আপনার পদ চুম্বন করতাম। অর্থাৎ পড়া উত্তম, তবে আপনি বাঙালি। বাঙালিকে তাঁরা অতি ঘৃনার চোখে দেখত এবং অতি তুচ্ছ মনে করত"।

একদিন হযরত মাওলানা ইসহাক (রহঃ) বলেছিলেন, আমি একরাত্রে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি প্রস্রাব করতেছি এবং আমার প্রস্রাবে কুরআন মাজীদ ভেসে যাচ্ছে। এই স্বপ্ন দেখে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লাম। সকালে হযরত থানভী (রহঃ)-এর নিকট এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বললেন, তুমি কুরআনের হাফিয হবে।

তাঁর এই ব্যাখ্যা শুনে কুরআন মাজিদ হিফ্য করার জন্য আমার মনে দারুণ আগ্রহ দেখা দিল। ইতিমধ্যে রমযানের ছুটি এসে যাওয়ায় তৎসঙ্গে আমি আরও দেড় মাসের ছুটি বাড়িয়ে নিলাম এবং কুরআন মাজীদ মুখস্থ করতে আরম্ভ করলাম। দুই মাস ছাব্বিশ দিনে আমার পূর্ণ কুরআন মাজীদ হিফ্য হয়ে গেল এবং আমি মুখস্থ শুনিয়ে দিলাম।

এত অল্প সময়ে পাক-ভারতের মধ্যে অন্য কেহ কুরআন মাজীদ হিফ্য করতে সক্ষম হয়েছেন বলে শোনা যায় না। তিনি অত্যাধিক প্রখর স্মরণ-শক্তির অধিকারী ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের উপরও তাঁর পূর্ণ দখল ছিল। সেকালে পাক-ভারতে হাদীস শাাস্ত্রবিদদের মধ্যে মাওলানা ইসহাকের স্থান ছিল অতি উচ্চে। সিহাহ সিত্তার হাদীসসমূহ প্রায় তাঁর মুখস্থ ছিল।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তাঁর আপন ভাগিনা মাওলানা জাফর আহমদ উসমানীকে তাঁর নিকটে হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য সোপর্দ করেছিলেন। হযরত মাওলান উসমানী তাঁর হাদীসের সনদে হযরত মাওলানা ইসহাক সাহেবের নাম উল্লেখ করতে গৌরব বোধ করতেন।

একথা সদর্পে বলা যায় যে, বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত মাওলানা হাফেয ইসহাক সাহেবের ন্যায় অন্য কোন হাদীসবিদ (মুহাদ্দিস) জন্মাতে সক্ষম হয়নি। পাক-ভারতের সকল হাদীস শাস্ত্র বিশারদ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বালাদেশে একমাত্র মুহাদ্দিস ছিলেন হযরত মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী (রহঃ)।

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার তৎকালীন প্রিন্সিপাল ড. রস মাওলানা ইসহাকের হাদীস শাস্ত্রের অভিজ্ঞতার সংবাদ পেয়ে তাঁকে কলাকাতা আলিয়া মাদরাসায় হাদীস পড়াবার আমন্ত্রণ জানান। মাওলানা ইসহাক (রহঃ) নিজ দেশের সেবার জন্য ড. রসের আহবান আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইসহাক ১৯১০ সালে কলাকাতা আলিয়া মাদরাসায় একজন সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতপর ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রফেসর পদে প্রমোশন পেয়ে ঢাকায় আগমন করেন। এই পদ হতে অবসর গ্রহণ করার পর তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর ইসলামিয়াত বিভাগে অধ্যাপনার কাজ করতে হয়। ১৯৮৩ সালে কলকাতায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় এই মহাপুরুষ ইহলোক ত্যাগ করেন। কলকাতা মুসলিম গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর রচিত বহু অমূল্য গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর জামাতা এবং সাবেক ঢাকা টেক্সটবুক কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মৌলভী খলিলুর রহমান এদেশের একজন নামকরা শিক্ষাবিদ ও বক্তা ছিলেন।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) যে ক'জন শিক্ষাবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের নিকট থেকে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন তাঁরা এই বর্ণনাকে অতি তুচ্ছ ও অসম্পূর্ণ বলে অভিহিত করবেন, কিন্তু যারা এ সকল আলিম-উলামার সাক্ষাৎ পাননি, তাঁরা অবশ্য এ বর্ণনাকে অতিরঞ্জিত মনে করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৈবাহিক অবস্থা

ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ করেও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। তবে ধারণা করা হয় যে, তিনি ১৯১৮ সালে গোল্ড মেডেলসহ মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফেনী জেলার মাতু ভূঁইয়া বংশে মুখতার মমতাযউদ্দীন-এর কন্যা নেসা বিবির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে ৯ ছেলে ও ৩ মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।

তাঁর ৯ ছেলে ৩ মেয়ে ঃ

১। ফযলে হালিম মাসুম।
২। মুহাম্মদ মাহমুদ (মৃ)।
৩। মাসুদ আহমদ।
৪। মওদুদ আহমদ।
৫। মনযুর আহমদ।
৬। মনছুর আহমদ।
৭। মতলুব আহমদ।
৮। মাহবুব আহমদ।
৯। শাকের আহমদ।

তাদের সন্তানাদি ঃ [1]

১। ফযলে হালিম মাসুম	৩ ছেলে।
২। মুহাম্মদ মাহমুদ (মৃ)	২ মেয়ে।
৩। মাসুদ আহমদ	৩ ছেলে ১ মেয়ে।
৪। মওদুদ আহমদ	১ ছেলে ১ মেয়ে।
৫। মনযুর আহমদ	১ ছেলে ১ মেয়ে।
৬। মনছুর আহমদ	২ ছেলে।
৭। মতলুব আহমদ	২ ছেলে।
৮। মাহবুব আহমদ	১ ছেলে ১ মেয়ে।
৯। শাকের আহমদ	২ মেয়ে।

---

[1] ডাঃ এরফানউদ্দীন, সাক্ষাৎকার, ২৯ জুন ২০০৫ খ্রী.।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্মজীবন

ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর কর্মজীবন ছিল ঘটনাবহুল। কলকাতা ও ঢাকার ভিত্তিতে তাঁর এই কর্মজীবন আবর্তিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলকাতা কেন্দ্রীক [১]

১৯১৯ সালে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহ:)-এর পিতা জান্নাতবাসী হলে তিনি সংসার জগতের কঠিন সংগ্রামে নেমে পড়েন। হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহের সঠিক পথ খুঁজছিলেন, ঠিক এ সময়েই তিনি খবর পেলেন, কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় একজন শিক্ষক প্রয়োজন। তখন তিনি তথায় চাকুরীর জন্য আবেদন করেন।

মাদরাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ হার্লি এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তরুণের হাদীস শাস্ত্রের উপর তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষা সমাপ্তির সাথে সাথে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি লাভ তাঁর ইসলামী জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা ও কলকাতা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষকগণের স্নেহের পাত্রে পরিণত হওয়ার পরিচয় বহণ করে। শিক্ষকতা গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই সর্বত্র তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পরে। অতঃপর এ প্রকাশমান সুনাম ও যশের কারনেই তাঁর গুণগ্রাহীদের উৎসাহে তিনি ১৯২১ সাল হতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে অধ্যপনায় নিয়োজিত থাকেন। এরপর ১৯২৬ সালে পূণরায় কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য যে, কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক পদে বাঙ্গালী মুসলমান হিসেবে তিনিই প্রথম নিযুক্ত হন। তিনি মাদরাসায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শ্রেণীসমূহে হাদীস, তাফসীর, ও ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।

হজ্জ্বব্রত পালন ঃ ১৯২২ সালে তিনি তাঁর ওস্তাদ তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ওলিয়ে কামিল ও আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ)-এর সাথে হজ্জ্বব্রত পালন করেন।[২]

হজ্জ্ব পালন করার সময় তিনি মক্কা ও মদীনায় অবস্থিত ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত এবং মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র পদচিহ্নে ধন্য ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন।

[১] ১৯১৯-১৯৪৭।

[২] মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ), পরীবাগের শাহ সাহেবের জীবনী, চৌধুরী পাবলিসার্স, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৯৭ খ্রী. পৃ. ৯।

তম্মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর জন্মস্থান, প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর মসজিদ, ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল (রাঃ)-এর মসজিদ, হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্মস্থান, হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর মাযার, হেরাগুহা, আরাফার ময়দান, মিনা ও মুযদালিফার ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানসমূহ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মদীনায় অবস্থিত স্থানসমূহের মাঝে তথাকার বিশেষ বিশেষ পাহাড়, কূপ, মসজিদ-এ নবুবীর মাকসুরা ও মিহরাবের মধ্যবর্তি রিয়াযুল জান্নাত নামক স্থানে বিশেষ নামায আদায় এবং শ্রেষ্ঠ সাহাবী, আহল-এ বায়াত ও মহানবী (সাঃ)-এর আত্মীয়পরিজনের সমাধিস্থল বা জান্নাতুল বাকী যিয়ারত করেন। মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) তাঁর হজ্ব পালন সম্পর্কে স্বীয় পরীবাগের শাহ্ সাহেবের জীবনী গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

"কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়ার হেড মৌলভী আমাদের দাদাজী হযরত মাওলানা ছফিউল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহে যুগের একজন গাউছ ছিলেন।

আমি তখন ছাত্র, ছাত্র হিসেবে হযরত মাওলানা সাহেব কেবলার খেদমতে আট বৎসরের মত ছিলাম এবং মাদরাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষক হিসেবে প্রায় ২৫ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার সংশ্রবে থাকার গৌরব অর্জন করি।

ইংরেজী ১৯২২ সন। হযরত মাওলানা সাহেব কেবলা যখন প্রথমবার হজ্বে রওয়ানা হইলেন, তখন আমিও তাঁহার সহযাত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করলাম। আমাদের এই সফরে বোম্বাই হতে জেদ্দা পর্যন্ত যাতায়াত করতে এক মাসেরও উর্ধ্বকাল সময় লেগেছিল এবং জাহাজে আমাদের এই গুরু-শিষ্যকে একই বিছানায় কালাতিপাত করতে হয়েছিল।

অতঃপর মক্কা ও মদীনা শরীফে যাতায়াতেও পূর্ণ ২৯টি রাত্রি আমাদের এই দু'জনকে একই উটের পিঠে অতিবাহিত করতে হয়েছে। আরব দেশে পৌঁছেও প্রায় পাঁচ মাসকাল এভাবে কালাতিপাত করতে হয়েছিল। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন শরীফ হোসেনের শাসন ক্ষমতার শেষ যুগ, একদম নিবু নিবু অবস্থায়...এই যায় যায়, এই বুঝি

গেল। আরবে তখন এমন ব্যাপকভাবে অরাজকতা শুরু হয়েছিল যে, লুটতরাজ, নরহত্যা এসবতো খুবই সাধারন ব্যাপার ছিল, আর হাজী হত্যাকেতো আরবের লোকেরা তাঁদের বিশেষ একটা আমোদ-প্রমোদের মধ্যে স্থান দিয়ে রেখেছিল। গরমের মৌসুম ছিল বলে কাফেলাকে রাত্রিতে চলাচল করতে হত।

প্রত্যেক রাত্রিতেই আমাদের কাফেলার মধ্য হতে দশ-বারজন করে হাজী নিহত হত।

আরবরা কেন এরূপ জঘন্য কার্যকলাপ করত, তাঁদের আর্থিক শোচনীয় অবস্থায়ই এর একমাত্র মূল কারণ ছিল"।

তিনি আরও লিখেছেন, আমাদের কাফেলা যখন প্রসিদ্ধ একটি যুদ্ধপ্রিয় গোত্রের মহল্লার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গমন করছিল, ঠিক সে সময় হঠাৎ মহল্লাবাসী আমাদের কাফেলার চলার পথ রোধ করে, আমাদের নিকট হতে অতিরিক্ত দক্ষিণা আদায় করে রাখতে চাইল।

এ নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক হল। শেষ পর্যন্ত যখন মহল্লাবাসীরা কোন মীমাংসাই মেনে নিতে রাযী হল না, তখন বাধ্য হয়েই কাফেলার পাঁচ সহস্র উষ্ট্র চালক তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে বসল।

এদিকে আমরা বিদেশী হাজীগণ তখন জীবন মরণের মধ্যে রাত কাটাতেছিলাম। বহু তীর বন্দুক চলার পর অবশেষে দেখা গেল মহল্লাবাসী পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল, অর্থাৎ গাঁ ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল। অজস্র রকমের আপদ-বিপদ এবং মক্কা শরীফে পৌঁছে আল্লাহর ঘরে ও মদীনা শরীফে পৌঁছে হযরত রাসূলুল্লাহর রওযা পাকে হযরত মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেব রাহেমাহুল্লার যে সমস্ত কারামত ও কাশফের প্রকৃতরূপ এবং রূহানী কার্যকলাপ দেখার সুবর্ণ সুযোগ আমার হয়েছিল, তাঁর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করতে গেলে আলাদা ভাবে বিরাট একটি গ্রন্থ রচনা করতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঢাকা কেন্দ্রিক [২]

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান দেশ বিভাজনের পর কলকাতা আলিয়া মাদরাসার যাবতীয় রেকর্ড লাইব্রেরী ও আসবাব-পত্রাদী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা স্থানান্তরিত হলে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) ২৯ জন শিক্ষকসহ ঢাকাতে চলে আসেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) তাঁর লিখিত পরীবাগের শাহ্ সাহেবের জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "ইংরেজী ১৯৪৭ সন পাকিস্থান কায়িম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার মাদরাসা-ই-আলিয়াকে যখন ঢাকায় স্থানান্তরিত করার আদেশ হল, তখন উক্ত মাদরাসার তৎকালীন প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে উনত্রিশ জন শিক্ষকসহ ঢাকাতে আসতে হুকুম করলেন এই স্টাফের মধ্যে আমিই ছিলাম সকলের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ।"

তিনি ঢাকায় এসে ঢাকার নওয়াব গেইটে অবস্থিত ঢাকা মাদরাসার হোষ্টেলে সাময়িকভাবে অবস্থান করেন। এবং উক্ত মাদরাসাতেই সকাল সাতটা হতে দুপুর এগারটা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লাসে কুর'আন, হাদীস, ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান করতে থাকেন। কিছুদিন পর সরকার বাহাদুর নবরায় লেনের পাঁচ-ছয়টি বাড়ী রিকুইজিশন করে শিক্ষকদের থাকার ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ঢাকার নওয়াব গেইটে ঢাকা মাদরাসার হোষ্টেলে সাময়িকভাবে দিন কয়েকের জন্য আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হল এবং উক্ত মাদরাসাতেই সকাল ৭টা হইতে দুপুর ১১টা পর্যন্ত ক্লাস করার জন্য আমাদের উপর আদেশ দেয়া হল।

এদিকে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সরকার বাহাদুর নবরায় লেনের পাঁচ-ছয়টি বাড়ী রিকুইজিশন করে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন"।

পরবর্তীতে তিনি পুরাতন ঢাকার ১১নং কায়েতটুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

এভাবেই কলকাতা ও ঢাকায় একটানা ৩৪ বছর তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ তথা ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দান করে ১৯৫৩ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুপার নিউমেরারী অধ্যাপক হিসেবে তিন বছর দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৫৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

আনুষ্ঠানিক অবসর গ্রহণের পরও তিনি অনিয়মিত ও অনানুষ্ঠানিক ভাবে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দান করতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছাত্রবৃন্দ

ফখরুল মুহাদ্দিসীন হযরত মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর ঘটনাবহুল কর্মজীবনে দেশ-বিদেশের অসংখ্য ছাত্র দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা করেছে। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের জীবন চরিত উল্লেখ করা হলো।

মাওলানা মুফতী সাইয়্যিদ আ'মীমুল ইহসান বরকতী মুজাদ্দেদী

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম উক্ত মাদরাসার হেড মাওলানার (অধ্যাপক) পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন যিনি তিনি হলেন আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী সাইয়্যিদ আ'মীমুল ইহসান বরকতী মুজাদ্দেদী (রহঃ)। তাঁর পূর্বে দুইশত বর্ষ পর্যন্ত উক্ত মাদরাসার কোন ছাত্রের পক্ষে উক্ত পদ লাভ করা সম্ভব হয়নি। তিনি ১৩২৯ হিজরী সনের ২২ মুহাররম, সোমবার (১৯১১) ভারতের বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মুঙ্গের জেলায় নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা মৌলভী হাকীম সাইয়্যিদ আবুল আযীম আবদুল মান্নান শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ পাটনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা পশ্চিম বঙ্গের কলকাতা শহরের জালিয়াটুলিতে বসতি স্থাপন পূর্বক তিব্বী চিকিৎসালয় পরিচালনা করতেন বিধায় তিনি বাল্যকাল হতেই কলকাতায় লালিত পালিত হন। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সেই পবিত্র কুরআন পাঠ সমাপ্ত করেন।[১]

প্রাথমিক স্তরে আরবী, উর্দূ, ফার্সী, কিছু বাংলা ও ইংরেজী বই-পুস্তক বাড়িতেই প্রাইভেটভাবে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর চাচা শাহ আবদুদ্দাইয়ানের নিকট ফার্সী ভাষা শিখেন এবং তাঁর শ্বশুর হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবূ মুহাম্মদ বরকত আলী শাহ সাহেব ফাঞ্জাবীর নিকট কুরআন শরীফের তরজমা, তাফসীর, নাহু, সরফ, হিসনে হাসীন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভের পর তাঁর হাতে বায়'আত করে তরীকতের শিক্ষা লাভ করেন। সে কারণে তিনি বরকতী ও মুজাদ্দেদী বলে স্বীয় পরিচয় দান করতেন।[২]

---

১. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৬৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

তিনি সুপ্রসিদ্ধ কাতিব মুন্সী মাজেদ আলী ও মুন্সী আবদুর রশীদ খানের নিকট হাতের লেখা সুন্দর করার তালীম নেন। সেজন্য তার হাতের লেখা বড়ই চমৎকার ছিল। ১৯২৬ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে রীতিমত শ্রেণী শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং প্রতিটি শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন।

কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে তিনি ১৯২৯ সালে আলিম, ১৯৩১ সালে ফাযিল ও ১৯৩৩ সালে টাইটেল মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষাসমূহে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। শ্রেণী শিক্ষা সমাপ্ত করার পরও তিনি ব্যক্তিগত ভাবে প্রসিদ্ধ উস্তাদগণের নিকট হাদীস, তাফসীর, ইলমে তিব্ব ও জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। বিশেষ করে শামসুল উলামা মাওলানা ইয়াহইয়া সাহসারামী এবং মাওলানা মোশতাক আহমদ কেরানবী কানপুরীর নিকট তর্কশাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিশাস্ত্র, গণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ের উচ্চস্তরের গ্রন্থাদি প্রাইভেট ভাবে অধ্যয়ন করেন। ইলমে ক্বির‘আত ও তাজবীদের পৃথক সনদ লাভ করেন। ফতোয়া-ফারায়েয লেখার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ নাখোদা মসজিদ ও মাদরাসার প্রধান শিক্ষক এবং ১৯৩৫ সাল হতে এর ইমাম মুফতী নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সাল থেকে মধ্য কলকাতার মুসলিম ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার ও কাযীর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ভারত বিভাগ পূর্ব কাল পর্যন্ত তিনি একসাথে ঐ সকল দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। উক্ত সময়ে তিনি লক্ষাধিক ফতোয়া-ফারায়েয দান করেন এবং তাঁর নিকট বিভিন্ন ধর্মের চার হাজারেরও অধিক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি সরকারের ধর্মীয় উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং ১৯৪০ সালে নিখিলবঙ্গ কাযী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি সপরিবারে হিজরত করে ঢাকায় চলে আসেন এবং উক্ত মাদরাসার অধ্যাপনার কাজে যথারীতি নিয়োজিত থাকেন। বহুকাল যাবত তিনি টাইটেল ক্লাসে বুখারী শরীফের পাঠদানে নিযুক্ত ছিলেন

এবং হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ের প্রান্তিক কিতাবাদি পড়াতেন। ১৯৪৯ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের ইসলামী আইন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি হজ্বব্রত পালন করেন। মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী হেড মাওলানার পদ হতে অবসর গ্রহণের পর উক্ত পদ খালী ছিল। তিনি হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তনের পর সরকার তাঁকে উক্ত পদে নিয়োগ করেন।

১৯৬৬ সালে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের ইমামতি এবং জাতীয় ঈদগাহের ইমামতির অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৬৯ সালে পরিণত বয়সে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ পূর্বক ১৪নং কলুটোলা, ঢাকায় তাঁর নিজ বাড়িতে অবস্থান করে তাঁর অগণিত ছাত্র, ভক্ত ও মুরীদানকে তরীকতের শিক্ষা দান করতে থাকেন। এই মহাপুরুষ ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে, ১০ শাওয়াল ১৩৯৪ হিজরী তারিখে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর নির্মিত কলুটোলা মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিনি ছিলেন অতি নম্র, ভদ্র, মিষ্টভাষী, সদালাপী, ইলম ও আমলের আদর্শ দিশারী। মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চ। প্রতি জুমু'আয় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে তিনি নিজে রচনা করে যে সকল খুৎবা পাঠ করেছিলেন উহার একটি বিরাট সংগ্রহ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত আছে। এতদ্ভিন্ন শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সারা জীবনে শতাধিক গ্রন্থ আরবী, ফার্সী, উর্দূ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় রচনা করেছিলেন। উহার অধিকাংশই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ইলমে হায়াত বা জ্যোতির্বিদ্যার একজন সুদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন।

তিনিই সর্বপ্রথম এই দেশে রমযানের রোযার ইফতার-সাহরী ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের চিরস্থায়ী সময়সূচী বা ক্যালেন্ডার আবিস্কার করেন যা বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদে ও মুসলমানদের ঘরে ঘরে প্রচলিত থেকে তাঁর স্মৃতি বহন করে। তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে একজন পূর্ণ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁকে হাফিযে হাদীসও বলা হয়। মোট কথা, পাক-ভারতের তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিলেন। প্রতিটি জরুরী বিষয়ে তিনি কোন না কোন বই রচনা করেছেন। তাঁর পুত ও পবিত্র জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত শিক্ষা ও সাধনায় লিপ্ত থাকেন। তিনি তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠতম আলিম ও মুজাদ্দিদ ছিলেন। তাঁকে বিদ্যার সাগর বললেও অত্যুক্তি হবেনা।

মাওলানা আবদুস সাত্তার

উর্দূ ভাষায় মাদরাসা-ই-আলিয়ার বিস্তারিত ইতিহাস তারীখে মাদরাসা-ই-আলিয়া এর প্রণেতা মাওলানা আবদুস সাত্তার মাদরাসা-ই-আলিয়ার একজন কৃতী ছাত্র ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ জান। তিনি ১৯০৮ সালে ভারতের বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।[১]

কিন্তু তাঁর পিতা যেহেতু জীবীকার অন্বেষণে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটীর গরীফায় বসতি স্থাপন করেছিলেন সেহেতু তিনি গরীফাতেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৯১৭ সালে হুগলী মোহসেনিয়া মাদরাসায় জুনিয়র তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন। হুগলী মাদরাসায় নিউস্কীম শিক্ষা কোর্স প্রবর্তনের পর সেখানে তাঁর পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন বেকার থাকার পর তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতায় ১৯২০ সালে জুনিয়র ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। কলকাতার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বসবাস করে তিন মাইল পথ পদব্রজে দৈনিক যাতায়াত করে তাঁকে মাদরাসায় ক্লাস করতে হতো।

১৯২২ সালে বৃটিশ পণ্য বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনে মাদরাসার ছাত্রগণও অংশগ্রহণ করে। তিনি তখন সিনিয়র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এমন সময় তাঁর পড়া আবার স্থগিত হয়ে যায়। আন্দোলন শেষ হলে তিনি পূণরায় ১৯২৩ সালে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে আলিম লোয়ার স্টান্ডার্ড পরীক্ষা পাস করেন। সিনিয়র চতুর্থ বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষায় আরবী ও ইংরেজীতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির জন্য মাসিক চৌদ্দ টাকা হারে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। এতে তাঁর পাঠোন্নতির পথ সুগম হয়ে যায়।

১৯২৫ স্যালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি মাসিক পনের টাকা হারে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তখনকার দিনে কামিল ফখরুল মুহাদ্দিসীন কোর্স তিন বছরের ছিল। উক্ত বৃত্তি সহকারে তিন বছর টাইটেল ক্লাসে অধ্যয়ন শেষ করে ১৯২৮ সালে ফখরুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ফল প্রকাশের পাঁচ দিন পরেই ১৯২৮ সালে ৬ আগষ্ট তিনি উক্ত মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন।

---

[১] মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৯৩।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঢাকায় সপরিবারে স্থানান্তরিত হন এবং মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় পূর্ববৎ শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে কলকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় তাঁর কলকাতা শহরতলির বাড়ি হিন্দুদের দখলে চলে যায় এবং ১৯৫২ সালে পাটনার পৈতৃক সম্পত্তিসমূহ ভারত সরকার জবরদখল করে নেয়। সর্বহারা মুহাজির হিসেবে ঢাকা শহরে সূত্রাপুর বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে বসতবাড়ি নির্মাণ করে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করেন। মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার উচ্চতর শ্রেণীসমূহে তিনি হাদীস, তাফসীর পড়াতেন ও উর্দূ ভাষা শিক্ষা দিতেন।

এতদভিন্ন তিনি ১৯৪০ সাল হতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সহকারী রেজিষ্ট্রারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মাদরাসা-ই-আলিয়ার গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের যাবতীয় দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। তাঁর রচিত তারিখে মাদরাসা-ই-আলিয়া উক্ত বিভাগ হতেই প্রকাশিত। তাঁর রচিত উর্দূ সাহিত্য মুনতাখাবাতে উর্দূ ও বাহারে উর্দূ মাদরাসা পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভূক্ত। তিনি ১৯৬৫ সালে চাকুরী হতে নিয়মিত অবসর গ্রহণ করে সূত্রাপুরস্থ নিজ বাড়িতে অবসর জীবন-যাপন করেন। শান্ত, সরল ও কর্মঠ বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

মাওলানা মুস্তাফীজুর রহমান

মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা এ. কে. এম মুস্তাফীজুর রহমান বা আবুল কালাম মুহাম্মদ মুস্তাফীজুর রহমান ছিলেন একজন অসাধারণ জ্ঞানী, গুণী, সাহিত্যিক ও লেখক। তিনি লক্ষ্মীপুর জেলার আবদুল্লাহপুর গ্রামে ১৯১৫ মতান্তরে ১৯১৯ সালের ১ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।[১]

তাঁর মাতা বিবি রহিমা খাতুন ছিলেন বিদূষী মহিলা। তিনি ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে দিবারাত্রি কাটাতেন। তিনি তাঁর কাছেই ৭/৮ বছর বয়স পর্যন্ত যাবতীয় সূরা-ক্বির'আত শিক্ষা করেন ও কুরআন সমাপ্ত করেন। এরপর তাঁর পিতা মুন্সী মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী মিয়া পুত্রকে আলিম বানানোর মানসে তাঁকে ভবানীগঞ্জ কারামতিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি করেন। সেখানে তিনি মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে ১৯৩৩ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় পাঠানো হয়।

---

১. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৯৩।

কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে তিনি ১৯৩৫ সালে ফাযিল ও ১৯৩৭ সালে কামিল মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পরবর্তী দুই বছর গবেষণা বৃত্তি নিয়ে সেখানে গবেষণা করেন। এই সময় হতে তিনি পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন। মাদরাসা-ই-আলিয়ার তৎকালীন প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর শামসুল উলামা মূসা সাহেব তাঁর মেধা ও কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মাদরাসায় সহকারী মৌলভীর পদে নিয়োগ করেন। কলকাতা হতে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরের পর তিনি ১৯৫৬ সালে ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে উন্নীত হন। এই পদটি ছিল অস্থায়ী। পরবর্তী বর্ষে উর্দূ প্রভাষকের পদ খালি হলে তাঁকে ১৯৫৭ সালে উক্ত পদে স্থায়িভাবে নিয়োগ করা হয়।

মাওলানা মুস্তাফীজুর রহমান ছিলেন মিষ্টভাষী, সদালাপী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি। তাঁর কোনদিন কোন অসুখ হয়েছে বলে জানা যায়নি। ১৯৬০ সালে জানুয়ারীর দ্বিতীয সপ্তাহের শুরুতে তিনি হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হন। তখন তিনি আজিমপুর কলোনির ২৮নং দালানে সরকারি বাসায় বাস করতেন। তথায় জীবনে প্রথম বারের মত অসুস্থ হয়ে যে ঔষধ সেবন করেন তাতে জ্বর কমতে কমতে ১২ জানুয়ারী, ১৯৬০ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শবদেহ স্ব-গ্রামে পৈতৃক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। দৈনিক আজাদ পত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসেবে তিনি মাওলানা আকরম খাঁর প্রিয় পাত্র ছিলেন। ড. এনামুল হক ও ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ প্রমুখ মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে বহুল পরিচিতি লাভ করেন। মাওলানা মুস্তাফীজ স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক তাঁর রচনাবলি সম্বলিত জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত পুস্তক শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও মাওলানা জামালুদ্দীন আফগানী পর্যন্ত সর্বত্র পরিচিত ও সমাদৃত।

মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী

মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা উক্ত মাদাসার হেড মাওলানার পদে অধিষ্টিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ছিলেন দ্বিতীয় জন। তাঁর পূর্বে প্রথম জন ছিলেন মাওলানা মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহসান আর তৃতীয় জন ছিলেন মাওলানা ইয়াকূব শরীফ। ইতিপূর্বে প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত উক্ত মাদরাসার কোন ছাত্রের পক্ষে উক্ত পদ লাভ করা সম্ভব হয়নি।

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর থানার অন্তর্গত দাউদপুর পরগনাধীন সাতগাঁও গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম, চৌধুরী জমিদার পরিবারে ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মৌলভী আবদুল জব্বার চৌধুরী, ডাকনাম আজদু মিয়া। স্থানীয়ভাবে মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ও দানামিয়া সাহেব নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

সিলেটের প্রখ্যাত আলিম মাওলানা ফারাসউদ্দীন তাঁদের বাড়িতে জায়গীর থেকে মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরীকে প্রাইভেট পড়াতেন এবং ডালপা মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। তাঁর মত বুযুর্গ উস্তাদের সান্নিধ্যে থেকে মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরীর মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়। পরে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা-ই-জামেয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়াতে ১৯৩০ সালে ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসার প্রসিদ্ধ উস্তাদ মাওলানা সফিউল্লাহ চাঁদপুরী ও মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কিছুকাল পড়াশুনা করার পর তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৩৪ সালে কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়া থেকে প্রথম বিভাগে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী লাভ করেন। তৎপর ইংরেজী শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৩৭ সালে আরবীতে অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৩৯ সালে এম. এ. পাস করেন।

এভাবে শিক্ষাজবীন সমাপ্তির পর তিনি কলকাতা রিপন কলেজে প্রভাষক হিসেবে চাকুরী জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর বাড়িতে ফিরে তিনি ১৯৪৮ সাল থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে প্রথমে ভাইস প্রিন্সিপাল ও পরে প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে উক্ত কলেজকে সবল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তাঁকে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসার সিনিয়র মাওলানা হিসেবে বদলী করা হয়।

---

১. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৭১।

১৯৭১ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার হেড মাওলানা আল্লামা আবদুর রহমান কাশগরী (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁকে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার হেড মাওলানা পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এখানে এক বৎসর হেড মাওলানার দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৭২ সালে ৫৭ বৎসর বয়সে পেনশন সহকারে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা ও কলকাতায় কোন বাংলাদেশী আলিমকে হেড মাওলানার পদে নিয়োগ করা হয়নি। মাদরাসা-ই-আলিয়ার হেড মাওলানা থাকাকালীন সময় তিনি কামরাঙ্গীরচর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা তাঁর সাবেক ওস্তাদ মাওলানা আহমদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুরের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক খিলাফত লাভ করেন।

প্রকাশ থাকে যে, কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তির সময় তাঁর জন্মের বৎসর ১৯০৮ থেকে কমিয়ে ১৯১৫ করা হয়েছিল। সেমতে ১৯৭২ সনে তাঁর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হয়। অবসর জীবনে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্ব-গ্রাম সাতগাঁওয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি হাফেজ্জী হুযুরর খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। খিলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরারও তিনি সদস্য ছিলেন। সারা বাংলাদেশে তাঁর অগণিত ছাত্র ও ভক্ত বিদ্যমান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার করে বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদকল্পে মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী শেষ জীবন পর্যন্ত সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তাঁর স্ব-গ্রাম সাতগাঁয়ে কুরআনিয়া মোহাম্মদিয়া কাওমী মাদরাসা স্থাপন করেছেন, মসজিদ ও ঈদগাহ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করে উহার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করে শেষ জীবন অতিবাহিত করে অমর হয়ে রয়েছেন। দীর্ঘ বিশ বৎসর এইরূপে জনসেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৯২ সালের ২২ জুন নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে তাঁর পৈতৃক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

মাওলানা আবদুর রউফ হিন্দী

মাদরাসা-ই-আলিয়ার প্রসিদ্ধ ছাত্র নেতা মাওলানা আবদুর রউফ হিন্দী ১৯১৯ সালে চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জের অধীন সাদরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দেড় বৎসর বয়সে তাঁর পিতা মৌলভী আবদুল মজিদ ইন্তেকাল করেন। তৎপর বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত

রামগঞ্জ থানার অধীন ভাদুর মিঞাবাড়ির মরহুম আহমদ মিয়া মাস্টার (দরবেশ সাহেব) তাঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন।[১]

রামগঞ্জ থানাধীন দৌলতপুরের স্বনামধন্য মরহুম কারী ইবরাহীমের সান্নিধ্যে তাঁর মাদরাসায় এবং লক্ষ্মীপুর থানাধীন বশিকপুরের সুপ্রসিদ্ধ মৌলভী কাজী আবদুল্লাহর মাদরাসায় কিছুদিন পড়ালেখা করার পর নোয়াখালী সদরের মহান সাধক মরহুম মাওলানা আবদুস সোবহানের সান্নিধ্যে তিনি ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসায় ১৯৩১ সাল পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তথায় তিনি তদানীন্তন জামেয়া ইসলামিয়ার দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তৎপর তিনি ১৯৩২ হতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা সরকারি আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৩৭ সালে মহসিন স্কলার রূপে কামিল মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় সুনামের সাথে পাস করেন। আলিয়া মাদরাসার ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্র নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়্যাহ বাংলা ও আসামের তিনি শ্রেষ্ঠ সংগঠক ছিলেন বিধায় তাঁকে ‘মোকেযুত্তালাবা আলহিন্দী’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সে কারণেই তিনি মাওলানা আব্দুর রউফ হিন্দী নামে সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেন।

ছাত্র জীবনে তিনি মাল্টায় কারাবন্দী শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, ইমামুল হিন্দ হযরত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, হযরত মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রথম মুসলমান প্রিন্সিপাল শামসুল উলামা কামালুদ্দীন আহমদ এম. এ. ক্যান্টার, হযরত মাওলানা ড. সানাউল্লাহ বার এট-ল, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লী কবি জসীম উদ্দীন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক আব্বাসউদ্দীন, সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দিন ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনি শেরেবাংলার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তাঁকে দিয়ে চাখার, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে তার ভোট ক্যানভাস করাতেন।

---

১. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইফাবা (সম্পা), ঢাকা, ফেব্রু. ২০০৪, পৃ. ৯৫।

তাঁর শিক্ষককুলের মধ্যে মুফাসসিরুল কুরআন হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, হযরত মাওলানা ওজায়রেগোল দেওবন্দী, হাফিযুল বুখারী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী, শামসুল উলামা প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ মূসা, শামসুল উলামা প্রিন্সিপাল হেদায়েত হুসাইন, শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ হুসাইন, শামসুল উলামা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহসারামী ও শামসুল উলামা বেলায়েত হুসাইন প্রমুখ উলামায়ে কিরাম অন্যতম ছিলেন। চাকুরী জীবনে তিনি ১৯৩৮ হতে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ৩৮ বৎসর বিভিন্ন সরকারি মাদরাসা, স্কুল ও কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আরবীতে এম. এড. এবং বি. এ. পাস করেন। এতদভিন্ন তিনি ডিপার্টমেন্টাল বি. সি. এস. পরীক্ষাও পাস করেন।

১৯৬৯ হতে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৭২ হতে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসায় উচ্চতর ক্লাসে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৭৬ সালের টাঙ্গাইল কাগমারী মাওলানা মোহাম্মদ আলী সরকারি কলেজে অধ্যাপনার কাজ শেষ করে চাকুরী জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন।

চাকুরী জীবনেও তিনি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। বিশেষত বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন লীডার ট্রেনার ছিলেন। স্কাউটিং-এর ত্রিশাখাতেই তিনি উড্‌বেজার, বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ এলওয়ার্ড 'সিলভার টাইগার' পদকে ভূষিত হন। অবসর জীবনেও তিনি তিন বৎসরের এক সেসনে অবৈতনিক কমিশনার ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে তিনি আরবী সাহিত্যের "সাব'আয়ে মু'আল্লাকা" নামক আরবী কাব্য গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন।

মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুল হক

মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্র ও নামকরা শিক্ষক মাওলানা আবুল খায়ের মুহাম্মদ মাহবুবুল হক ভোলা জেলার দৌলতখাঁ থানাধীন চরপদ্মা গ্রামে ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আহমদ উল্লাহ। তিনি টবগী মাহমুদিয়া আলিয়া মাদরাসা হতে ১৯৪৬ সালে আলিম এবং ১৯৪৮ সালে প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ ফাযিল পাস করেন। তৎপর মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা হতে ১৯৫০ সালে প্রথম শ্রেণীতে কামিল মুহাদ্দিস ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যথাক্রমে আদীব ও আদীবে কামিল ডিপ্লোমা লাভ করেন।

অতপর ১৯৫৩ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় সহকারি মৌলভী পদের শিক্ষক হিসেবে প্রথম সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন। উক্ত পদে দীর্ঘকাল সুনামের সাথে শিক্ষকতা করার পর তিনি ১৯৭০ সালে তাফসীর বিষয়ের প্রভাষক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। উক্ত পদে কয়েক বৎসর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর তিনি আরবী আদবের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত পদটি অস্থায়ী থাকায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি এডিশনাল হেড মাওলানার স্থায়ী পদে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৮৫ সালে হেড মাওলানার পদ হতে মাওলানা ওবায়দুল হক অবসর গ্রহণ করায় তিনি হেড মাওলানার খালী পদের দায়িত্বও পালন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে ৫৭ বৎসর বয়সে পেনশনসহ চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। মোট কথা কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে ঢাকায় স্থানান্তরের পর হতে তিনি উক্ত মাদরাসার প্রথমে ছাত্র ও পরে শিক্ষকতার সকল পদে চাকুরী করার পূর্ণ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি ফাযিল ও কামিল বিভাগের উচ্চতর শ্রেণীসমূহে দীর্ঘকাল হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও আরবী সাহিত্যের কিতাবসমূহ বিশেষ করে বুখারী শরীফের পাঠ দান করে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র সারা বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে। এতদভিন্ন তিনি দীর্ঘকাল যাবত এমনকি অবসর গ্রহণের পরও ঢাকা হাইকোর্ট মাযার মসজিদের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দর্স দিতেন।

ওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ একজন অন্যতম মেধাবী ছাত্র। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা ও প্রিন্সিপাল উভয় পদে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করার গৌরব অর্জন করেন।

তিনি ১৩২৭ সালে ২৪ কার্তিক নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার অন্তর্গত সাদেকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব মাওলানা বশিরুল্লাহ একজন উচ্চস্তরের আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। স্থানীয় মক্তব ও মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় জুনিয়র ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। জুনিয়র মাদরাসা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে আরবী ও ইংরেজীতে দু'টি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যন্ত সর্বশ্রেণীতে ১ম স্থানের বৃত্তিধারী মেধাবী ছাত্র হিসেবে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৪৫ সালে কামিল মুমতাযুল মুহাদ্দেসীন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারের পর তিনি মাগুরা শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ হতে আই. এ. পাস করেন। অতপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এ. অনার্স ও এম. এ. পাস করেন। ১৯৫০ সালে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সকল বিভাগের উপর সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির জন্য তাঁকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারাদি দ্বারা ভূষিত করা হয়।

সরকারি চাকুরীত যোগদানের আগে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে আরবী ও উর্দূর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেখান হতে তৎকালীন সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক বি. সি. এস. পদের জন্য নির্বাচিত হয়ে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রথম সহকারী রেজিষ্ট্রার হিসেবে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন। পরে সরকারি কলেজের অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হন। ১৯৬৩-৬৪ সালে তিনি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতপর সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসার সিনিয়র মাওলানা ও সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে চাকুরী করার পর তাঁকে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড,

ঢাকায় উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। চাঁর বৎসর বৈদেশিক চাকুরীর সুবিধাদিসহ প্রেষণে থাকার পর তাঁকে ১৯৭২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকার হেড মাওলানার পদে সরকারি চাকুরীতে ফেরত আনা হয়।

এক বৎসর হেড মাওলানা থাকার পর তাঁকে উক্ত মাদরাসার প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত করে ১৯৭৩ সালে স্থায়ী করা হয়। তখন তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিষ্ট্রার ও প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে সরকারি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড একটি স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তিনি উক্ত বোর্ডের নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান মৌলভী বাকী বিল্লাহ খানের নিকট মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের যাবতীয় দায়িত্ব হস্বান্তর করেন।

তাঁর সময়ে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার দুইশততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জাঁকজমকের সাথে উদযাপিত হয় এবং মাদরাসার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এরপর তাঁকে সরকারি আলিয়া মাদরাসা সিলেটের অধ্যক্ষ হিসেবে বদলী করা হয়। উভয় মাদরাসাতে তের বৎসর প্রিন্সিপাল থাকার পর তিনি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত ও অনুদিত পুস্তকাদির মধ্যে আবু দাউদ শরীফের বাংলা অনুবাদ, অহেতুক পাপ, আদর্শ শিশু পাঠ, রাহবারে হজ্ব, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মোট কথা শরীফ সাহেব নামে ও কামে, আচারে-ব্যবহারে সর্বদিক দিয়েই শরীফ ছিলেন।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

মাদরাসা-ই-আলিয়ার অন্যতম কৃতী ছাত্র ও ৪১ তম প্রিন্সিপাল ডক্টর আবুল কালাম মুহাম্মদ আইয়ুব আলী পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া থানাধিন তেলিখালী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মাদরাসাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভের পর তিনি কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়া হতে ১৯৩৭ সালে টাইটেল মুমতাযুল মুহাদ্দেসীন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। তৎপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন। বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় কলা অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির জন্য

তিনি কালিনারায়ণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। একই বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভের পর তিনি সরকারি খরচে মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং তথায় কিছুদিন অধ্যাপনার কাজ করেন। দেশে ফিরে প্রথমে সরকারি কলেজের প্রভাষক হিসেবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। পুরে সহকারি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করে তিনি রাজশাহী সরকারি মাদরাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্তি হন। ১৯৭৩ সালে তিনি বদলী হয়ে মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ১৯৭৯ সালে পূর্ণ পেনশন নিয়ে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন।

অবরস গ্রহণের পর হতে তিনি ঢাকা শহরের উত্তরা মডেল টাউনে নিজস্ব সম্পত্তিতে বাড়ি নির্মাণ করে তথায় অবস্থান করছিলেন। ১৯৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর ৭৬ বৎসর বয়সে নিজ বাড়িতেই ইন্তেকাল করেন। বনানী গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ড. আইয়ূব আলী আরবী, উর্দূ, ফারসী, বাংলা ও ইংরেজি পাচঁটি ভাষাতেই একজন দক্ষ আলিম ছিলেন। বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নানাবিধ গবেষণা কাজে জড়িত থেকে তিনি ইসলামের প্রচুর খিদমত করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেই তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার প্রিন্সিপাল ও পদাধিকার বলে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিষ্ট্রার থাকাকালীন সময়ে মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৭ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন। তিনি একজন সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুস্তাফীযুর রহমান তাঁর বড় জামাতা।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বরিশালী

মাদরাসা-ই-আলীয়ার অন্যতম কৃতী ছাত্র খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ১৩২৫ সালের ৮ ফাল্গুন মোতাবেক ১৯১৮ সালের ২ মার্চ, সোমবার পিরোজপুর জেলার অধীন কাউখালী উপজেলার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের প্রসিদ্ধ হাজী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাজী খবীরউদ্দীন ও মাতা আকলিমুন্নিসা উভয়েই সৎ ও ধর্মানুরাগী ছিলেন।

গ্রামের মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি শর্ষিনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৩৮ সালে আলিম ও ১৯৪০ সালে ফাযিল পাস করেন। তৎপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪২ সালে আলিয়া মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে কামিল মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী লাভ করেন। অতপর ১৯৪৩-৪৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা মাদরাসা লাইব্রেরীতে কুর'আন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিয়যিত থাকেন।

এ সময়ে তিনি মাওলানা সৈয়দ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তার রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৫ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৪৬-৪৯ সাল পর্যন্ত বরিশাল জেলায় ইসলামী আন্দোলনের ভিত রচনার জন্য 'আলিম সমাজকে সংগঠিত করে তোলেন। অতপর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল এবং ১৯৫৬ সাল হতে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত উক্ত সংগঠনের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, পৃথক নির্বাচন আন্দোলন ও গণঅধিকার পুনর্বহাল আন্দোলন ইত্যাদিতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৪ সালে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর তিনি ১০ মাস কারাবরণ করেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৬ সালে তিনি সমমনা ইসলামী দল সমূহকে নিয়ে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আই.ডি.এল) নামে একটি বৃহত্তর ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলেন এবং ১৯৭৭ সালে উহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। উক্ত সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কাউখালী-ভান্ডারিয়া এলাকা হতে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালে বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি মরহুম মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর-এর সাথে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি মোর্চা গড়ে তুলেন। ১৯৮৪ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উহার প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন।

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ১৯৮৭ সালে ১ অক্টোবর পরলোক গমন করেন। রাজনৈতিক পরিচিতি ছাড়াও লেখক হিসেবে মাওলানা আবদুর রহীম ছিলেন বহুমুখী দীপ্ত প্রতিভার অধিকারী। বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় তাঁর সমভাবে দক্ষতা থাকায় তিনি বিভিন্ন ভাষায় মূল্যবান গ্রন্থ-পুস্তকাদি বাংলায় অনুবাদ করে যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ-পুস্তক রচনা করে ইসলামী চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসারে দেশ ও জাতির জন্য বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন গবেষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, প্রবন্ধ লেকক, অনুবাদক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা, খ্যাতনামা আলিম।

তাঁর দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের কর্ম জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি উহার সবটুকুই সদ্ব্যবহার করেছেন, কখনও সময়ের অপচয় করেননি। তিনি ১৯৫০ সালে বরিশাল হতে প্রথম তানজীম নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা হতে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' প্রকাশ করেন এবং জহুরী ছদ্মনামে এই পত্রিকায় দীর্ঘকাল কষ্টিপাথর শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয় কলাম লেখেন। এছাড়া তিনি কলকাতার 'দৈনিক কৃষক', 'সাপ্তাহিক মীযান', 'মাসিক সওগাত', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'মাসিক সুন্নাত ওয়াল জামাত' এবং ঢাকার 'দৈনিক ও সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ', 'দৈনিক আজাদ', 'দৈনিক পূর্বদেশ', 'দৈনিক সংগ্রাম', 'সাপ্তাহিক নাজাত', 'মাসিক পৃথিবী', 'মাসিক মদীনা', 'মাসিক ঢাকা ডাইজেষ্ট', 'মাসিক তাহজীব', 'মাসিক হিদায়াত', 'ইসলামী একাডেমী পত্রিকা' ও ইসলামীক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, বরিশালের 'সাপ্তাহিক নকীব' ও খুলনার 'সাপ্তাহিক তওহীদ' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হত।

তাঁর রচিত, অনুদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ-পুস্তকাদির একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। কালেমা তাইয়্যেবা।
২। সূরা ফাতেহার তাফসীর।
৩। কুরআন কনিকা।
৪। তাওহীদের তত্ত্বকতা।
৫। হাদীস সংকলনের ইতিহাস।

৬। সুন্নাত ও বিদ'য়াত।

৭। হাদীস শরীফ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।

৮। আল-কুরআনের আলোকে শির্‌ক ও তাওহীদ।

৯। আল্-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ।

১০। আল্লাহর হক বান্দার হক।

১১। আসহাবে কাহাফের কিসসা।

১২। ইসলামী সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা।

১৩। ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা।

১৪। কমিউনিজম ও ইসলাম।

১৫। ইসলামের অর্থনীতি।

১৬। ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

১৭। ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার।

১৮। সমাজতন্ত্র ও ইসলাম।

১৯। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম।

২০। ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন।

২১। ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা।

২২। পরিবার ও পারিবারিক জীবন।

২৩। ইসলামে জিহাদ।

২৪। আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার।

২৫। জাতি ও জাতীয়তাবাদ।

২৬। ইসলামী আইনের উৎস।

২৭। ইসলাম ও দাসপ্রথা।

২৮। আল কুরআনে অর্থনীতি।

২৯। অপরাধ দমনে ইসলাম।

৩০। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ।

৩১। মহাসত্যের সন্ধানে।

৩২। আজকের চিন্তাধারা।

৩৩। বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব।

৩৪। বিজ্ঞান ও জীবন বিধান।

৩৫। পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি।

৩৬। সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস বিজ্ঞান।

৩৭। ইমাম ইব্নে তাইমিয়া।

৩৮। খেলাফতে রাশেদা।

৩৯। উমর ইবনে আবদুল আজীজ।

৪০। রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত।

তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মহাসত্যের সন্ধানে। এর ইংরেজী অনুবাদ ইন কোয়েষ্ট অব ট্রুথ নামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইসলামের অর্থনীতি গ্রন্থের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর বাংলায় অনুদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে-

৪১। ইমাম ইবনুল জওযীর বিখ্যাত আরবী গ্রন্থ তালবীসুল ইবলীস।

৪২। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ।

৪৩। মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদীর উর্দূ তাফসীর তাফহীমূল কুরআন-এর বাংলা অনুবাদ এবং তার অন্যান্য অনেক বই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

৪৪। আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভীর ইসলামে হালাল হারামের বিধান।

৪৫। আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভীর ইসলামের যাকাত বিধান।

৪৬। মিসরীয় সাহিত্যিক সায়্যিদ শহিদ কুতুবের বিংশ শতাব্দির জাহিলিয়াত।

৪৭। ইমাম জাসসাস-এর ঐতিহাসিক তাফসীর আহকামুল কুরআন-এর বাংলা অনুবাদ যা অসমাপ্ত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি রাবেতা আল-আলামে ইসলামীর সদস্য ও ওআইসির ফিক্‌হ একাডেমীতে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি উচ্চস্তরের বক্তাও ছিলেন। তিনি শুধু মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্রই ছিলেন না বরং দেশ ও জাতির কৃতী সন্তান ছিলেন।

মাওলানা আ. ন. ম. আবদুল হালীম

ফেনী জেলার অন্তর্গত 'উলামা বাজার মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত মাওলানা আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুল হালীম মাদরাসা-ই-আলিয়ার একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে ১৯৪৩ সালে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।

দেশে ফিরে শিক্ষকতার কাজে মনোনিবেশ করেন। 'উলামা বাজার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে আজীবন উহার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চস্তরের আলিম এবং সাদাসিধে বুযুর্গ ব্যক্তি। তাঁর অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত ও গুণগ্রাহী এতদঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে।

মাওলানা আবদুল হামিদ এম. এম. এম. এল. এল. বি

তিনি পাবনা জেলার অন্তর্গত সাথিয়া থানার অধীন নাগডেমরা গ্রামের অধিবাসী। ঢাকা আলিয়া মাদরাসা হতে ১৯৪১, ১৯৪৩ ও ১৯৪৫ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল মুহাদ্দিস পরীক্ষা ১ম বিভাগে সুনামের সাথে পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৫০ সালে এম. এ. পাস করেন। অতপর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হন। পরে শিক্ষক হিসেবে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এল. এল. বি. পাস করেন। কলেজের অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি পাবনা সদরে মুসলিম ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার হিসেবে আজীবন কাজ করেন।

তিনি নানাবিধ সমাজ সেবার কাজে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত থেকে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। পাবনা শহরে তাঁর নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি ও অগাধ সম্পত্তি রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মনোনীত ওলামা প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি মুসলিম দেশ সফরের সুযোগ লাভ করেন। তিনি পাবনা আলিয়া মাদরাসা পরিচালনা কমিটিরও নামকরা সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুকাল পরে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং জেলা সদর শহরের গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আলহাজ্ব মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির

শর্ষিনা দারুস্ সুন্নাত আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত শাহ সূফী মাওলানা নেছারুদ্দীন (রহঃ)-এর ছোট জামাতা আলহাজ্জ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঝালকাঠী জেলার সদর থানার অধীন রমানাথপুর গ্রামে ১৯২১ সালের ২৩ জানুয়ারী, মোতাবেক ৯ মাঘ, ১৩২৭ সালে এবং ১৩ জুমাদাল 'উলা, ১৩৩৯ হিজরী, রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল আলী।

তিনি বৃটিশ আমলে সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদরাসা এক্সামিনেশন্স, বেঙ্গল-এর অধীন ১৯৪১ সালে আলিম এবং ১৯৪৩ সালে ফাযিল পাস করেন। এরপর মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতায় টাইটেল অর্থাৎ কামিল হাদীস প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। ১৯৪৫ সালে উক্ত মাদরাসা হতে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী লাভ করেন। তৎপর শর্ষিনার বড় পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন সাহেবের অনুরোধে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শর্ষিনা দারুস্ সুন্নাত আলিয়া মাদরাসা হতে ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয়বার কামিল পাস করেন। এ সময় হতে তিনি তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে সারা বাংলায় সভা সমিতিতে ওয়াজ নসিহত করতে থাকেন ও সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৮ সালে তিনি শর্ষিনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সালের শুরুতে পদোন্নতি লাভ করে দ্বিতীয় মুহাদ্দিস নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারী হতে ১৯৮৯ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদরাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে পড়ালেখা করে তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা বোর্ড হতে আই. এ. এবং ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এ. পাস করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাস করেন এবং প্রিন্সিপাল পদে স্থায়ী হন।

১৯৫৪ সালে প্রথম হজ্জব্রত পালন করেন। এরপর বহুবার উমরা পালন করেন। দীর্ঘ ৪১ বৎসরের কর্মজীবনে তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে দ্বীনী খিদমতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামিক

ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সদস্য ছিলেন, আল বারাকা ব্যাংক লিঃ-এর শরিয়া কাউন্সিলর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশশন-এর জরুরী ফতোয়া ও মাসায়েল প্রকল্পের চেয়ারম্যান ছিলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দীনিয়াত গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা কমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন ।

১৯৮৮ সালে তাঁকে ও. আই. সি-এর ফিক্হ একাডেমীতে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি মননীত করা হয় । তিনি ১৯৮৮ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ও.আই. সি-র ৪র্থ অধিবেশনে এবং কুয়েতে অনুষ্ঠিত ৫ম অধিবেশনে যোগদান করেন । ১৯৯০ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ অধিবেশনে এবং ১৯৯২ সালে তথায় অনুষ্ঠিত ৭ম অধিবেশনে যোগদান করেন । ১৯৯৩ সালে ব্রুনাইতে অনুষ্ঠিত ৮ম অধিবেশনে যোগদান করেন । ১৯৯৪ সালের ১০ এপ্রিল স্ট্রোকজনিত কারণে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ৯ম অধিবেশনে যোগদান করতে পারননি । কিন্তু উক্ত অধিবেশনের জন্য লিখিত প্রবন্ধটি ডাকে পাঠিয়ে দেন । ঐ সকল অধিবেশনে তাঁর পঠিত ও প্রেরিত প্রবন্ধসমূহ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয় । বর্তমানে তিনি অসুস্থ ও অচল অবস্থায় তাঁর নিজ বাড়িতে ১১৯/বি পূর্ব বাসাবো, ঢাকা-১২১৪ ঠিকানায় অবস্থান করতেছেন ।

তিনি ‘দৈনিক আজাদ’, ‘ইত্তেহাদ ও ইনকিলাব’, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, তালীম, নকীব ও অগ্রপথিক এবং মাসিক নওবাহার, সবুজপাতা, আল বালাগ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ও পাক্ষিক তাবলীগ ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন ।

তাঁর রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল-

১ । ইসলামে নারীর মর্যাদা, প্রকাশকাল ১৯৫৭ সাল ।
২ । হাবীবুল ওয়ায়েযীন, প্রকাশকাল ১৯৫৮ সাল ।
৩ । নালায়েন শরীফ, প্রকাশকাল ১৯৬২ সাল ।
৪ । জীবনের আদর্শ, প্রকাশকাল ১৯৬৩ সাল ।
৫ । নারী জীবনের আদর্শ, প্রকাশকাল ১৯৬৩ সাল ।
৬ । নামায শিক্ষা, প্রকাশকাল ১৯৬৩ সাল ।
৭ । বঙ্গানুবাদ-কারীমা, প্রকাশকাল ১৯৬৪ সাল ।

৮। হাকীকাতুল ওয়াসিলা, প্রকাশকাল ১৯৬৪ সাল ।
৯। অশ্রু সরোবর (কাব্য পুস্তক) , প্রকাশকাল ১৯৬৬ সাল ।
১০। বঙ্গানুবাদ-বারো চাঁদের খুৎবা, প্রকাশকাল ১৯৬৭ সাল ।
১১। আউলিয়া কাহিনী, প্রকাশকাল ১৯৭৯ সাল।

তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে একপুত্র অল্প বয়সে মারা গেছেন। অন্য ছেলে-মেয়েরা সবাই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলহাজ্ব মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, এম. এ. ভান্ডারিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন।

মাওলানা আ.ত.ম মুসলেহ উদ্দীন এম.এ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন কলকাতা আলিয়া মাদরাসার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি ফেনী জেলার ফেনী সদর থানার অন্তর্গত উত্তর চারিপুর গ্রামে ১৯২৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরুহুম মৌলভী মমতাযউদ্দীন আহমদ। বর্তমানে তিনি ঢাকা শহরে ৬৭৩ পূর্ব মনিপুর, মীরপুর, ঢাকা-১২১৬ ঠিকানায় নিজ বাড়িতে বসবাস করছেন।

বাল্যাবস্থায় তিনি প্রাথমিক স্তর হতে আলিম স্তর পর্যন্ত স্থানীয় ফেনী আলিয়া মাদরাসায় অধ্যায়ন করে ১৯৪২ সালে ফেনী মাদরাসা হতে প্রথম বিভাগে আলিম পাস করেন এবং কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়ায় ফাযিল ১ম বর্ষে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া হতে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করেন। তৎপর হুগলী মোহসেনিয়া কলেজ হতে ১৯৬৪ সালে আই, এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করে বি. এ. অনার্স ও ১৯৫০ সালে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ড. এম. এ. বারী তাঁর সাথে অনার্স ও এম. এ. তে ২য় স্থান অধিকার করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উর্দূ ও ফার্সীতেও এম. এ. পাস করেছিলেন।

চাকুরী জীবনে তিনি বেসরকারি কলেজে আট বছর অধ্যাপনার পর সরকারি কলেজে ছয় বৎসর সহকারি অধ্যাপক পদে চাকুরী করেন। তারপর তাঁকে ফরেন সার্ভিসের সুবিধাদিসহ বাংলা একাডেমীর সচিব পদে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। সাড়ে তিন বৎসর বাংলা একাডেমীর সচিব পদে চাকুরী করার পর তিনি ১৯৭২ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং পরে সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং পরে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করে আজও অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি আরবী, উর্দু, ফার্সী, বাংলা ও ইংরেজী পাঁচটি ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে দেশী-বিদেশী বহু আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় বহু গবেষনামূলক প্রবন্ধ লিখে থাকেন। বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষের নিয়মিত প্রবন্ধ লেখক। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, আল কুরআনুল কারীম-এর বাংলা তরজমা, ব্যাখ্যা ও টিকা ইত্যাদি মূল্যবান লেখার কাজে জড়িত আছেন।

এতদভিন্ন তিনি ১৯৮৭ সালে ইসলামী শিক্ষা ও অনারবদের আরবী শিক্ষাদান সম্পর্কিত ফেজে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন। ১৯৮৮ সালে করাচীতে আরবী ভাষা কনফারেন্সেও তিনি যোগদান করেন। তিনি একজন নীরব কর্মী ও খাঁটি শিক্ষাবিদ।

প্রফেসর মাওলানা ড. এম. আবদুল্লাহ

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার কৃতী ছাত্রদের অন্যতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ ও ফার্সী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড.এম. আবদুল্লাহ ১৯৩২ সালের পহেলা এপ্রিল লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত বাংগাখাঁ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মৌলভী মুখলিসুর রহমান ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিম। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর লক্ষ্মীপুর দারুল উলূম মাদরাসায় জামাতে পাঞ্জুম পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। উক্ত মাদরাসা হতে জমাতে হাপ্তমের বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি জিলাবোর্ড বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

১৯৪৩ সালে তিনি নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা হতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে আলিম এবং ১৯৪৫ সালে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ফাযিল পাস করেন। তারপর উচ্চ

শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ সালে উক্ত মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ১ম শেণীতে কামিল মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী লাভ করেন। মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পর তিনি ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রাম হাজী মহসিন সরকারি কলেজ হতে ১ম বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করার পর তিনি আই. এ. পাস করেন।

১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উর্দূতে অনার্সসহ ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে বি. এ. অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং কলা অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির জন্য কালিনারায়ণ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরবর্তী বর্ষ ১৯৫৩ সালে উক্ত বিষয়ে ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর তিনি ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যথাক্রমে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে আরো দু'টি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অধ্যাপনাকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতেই ১৯৮১ সালে এম. ফিল. এবং ১৯৮৫ সালে পি এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি সহকারী শিক্ষক হিসেবে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করার পর শিক্ষকতার সর্বস্তরে চাকুরী করার ও শিক্ষাদানের প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দীর্ঘ ১৮ বৎসর বিভিন্ন সরকারি কলেজ ও মাদরাসায় চাকুরী করে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হওয়ার পর তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দূ ও ফার্সীর সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং ১৯৭৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক ও ১৯৮৫ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে শিক্ষকতার সর্বস্তরে নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সাথে অধ্যাপনা করার সুনাম অর্জন করেন। ১৯৯২ সালে পরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১ জুলাই ১৯৯২ সাল হতে অতিরিক্ত দুই বৎসরের জন্য অধ্যাপনার কাজে পুনরায় নিয়োজিত হন।

আরবী, উর্দূ, ফার্সী, বাংলা ও ইংরেজী পাঁচটি ভাষায় একজন সুদক্ষ পণ্ডিত হিসেবে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সাথে বিগত চার দশকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ ও বইপুস্তক রচনা করেছেন যা দেশে-বিদেশে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত ও অনুদিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থ পুস্তকাদির

মধ্যে ২৬টি গ্রন্থ এবং শতাধিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য এবং মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক নামে দু'টি বাংলা গ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু-ফার্সী বিভাগে বি. এ. অনার্স ও এম. এ ক্লাসে এবং নজরুল ইসলাম ও ইকবাল আওর টেগর শীর্ষক দু'টি উর্দূ গ্রন্থ ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত রয়েছে।

তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৬৬ সালে লাহোরের সাইয়ারা পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদ প্রদত্ত নিমান-ই-উর্দু খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। গবষনাক্ষেত্রে অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৮২-৮৩ সালের বিচারপতি ইবরাহীম স্মারক স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিস ঢাকা প্রদত্ত ১৯৯৪ সালের দেওয়ান আবদুল হামিদ সাহিত্য পদক লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি শ্যামলী জহুরী মহল্লায় নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করতেছেন।

মাওলানা সালেম ওয়াহিদী

ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি এবং ঢাকা শহরে সূত্রাপুর এলাকার মুসলিম ম্যারিজ রেজিস্ট্রার কাজী মাওলানা সালেম ওয়াহিদী মাদরাসার কৃতী ছাত্রদের অন্যতম প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি ১৯৩৬ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের নিকট কুরআন মজিদ পাঠ ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৯৪৮ সাল হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মাদরাসা-ই-আলিয়ায় অধ্যয়ন করে আলিম, ফাযিল ও কামিল মুহাদ্দিস পরীক্ষায় পাস করেন।

মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা হতে ১৯৫৫ সালে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী লাভের পর তিনি কিছুদিন লালবাগ আযিযিয়া ইসলামিয়া হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার পর ঢাকা শহরের সূত্রাপুর এলাকায় মুসলিম ম্যারিজ রেজিস্ট্রার ও ক্বাজী নিযুক্ত হন এবং অদ্যাবধি উক্ত পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় প্রচুর জ্ঞান রাখেন। আরবী ভাষায় অনেক বই-পুস্তক রচনা করে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত-

১। আল খুৎবাতুল আসরিয়্যাহ লিল জুমু'আতে ওয়াল ঈ'দাইন
২। খুৎবাতুল মাজালিস
৩। আল মাকামাত
৪। আল আদাবুল আরাবী ফী বাংলাদেশ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আরবী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা থেকে তিনি আরবী অনুষ্ঠান প্রচার করতেন। তিনি ঢাকা কলুটোলা ও নারিন্দার প্রসিদ্ধ পীর মরহুম মাহ আবদুস সালাম-এর বড় জামাতা। তাঁর পিতা মরহুম আবদুল জব্বার ওয়াহিদী বৃটিশ শাসনামলে একজন নামকরা সাংবাদিক ছিলেন এবং কলকাতা হতে প্রাকাশিত আসরেজাদীদ নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বাংলা ১৩৪২ সনের ৭ বৈশাখ মোমেনশাহী জেলার গফরগাঁও থানার চরশাখচুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১৯৫৫ সালে ঢাকা ঢাকা আলিয়া মাদরাসা হতে প্রথম বিভাগে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন এবং ১৯৫৬ সালে মুমতাযুল ফুকাহা ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্র জীবন হতেই তাঁর বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে। টাইটেল পড়ার সময় উর্দূ ভাষায় লিখিত বিশ্ববিখ্যাত বিরাট গ্রন্থ 'আল-ফারুক' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপর তিনি 'মুসলিম যুগে হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থা' 'জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ' 'হায়াতে মাদানী' 'আজাদী সংগ্রাম ১৮৫৭' 'পূর্ব পাকিস্তানে উর্দূ' প্রভৃতি মূল্যবান পুস্তক অনুবাদ এবং রচনা করেন। সাহিত্যিক খ্যাতির ফলেই তিনি বাংলা একাডেমী এবং পাকিস্তান রাইটার্স গীল্ড-এর সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯৫৬ সালে তিনি 'সাপ্তাহিক নেজামে ইসলাম' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা জীবনে প্রবেশ করেন। অতপর ১৯৫৭ সালে 'সাপ্তাহিক আজ'-এর প্রধান সম্পাদক এবং উর্দূ দৈনিক 'পাসবানের' সহাকারী সম্পাদক, ১৯৫৮ সালে একই সঙ্গে 'দৈনিক নাজাতের' সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনায় নিয়োজিত হন। ১৯৬০ সালে ঢাকার ইসলামী একাডেমীর মুখপত্র 'মাসিক দিশারীর' প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ডাইরেক্টর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৬১ সালে তিনি তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'মাসিক মদীনা' প্রকাশ করেন। ধর্ম, সাহিত্য ও তমুদ্দুন বিষয়ক এই উন্নতমানের পত্রিকাটি এখনও মাওলানা মুহিউদ্দীনের সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৬৯ সালে জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর নিজস্ব সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক নয়া যামানা'। উক্ত পত্রিকা দু'টি সারা বিশ্বে বাঙালি মুসলমানদের নিকট বহু প্রশংসিত ও সমাদৃত।

এছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই প্রবীন আলিমের দান অপরিসীম। ছাত্র জীবন হতেই মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ইসলামী আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ কর্মীর ভূমিকা পালন করে আসছেন। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান একজন প্রখ্যাত আলিম, সমাজ কর্মী এবং সাংবাদিক হিসেবে বিশ্ব মুসলিমের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'মুতামারে আলেমে ইসলামীর একজন সদস্য। এই বিশ্ব মুসলিম সংস্থার আমন্ত্রণক্রমে তিনি বহির্বিশ্বের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও যোগদান করেছেন। এতদ্ব্যতীত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান একজন দেশপ্রেমিক ও গরীবের বন্ধু। অসহায়দের দুঃখ-কষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করে থাকেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য-সহায়তা করেন।

সুতারাং মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের ন্যায় একজন কৃতী ছাত্রকে নিয়েও মাদরাসা-ই-আলিয়া গৌরববোধ করতে পারে। ঢাকার বাংলা বাজারে তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী ও প্রকাশনাগার রয়েছে। তাফসীরে মাআ'রিফুল কোরআন-এর বাংলা অনুবাদ তাঁর কৃতিত্ব ও সাধনার বিরাট স্মৃতি বহন করে।

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ১৯৩২ সালে কুমিল্লা জেলার বরুরা উপজেলাস্থ বাগমারা মিয়া বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্জ মৌলভী মোহাম্মদ মিয়া সাহেব একজন সূফী সাধক, অত্যন্ত বড় আবিদ, পরহিজগার, দানশীল ও সমাজসেবী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন স্থানীয় রহমতগঞ্জ মাদরাসায়। ১৯৫৫ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা হতে কামিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি ৫ম স্থান অধিকার করেন। সরকারি বৃত্তি পেয়ে

পরবর্তী দুই বৎসর উক্ত মাদাসায় তিনি হাদীস শাস্ত্রে গবেষণা করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি দেশ-বিদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে প্রথম হজ্জ সম্পন্ন করেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রেরিত উলামা ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালায়েশিয়ায় সফর করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে ৪০ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরাআনের অবদান শীর্ষক গ্রন্থখানির জন্য তিনি তিনটি জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

বাংলা ভাষায় তিনি তাফসীরে নূরুল কোরআন শীর্ষক মৌলিক ও বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এর ১৯তম খণ্ড পর্যন্ত ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

এই পাণ্ডুলিপি রচনার সময় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতীব, মাসিক 'আল বালাগ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠতা-সম্পাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব গভার্নেসে'র সদস্য, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন একাডেমিক কমিটির সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গ্রন্থ রিভিয়্যু কমিটির চেয়ারম্যান, আল বারাকা ব্যাংক লিঃ-এর শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, আল-নাহিয়ান ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ এবং ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক, সিলেকশন কমিটির সদস্যসহ বহু মাদরাসা, মসজিদ ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন। তিনি ঢাকা রেডিওতে নিয়মিত পবিত্র কুর'আনের তাফসীর বর্ণনা করেন। তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচারের কর্মসূচী নিয়ে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেছেন। ইসলামের সেবায় নিবেদিত বিশ্বের যে তেরজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে (১৪১৩ হি.) বারই রবিউল আউয়াল উপলক্ষে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক স্বর্ণপদক (ফার্ষ্ট গ্রেড) প্রদান করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর মৌলিক রচনার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কারে (১৯৮৯) সম্মানিত হয়েছেন।

মাওলানা হাকীম হাফেয আযীযুল ইসলাম

মাওলানা হাকীম হাফেয আযীযুল ইসলাম ১৯৩৫ সালের ২৫ জুন (১৩৫৩ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের চিনাইর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে ঢাকাতেই তিনি লালিত পালিত হন। তাঁর পিতা প্রিন্সিপাল হাকীম খোরশেদুল ইসলাম ছিলেন মরহুম-শেফাউল মূলক হাকীম হাবিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী এবং ঢাকা তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজের প্রথমে অধ্যাপক পরে মৃত্যুকাল অবধি অধ্যক্ষ। হাকীম হাফেয আযীযুল ইসলাম মাত্র ১১ বৎসর বয়সে পবিত্র কুর'আন হিফয সম্পন্ন করেন।

মাওলানা আবদুল আহাদ কাসেমীর নিকট তিন বছর প্রাইভেট শিক্ষা লাভ করে তিনি ১৯৪৯ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে আলিম, ১৯৫১ সালে কিশোরগঞ্জের হয়বতনগর সিনিয়র মাদরাসা হতে ফাযিল এবং ১৯৫৩ সাল মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা হতে প্রথম বিভাগে কামিল (হাদীস) পাস করেন। ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পর ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যুজনিত কারণে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে পারেননি। পরে ১৯৫৯ সালে ঢাকা তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ থেকে রেকর্ড নম্বরে প্রথম হয়ে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে 'হাকীমে হাযেক' সনদ লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি ১৯৫২-৫৩ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাক জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সাধারন সম্পাদক ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯৬৫ সাল হতে তৎকালীন পাকিস্তান ভিত্তিক ও বর্তমান বাংলাদেশ ভিত্তিক সরকারি ইউনানী আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সদস্য হিসেবে দীর্ঘ পচিঁশ বৎসর সক্রিয়ভাবে কাজ করার পর তিনি ১৯৯০ সালে সরকার কর্তৃক উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হয়ে নিযুক্ত অবস্থায় ২০০5 সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এছাড়া তিনি হামদর্দ ট্রাস্টী বোর্ড ও হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অন্যতম সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক নাজাত ও মাসিক আল-হাকীম এর সম্পাদক এবং বর্তমানে ইউনানী আয়ুর্বেদিক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক স্বাস্থ্য সাময়িকীর প্রধান

সম্পাদক। তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রকল্প, প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রায় সাত বৎসর ঢাকাস্থ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবৈতনিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারি ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটিতে তিনি ইউনানী শাস্ত্রের প্রতিনিধি সদস্য। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মূলারীর প্রণয়ন ও প্রকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সদস্য এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ছিলেন।

হাকীম আযীযুল ইসলাম স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক বহু আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, অষ্ট্রেলিয়া, সিংগাপুর, কুয়েত, সৌদি আরব, নেপাল, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইত্যাদি দেশ সফর করেছেন।

তিনি ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক চারটি গ্রন্থসহ ইতিমধ্যে প্রকাশিত দশটি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে *ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি*, সংক্ষিপ্ত ইউনানী চিকিৎসার মুলতত্ত্ব, ইউনানী ভেষজ বিজ্ঞানের মূলনীতি সহজ হাকীমী শিক্ষা, নিয়া'মুল ফোরকান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী, উম্মহাতুল মু'মিনীন প্রভৃতি।

প্রফেসর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রকিব

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রকিব ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সেরাশানী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৭ সালের ১ মে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৪৯ সাল হতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়ায় অধ্যয়ন করে আলিম, ফাযিল ও কামিল মুহাদ্দিস পরীক্ষাসমূহে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। তৎপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. অনার্স ও এম. এ. পাস করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক বি. সি. এস. শিক্ষা সার্ভিসের জন্য

নির্বাচিত হয়ে সরকারি কলেজে আরবীর প্রভাষক হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। পরে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি কিছুকাল সিনিয়র স্পেসালিষ্ট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা , ডিরেক্টর, রিসার্চ ও প্রজেক্ট ডিরেক্টর, আই টি, প্রজেক্ট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা এবং বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে প্রেষণে নিয়োজিত থাকার পর তাঁকে ভাওয়াল বদরেআলম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ করা হয়। এই কলেজে একজন সফল অধ্যক্ষ হিসেবে প্রায় চার বৎসর দায়িত্ব পালনের পর তাঁকে সর্বশেষ কার্যস্থল সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকায় অধ্যক্ষ পদে বদলী করা হয় এবং সেখান হতে ৩০ বৎসর চাকুরী জীবন পূর্ণ করে নিয়মিত অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মাওলানা আবদুর রকিবের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন *পত্র-পত্রিকায় প্রায় শতাধিক প্রবন্ধের লেখক, 'মানবতা ও আল ইমামত'* পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, ১৯৬১ সাল হতে বাংলাদেশ বেতার ও ১৯৬৭ সাল হতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন খ্যাতনামা উপস্থাপক হিসেবে সর্বত্র সুপরিচিত। তিনি হোমিও কলেজ হতে বি. ইউ. এম. এস সনদপ্রাপ্ত একজন সফল রেজিষ্ট্রার্ড ডাক্তার। গরীবের সেবায় অবসর সময় হোমিও চিকিৎসায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

হোমিও চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর হোমিওপ্যাথিক ফ্যামিলি প্রাকটিস ও পারিবারিক চিকিৎসা নামে দুইটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। সে কারণে তিনি হোমিও ডিগ্রী কলেজ, ঢাকার প্লানিং কমিশনের সদস্য এবং রাজশাহী হোমিও মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিং বডিরও একজন সদস্য। সপ্তদশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে অবদান রাখার জন্য সরকার কর্তৃক তিনি পুরুস্কৃত হয়েছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সরকারি কলেজ শিক্ষক হিসেবেও শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক পুরুস্কৃত হন। তিনি বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবী ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শী। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোথাও সভাপতি, কোথাও উপদেষ্টা আবার কোথাও সদস্য হিসেবে জড়িত রয়েছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে মাওলানা এম.এ. রকিব একজন জ্ঞানী, গুণী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সহকর্মীবৃন্দ

শামসুল উলামা কামাল উদ্দীন আহমদ

জনাব কামাল উদ্দীন কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে জামাতে উলা পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ. পাস করেন এবং চট্টগ্রাম মাদরাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। অতপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিলাত গমন করেন।

বিলাত হতে ফিরে এসে তিনি ১৯২৭ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। তিনিই ছিলেন উক্ত মাদরাসার প্রথম বাঙ্গালি মুসলামান প্রিন্সিপাল। কলকাতা আলিয়া মাদরাসার পত্তন হতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই প্রায় দেড়শত বৎসর মাদরাসা-ই-আলিয়ার প্রিন্সিপাল পদে একমাত্র ইংরেজগণই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

খান বাহাদুর শামসুল উলামা ডক্টর হেদায়েত হোসাইন

খান বাহাদুর শামসুল উলামা ডক্টর হেদায়েত হোসাইন শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন (রহঃ)-এর সুযোগ্য পুত্র। তিনি ১৮৮৭ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদরাসা-ই-আলীয়া হতে জামাতে উলা পাস করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতপর প্রেসিডেন্সি কলেজে সিনিয়র প্রফেসর নিযুক্ত হন এবং তথা হতে ১৯২৮ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়ার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং অতি দক্ষতার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে ১৯৩৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন সদস্য ছিলেন। উক্ত সোসাইটির পুস্তকাদি তাঁর সংশোধনের পর প্রকাশিত হত। ১৯৪৩ সালে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শামসুল উলামা খান বাহাদুর মুহাম্মদ মূসা

তিনি পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গায় ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুজতবা আহমদ। স্থানীয় পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তৎকালীন প্রাচীন বৃদ্ধ মাওলানা রইসুদ্দীনের নিকট কাফিয়া পর্যন্ত প্রাথমিক আরবী শিক্ষা করেন। ১৮৯৭

সালে কলকাতায় এসে শামসুল উলামা মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ধমানী, মাওলানা মুহাম্মদ ইরফান প্রমুখের নিকট প্রাইভেটভাবে কিছু আরবী ও ইংরেজী শিক্ষা লাভের পর ১৮৯৮ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া, কলকাতায় জমাতে চাহারমে ভর্তি হন। দুই বৎসর খুব ভালভাবে সুনামের সাথে লেখাপড়া করার পর তৃতীয় বর্ষে বসন্ত রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। এই সমসয়ে তাঁর পিতা তাঁকে দেখার জন্য কলকাতা আসেন এবং তিনি নিজেও বসন্তে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন।

তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে পড়ালেখায় আত্মনিয়োগ করে ১৯০২ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া হতে জমাতে উলা পাস করে মাদরাসার ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯০৫ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। প্রাইভেট টিউশনি দ্বারা অর্থ উপার্জন করে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করে আই.এ.তে ভর্তি হন। এই সময়ে হুগলী কলেজে প্রভাষকের অস্থায়ী চাকুরী পেয়ে তথায় চলে যান এবং সেখান হতে ১৯০৮ সালে আই. এ. পাস করেন। আর্থিক অনটনের জন্য বাধ্য হয়ে কলকাতার জুবিলী স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী নিয়ে প্রেসিডেন্ট কলেজে বি.এ-তে ভর্তি হন। একদিন শামসুল উলামা আবূ নসর ওয়াহিদি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাঁকে ঢাকা মুহসিনিয়া মাদরাসায় চাকুরী দিয়ে ঢাকাতে নিয়ে আসেন।

এখানে চাকুরীরত অবস্থায় ১৯১০ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি.এ. পাসের পরেই গৌহাটী কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সেখান হতে হুগলী কলেজের সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হয়ে হুগলী পৌঁছেন আর একাধারে এগার বৎসর সেখানে চাকুরী করেন। ইতিমধ্যে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এম.এ. পাস করেন। সেখান থেকে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে পদোন্নতি পেয়ে ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হয়ে ঢাকা আসেন। এখান থেকে ১৯৩৪ সালে কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়ার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে তিনি তৃতীয় প্রিন্সিপাল হিসেবে খুব সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে দীর্ঘ সাত বৎসর প্রিন্সিপাল ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব সম্পাদন করে ১৯৪১ সালের ২ জানুয়ারী চাকুরী হতে পেনশন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। পেনশন নিয়ে তাঁর নিজ বাড়ি বাঁকুড়ায় যাওয়ার পর দেশ

বিভাগের সময় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় তাঁর বাড়িঘর পুড়ে যায় আর তিনি অসহায় অবস্থায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় হিজরত করে গেন্ডারিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিহারা ও পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮০-এর দশকে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও কলকাতায় প্রিন্সিপাল থাকাকালীন তিনি অনেক কিতাবাদি রচনা করেছিলেন।

আরবী ভাষায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আরবীতে তিন হাজারেরও অধিক কবিতা রচনা করেছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর শামসুল উলামা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন যার জন্য তিনি মাসিক একশত টাকা হারে সম্মানী পেতেন। তাঁর সমাজ সেবা কাজের জন্য খান বাহাদুর উপাধিতেও তিনি ভূষিত হন।

আলহাজ্ব খান বাহাদুর মৌলভী মুহাম্মদ ইউসূফ এম. এ.

খান বাহাদুর মুহাম্মদ ইউসূফ ১৮৮৭ সালে শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি ভাষায় এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯১৬ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার ইংরেজি বিভাগে হেড মাষ্টারের পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ ২৯ বৎসর তিনি মাদরাসা স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। এই ২৯ বৎসরের মধ্যে তিনি কখনও অসুস্থ হয়ে ছুটি গ্রহণ করেননি। তিনি বহুদিন যাবত প্রসিদ্ধ কলেজ ছাত্রাবাস বেকার হোষ্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন।

তাঁর এই অটুট স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একদা জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি পানাহারে হাদীস শরীফের অনুসরণ করে চলি। অর্থাৎ ভোজনের সময় এক-চতুর্থাংশ পেট খালি রেখে আহার করি। স্কুলের ছাত্রগণ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করত।

শেষ বয়সে ১৯৪১ সালে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়ার অস্থায়ী প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হন এবং ১৯৪৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মাদরাসা-ই-আলিয়ার চতুর্থ মুসলামান প্রিন্সিপাল।

আলহাজ খান বাহাদুর মৌলভী মুহম্মদ জিয়াউল হক

জনাব জিয়াউল হক এম. এ ছিলেন কলকাতা আলিয়া মাদরাসার পঞ্চম মুসলমান প্রিন্সিপাল। তিনি সাবেক নোয়াখালীর সন্দ্বীপে ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় বশিরিয়া আহমদিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতপর চট্টগ্রাম মুহসেনিয়া সরকারি মাদরাসা হতে জামাতে উলা পাস করেন। অতপর ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯১৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৩ সালে আরবীতে এম.এ. ও ১৯২৪ সালে ফার্সীতে এম. এম ডিগ্রী লাভ করেন।

প্রথমত তিনি ফেনী বেরসাকারি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯২৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে তিনি রাজশাহী সরকারি মাদরাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং ১৯৪১ সালে তিনি তিনি হুগলী ইন্টারমেডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল পদে যোগদান করেন।

১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হয়ে দীর্ঘ ১২ বৎসর যাবত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান কায়েম হয়, তখন তাঁর তত্ত্বাবধানেই মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতা হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।

কলকাতা হতে মাদরাসা-ই-আলিয়ার জিনিসপত্র, টেবিল-চেয়ার পাখা এবং লাইব্রেরীর ২৯ হাজার কেতাবপত্র ইত্যাদি ঢাকা প্রেরণের দায়িত্ব পালনে তিনি যে কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাসে তা একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে। সরকারি অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট এমন সুষ্ঠুভাবে নিজ প্রাপ্যাদি বুঝে নিয়ে কলকাতা হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হতে পারেনি।

তাঁর চেষ্টাতেই মাদরাসা-ই-আলিয়ার ক্বিরআত ও তাজবীদ শাখা মঞ্জুরি লাভ করে। ইংরেজিতে তিনি Rehetoric and Prosody নামক একখানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। আরবীতেও তাঁর সংকলিত কয়েকখানা কিতাব রয়েছে।

তিনি কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং নিজে কথা কম বলতেন। অন্যকে নিজের মতে টেনে আনা তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি গোপনে বহু দান করে গেছেন। অনেক গরীব ছাত্রকে তিনি সাহায্য করতেন।

তিনি ১৯৫৪ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা হতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনঃস্থাপিত হয় এবং তিনি এখানেও প্রথম রেজিস্ট্রার ও নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ সালে এই মহা মনীষী ইহলোক ত্যাগ করেন। জীবিতাবস্থায় তিনি ঢাকা আজিমপুর গোরস্থানে কবরের জায়গা খরিদ করে রেখেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁকে তথায় সমাহিত করা হয়। তাঁর স্ত্রীকেও তাঁর পাশেই কবরস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান।

শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন

মাওলানা বেলায়েত হোসাইন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলাস্থ লাভপুর থানার সাউগ্রামে ১৮৮৭ সালে এক প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমান জেলার মঙ্গলকোট নিবাসী খ্যাতনামা আলিম মাওলানা মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। উপযুক্ত ও দক্ষ আলিমের সংশ্রবে থেকে তিনি যে সুশিক্ষার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, কালে উহাই তাঁকে উচ্চ শিক্ষার শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছিল।

কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন যে, আমি বাল্যকালে কাফিয়া ও শাফিয়া নামক কিতাবদ্বয় মুখস্থ করেছিলাম। বর্ধমানের মঙ্গলকোটে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ঢাকা মুহসেনিয়া সরকারি মাদরাসার হেড মৌলভী মাওলানা ফজলুল করীম বর্ধমানীর নিকট তিনি প্রাইভেট ভাবে কিছু লেখাপড়া করেন এবং ১৯০৭ সালে তিনি ঢাকা সরকারি মুহসেনীয়া মাদরাসায় ফাযিলে ভর্তি হন। ১৯০৯ সালে তথা হতে জামাতে উলা পাস করে হিন্দুস্থান চলে যান। তথায় রামপুর ও দেওবন্দ মাদরাসাদ্বয় হতে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্তির সনদ লাভ করেন। হিন্দুস্থানে তিনি যেসব উস্তাদের নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুল উলামা মাওলানা মুনাওয়ার আলী রামপুরী, মাওলানা আবদুল আজিজ আম্বেটী এবং মাওলানা ফজলুল হক রামপুরী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি তিনি রামপুরে তৎকালীন খ্যাতিমান আলিম মাওলানা শেখ মুহাম্মদ তাইয়্যেব আরব মক্কী (রহঃ)-এর খিদমতে থেকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করেন।

১৯১৩ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকা সরকারি মুহসেনিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল তিনি চট্টগ্রাম সরকারি মাদরাসায়ও অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ সালে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়ার সিনিয়ার শিক্ষক পদে যোগদান করেন। অতপর ১৯৪২ সালে তিনি নিজ যোগ্যতাবলে মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতার হেড মৌলভী পদে উন্নীত হন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল দক্ষতার সাথে এই হেড মৌলভী পদের দায়িত্ব পালন করে ১৯৪৭ সালে ১৬ জুন অর্থাৎ স্বাধীনতার মাত্র দুই মাস পূর্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর থেকে তিনি ঢাকা শহরে বংশালে অবস্থিত নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করেন। অবসর গ্রহণের পর হতে সাত বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

১৯২৬ সাল হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর মাওলানা সাহেবের সাথে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর বিভিন্ন দিকে এবং বিভিন্ন প্রকারের সংস্রব ছিল। শিক্ষা বিভাগে দীর্ঘদিন তাঁর সাথে জড়িত থাকায় তাঁর গুণ-জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের গভীরতার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছিলেন। আরবী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য বিদ্যমান ছিল। আরবী গদ্য-পদ্য এবং কাব্য রচনায় তিনি যুগশ্রেষ্ঠ সিদ্ধহস্ত বলে আলিম সমাজে পরিচিত ছিলেন।

সহীহ হাদীসের একটি বিশেষ ঘটনার উপর রচিত তাঁর বাতাকা নামক আরবী কাব্যটি আলিম সমাজে অতি সমাদৃত। উক্ত কবিতাটি দুই খণ্ডে দুটি পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ইহা ছাড়া উর্দূ ও ফার্সী ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট দখল রয়েছে। মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাদীস, তাফসীর ও আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত থাকত।

আল্লাহ পাক তাঁর অসাধারণ লেখনী শক্তি দান করেছেন। আরবী ভাষার সকল বিষয়ের কিতাবের উপর তাঁর পূর্ণ ব্যুৎপত্তি রয়েছে। তাঁকে আরবী বিশ্বকোষ বলে আখ্যায়িত করলেও অত্যুক্তি হবে না।

তিনি ৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে ৯৭ বৎসর বয়সে ৫১, মুকিম বাজার ঢাকায় তাঁর নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। বংশালের আহলে হাদীস মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ১৯২৩ সালে তিনি শামসুল উলামা উপাধী লাভ করেন। তখন হতে ইন্তেকালের

আগ পর্যন্ত ৬১ বৎসর প্রতি মাসে একশত টাকা হারে উক্ত উপাধির সম্মানী ভোগ করছিলেন। ইহা আল্লাহ পাকের একটি অতিরিক্ত দান বলে তিনি সব সময় খেয়াল রাখতেন ও শোকর আদায় করতেন। সর্বশেষ শামসুল উলামা উপাধির ব্যক্তিত্ব হিসেবে অত্র উপমহাদেশে তাঁর মর্যাদাও ছিল সবার উপরে। ঢাকা শহরের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের ভিত্তিপ্রস্তর তিনিই স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

মাওলানা মুহম্মদ শফী হুজ্জাতুল্লাহ আনসারী ফেরেঙ্গী মহল্লী

মাওলানা মুহাম্মদ শফী হুজ্জাতুল্লাহ আনসারী লক্ষ্ণৌ শহরের ফেরেঙ্গী মহলের প্রসিদ্ধ মোল্লা নিজামউদ্দীনের বংশধর। এই মোল্লা নিজামউদ্দীন দরসে নিজামীর প্রবর্তক ছিলেন। মাওলানা আবদুল আলী 'বাহারুল উলূম' ও মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী প্রমুখ বিখ্যাত আলিমও এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মাওলানা শফী (রহঃ) ১৮৯৯ সালের ২২ জুন লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা সালামতউল্লাহ ফেরেঙ্গী মহল্লী। মাওলানা শফী বাল্যকালেই কুর'আন মজীদ হিফ্য করেন এবং দরসে নিজামীর শেষ পরীক্ষায় সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতপর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে মোল্লা ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি মাদরাসা নিজামীয়াতে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং দক্ষতার সাথে শিক্ষাদান করতে থাকেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিয়াতের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। আলীগড় হতে অবসর গ্রহণ করে তিনি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯২২ সালে ২২ নভেম্বর সরকার বিরোধী এক বক্তৃতা দানের কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং এক বৎসর কাল তাঁকে বাহারামপুর জেলে আটক রাখা হয়। জেলখানা হতে মুক্তিলাভ করে পুণরায় তিনি নিজামীয়া মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। অতপর ১৯৪৬ সালে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়ার এডিশনাল হেড মৌলভী পদে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং তিনিও ঢাকায় চলে আসেন। এ সময়ে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়ার অস্থায়ী হেড মৌলভী পদে কাজ করেন। অতপর ১৯৫৬ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ ৭০ বৎসর বয়সও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে অতি দক্ষতার পরিচয় দান করেন। তাঁর প্রণীত শরহে মুকাদ্দামায়ে মিশকাত গ্রন্থখানা আলিম সমাজে অত্যাধিক সমাদৃত। এই মহান পণ্ডিত মোল্লা নিজামউদ্দীনের বংশের শেষ নিদর্শন। আলিম সমাজে তাঁর মান অতি উচ্চে।

মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী থানবী

মাওলানা জাফর আহম উসমানী হলেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর ভাগিনা। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষাও মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত হয়েছিল। তিনি ১৩১০ হিজরী সনের ১৩ রবিউল আউয়াল দেওবন্দের উসমানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। খানকায়ে এমদাদিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন।

প্রথমত তিনি কুরআন পাক পাঠ শেষ করেন। তারপর আরবী প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। জনৈক আলিম হাফিয দ্বারা তাঁর কুরআন পাকের কালবাচক শব্দগুলি মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হয়। যখন তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী হলেন, তখন হাদীস শরীফ শিক্ষার জন্য তাঁকে মুহাদ্দিস মাওলানা হাফিয মুহম্মদ ইসহাক বর্ধমানীর নিকট সোপর্দ করা হয়। মাওলানা ইসহাক তখন কানপুর জামেউল উলূম মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস নিযুক্ত ছিলেন। সাহারানপুর মাযহারুল উলূম মাদরাসায় হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট বুখারী শরীফ পাঠ শেষ করে ১৩২৮ হিজরীতে সনদ গ্রহণ করেন।

মোটকথা, মাওলনা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রেখে গড়ে তুলে ছিলেন। তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে ছয় মাসের মধ্যে কুরআন শরীফ হিফয করেন। অতপর তাঁকে থানা ভবন খানকাতে রেখে গ্রন্থ প্রণয়ন ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত রাখা হয়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। মাওলানা উসমানী সাহেবের প্রচেষ্টাতেই ফতুয়ায়ে এমদাদীয়া গ্রন্থখানা বড় বড় ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনিই লাউসসুনান নামক গ্রন্থখানা ২০ খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থখানা মাওলানা উসমানীর অমর কীর্তি।

মাওলানা থানবী (রহঃ) যেসমস্ত অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন তার প্রায় সকল গ্রন্থেই মাওলানা উসমানীর যথেষ্ট দান রয়েছে। কিছুকাল তিনি সাহারানপুর বিখ্যাত মাযাহিরে উলূম মাদরাসায়ও শিক্ষাদান করেছিলেন। ১৯৩৮ হতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিয়াত বিভাগে অধ্যাপনার কাজ করেন। অতপর ১৯৪৮ সালে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার হেড মৌলভী নিযুক্ত হন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৫৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

অতপর তিনি সিন্ধু প্রদেশের টেন্ডারলাইয়ার দারুল উলূম মাদরাসার শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন। সেখানেই তিনি ১৩৯৪ হিজরী সনের শেষ প্রান্তে যিলক্বদ মাসে করাচিতে ৮৪ বৎসর বয়সে মোতাবেক ১৯৭৪ সালে ইন্তেকাল করেন এবং মাদরাসার পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মাওলানা উসমানী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর নিকট হতে ইলমে মা'রিফতের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইলমে জাহিরী ও বাতিনীতে দেওবন্দের প্রসিদ্ধ আলিমদের শীর্ষস্থানীয় বলে পরিগণিত। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি ছিলেন। তখন শায়খুল হাদীস মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি ছিলেন। আমল-আখলাকে মাওলানা উসমানী একজন ফেরেশতা সদৃশ আলিম ছিলেন। পাকিস্তানের সর্বত্র এবং বাংলাদেশেও তাঁর অগণিত ভক্ত ও অনুরক্ত ছাত্র রয়েছে।

কলকাতায় কর্মরত থাকাকালে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) কয়েকবার হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অপরদিকে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকাতে কর্মরত অবস্থায় দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর মাওলানা জাফর আহমদ উসমানীর সহকর্মী হওয়ারও সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ও মাওলনা জাফর আহমদ উসমানী উভয়ের দৈহিক আকার আকৃতিতে যেমন সাদৃশ্য ছিল তেমনি সাদৃশ্য ছিল কুরআন পাক তিলাওয়াতেও। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

আল্লামা আবদুর রহমান আল্ কাশগরী

আল্লামা আবদুর রহমান আল কাশগরী (রহঃ) যিনি তুর্কিস্থানের রাজধানী কাশগর শহরে ১৯১২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় স্থানীয় আলিমদের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার সময় হিন্দুস্থানী আলিমদের প্রশংসা শুনে বিদ্যা অর্জনের জন্য হিন্দুস্থানে আসার আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায় আর এগার বৎসর বয়সেই পদব্রজে হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ অভিমুখে রওয়ানা হন। সীমান্তের বরফ ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চল অন্যান্য যাত্রীর সাথে বহুকষ্টে অতিক্রম করে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে দোখানে পৌছেন। বরফ বৃষ্টির জন্য সামনে এগুতে না পেরে তাঁদের কাফেলা দুইমাস পর্যন্ত দোখানে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। বরফ পড়া বন্ধ হলে পুণরায় রওয়ানা করলে ফয়জাবাদ এলাকার বারেক নামক স্থানে পৌঁছেন। এখানে ছয়মাস আটকে পড়ে থাকার পর জেবাক হয়ে চিত্রাল পৌঁছেন। এ সকল অঞ্চলে পায়ে হাঁটা ছাড়া কোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিলনা। চিত্রালের শাসনকর্তার সাহায্য ও সহানুভূতিতে নুদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্মৌ-এর প্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের সন্নিধ্য লাভ করেন।

১৯২২ সালে হতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত উক্ত মাদরাসায় দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেন। এবং ১৯৩১ সালে শিক্ষা সমাপ্তির সনদ লাভ করে দারুণ নুদওয়ার শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেই সময়ে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফাযিল আদব ডিগ্রী লাভ করেন এবং ফোরকানিয়া মাদরাসা হতেও সপ্ত ক্বিরআতের সনদ অর্জন করেন।

১৯২৮ সালে ২২ এপ্রিল তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতায় ফিক্হ শাস্ত্রের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনিও ঢাকাতে আসেন এবং ১৯৫৬ সালে প্রভাষকের পদ হতে পদোন্নতি লাভ করে এডিশনাল হেড মাওলানার পদে উন্নীত হন।

১৯৬৯ সালে মাওলানা মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহসান সাহেবের অবসর গ্রহণের পর থেকে তিনি হেড মাওলানা নিযুক্ত হন। অল্প কিছুদিন হেড মাওলানার দায়িত্ব পালনের পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি চির কুমার ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর গেন্ডারিয়ায়

নিজের খরিদকৃত বাড়িতে পৌঁছে ১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কার্ফিউ-এর ভিতর তিনি ইন্তেকাল করেন। কার্ফিউ-এর পাস নিয়া কিছু শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরের আজিমপুর নূতন গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মাযারে স্থাপিত শিলালিপিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি ঢাকায় পৌঁছার পর থেকে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত মাদরাসা-ই-আলিয়া ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

আরবী সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবী ও উর্দূতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। মাদরাসা-ই-আলিয়া ছাত্রাবাস বখশীবাজারে ও প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার এলাকায় যাবতীয় নারিকেল ও আমগাছ তিনিই রোপণ করেছিলেন, যা আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে। তিনি অনেক কিতাবপত্র আরবী ও উর্দূতে রচনা করেছিলেন। তম্মধ্যে আল মুফীদ নামক আরবী-বাংলা আধুনিক অভিধান প্রকাশিত এবং শিক্ষিত সমাজে অধিক সমাদৃত।

শায়খুল হাদীস মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন সিলেটী

মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্র ও সিলেট জেলার কৃতী সন্তান শায়খুল হাদীস মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মৌলভী আশরাফ আলী ইবনে ফজলে আলী ১৮৯০ সালে সিলেট জৈন্তাপুরের অন্তর্গত নিজপাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মের দুই সপ্তাহ পরেই তাঁর মাতা মারা যান। আট বছর বয়সে পিতাও ইন্তেকাল করেন। অনাথ ইয়াতীম অবস্থায় জালালপুর ও ঝিঙ্গাবাড়ি আলিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে আসাম বোর্ডের বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সুহৃদ উস্তাদগণের পরামর্শ ও সহায়তায় ১৯১২ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতায় ভর্তি হন।

বৃত্তিধারী ছাত্র হিসেবে একাধারে সাত বৎসর মনোযোগের সাথে লেখাপড়া করে ১৯১৯ সালে ফখরুল মুহাদ্দেসীন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্র জীবনের শুরু থেকে তিনি যেহেতু একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন সেহেতু তৎকালীন ইংরেজ প্রিন্সিপাল স্যার আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লি তাঁকে শেষ পরীক্ষা

পাসের পর মাদরাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষক নিয়োগ করতে মনস্থ করেছিলেন। সেমতে ১৯১৯ সালের ২৬ জুলাই তাঁর ফখরুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাথে সাথেই তাঁকে মাদরাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন। অত্যন্ত দক্ষতা ও কৃতকার্যতার সাথে দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের পর তিনি হাদীস শাস্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৪৪ সালে আসাম সরকার তাঁকে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ করেন। হাদীস শাস্ত্রবিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতি এতই অধিক ছিল যে, তাঁকে শায়খুল হাদীস বলা হতো এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও তাঁকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করে ‘ইলমে দ্বীনের খিদমত করার অধিক সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সেমতে তিনি ১৯৫৪ সালে ৬৪ বৎসর বয়সে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। সিলেটে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থল জিন্দাবাজারে নিজ বসতবাড়ি স্থাপন করেছিলেন। উক্ত বাড়িতে অবসর জীবন কাটিয়ে ১৯৭২ সালের ৬ মার্চ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর সমাধিস্থলের পাহাড়ে তাঁকে দাফন করা হয়।

তিনি হাদীস, তাফসীর, ইলমে ফিক্হ ও ইসলামের ইতিহাসের অদ্বিতীয় আলিম ছিলেন। হাদীসের আসমায়ে রিজাল সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল সুগভীর। পাঠ্যজীবন হতে তিনি অসাধারণ অধ্যাবসায়ী ছিলেন। মাদরাসা-ই-আলিয়া লাইব্রেরীর অসংখ্য গ্রন্থ তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছিলেন। তাঁর স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিল, যে কোন বিষয় একবার পাঠ করলে উহার বিষয়বস্তুসমূহ তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। তাঁর একটি ব্যাক্তিগত বিরাট লাইব্রেরী ছিল। উহাতে তিনি বহু মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। কলকাতা মাদরাসা হতে সিলেটে বদলরি সময় তাঁর লাইব্ররীর বই-পুস্তকের ওজন হয়েছিল ছয় শত মন। পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর নিকট হতে ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের দৃস্প্রাপ্য গ্রন্থ-পুস্তকাদি খরিদ করে নিয়েছিল।

মাদরাসা-ই-আলিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরী ছাড়াও কলকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী ও এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীর প্রায় সমস্ত কিতাব পত্রের বিষয়বস্তু ও ক্যাটালগ তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।

এক কথায় তাঁকে আরবী ও ইসলামী বিদ্যার একটি জীবন্ত লাইব্রেরী ও বিশ্বকোষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর অন্তিমকালে নিজস্ব লাইব্রেরীর অনেক মুল্যবান গ্রন্থাবলী সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা লাইব্রেরীতে দান করে গেছেন। আর কিছু কিতাব বিভিন্ন মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট বিক্রয় করে দিয়েছিলেন।

আরবী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় অনেক বই-পুস্তক তিনি নিজেও রচনা করেছিলেন। তম্মধ্যে মাত্র তিনটি বই তিন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বাকি সব পাণ্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিত রয়েছে। প্রকাশিত বই তিনটির নাম-

১. কুরআন তত্ত্ব
২. হাশিয়ায়ে মুসতাৎরিফ
৩. হাশিয়ায়ে মানতিকুত্তাইন।

আর পান্ডুলিপি আকারে রচিত কিতাবাদির নাম-

১. শরহে তিরমিযী ১ম খন্ড
২. আল ইনতেক্বাদ আলা কা'মূসিল মাশাহীর
৩. ইলসাকুল কা'বাইন ফি আলরুকূ ইত্যাদি।

তিনি ছাত্র জীবনে যে সকল উচ্চস্তরের বিখ্যাত উস্তাদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শামসুল উলামা মোল্লা সফিউল্লাহ সেরহদী (রহঃ), শামসুল উলামা মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী, শামসুল উলামা মাওলানা আবদুল ওহাব ফাযিল বিহারী, শামসুল উলাম মাওলানা আবদুল্লাহ টৌকী, শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মদ মাযহার, শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহসারামী, মাওলানা সৈয়দ আমীর আলী মলিহাবাদী, মাওলানা খলীল আরব প্রমুখ নামকরা উলামায়ে কিরাম। আল্লাহ পাক তাঁদের সকলকে জান্নাতবাসী করুন।

মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্র ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, পিতা আলহাজ্জ মৌলভী মুহাম্মদ ওয়াযিউদ্দীন নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত বজরা রেল ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে রহমতপুর গ্রামে ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৯১০ সালে নোয়াখালী আহমদিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করার পর ১৯১৩ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতায় সিনিয়র জমাতে ভর্তি হন। তথায় মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করে আলিম লোয়ার স্টান্ডার্ড ও ফাযিল হায়ার ষ্টান্ডার্ড পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে পাস করে সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২০ সালে কামিল ফখরুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

টাইটেল পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরেই তিনি মালগত জেলা স্কুলের হেড মৌলভী পদে নিযুক্ত হন। হেড মৌলভী পদে বিভিন্ন সরকারী স্কুলে চাকুরী করার পর তিনি ১৯৩৩ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। একটানা ১৯ বৎসর মাদরাসা-ই-আলিয়ায় হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি উচ্চস্তরের কিতাবাদি পাঠদান করে ১৯৫১ সালে পেনশন নিয়ে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপনের পর তিনি আশির দশকে ইন্তেকাল করেন। তাঁর নিজ বাড়ির গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তাঁর বড় ছেলে আবু ইঞ্জিনিয়ার এবং মেঝো ছেলে নূরুল ইসলাম বি.বি.সি লন্ডণের বাংলা সংবাদ পাঠক ও তৃতীয় ছেলে মুফিজুর রহমান একজন এম. বি. বি. এস. ডাক্তার ও সিনিয়র চক্ষু বিশষজ্ঞ। তাঁর রচিত কিতাবুল মাউতা নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, নাট্য ও চলচ্চিত্রকার শহিদ বুদ্ধিজীবী শহিদুল্লাহ কায়সার ও জহির রায়হানের পিতা মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নোয়াখালী জেলার বামনী থানার অন্তর্গত মূসাপুর গ্রামে ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী এমদাদ উল্লাহ। স্থানীয় মক্তবে

প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি নোয়াখালী আহমদিয়া মাদরাসায় কিছুকাল অধ্যয়ন করার পর ১৯১৭ সালে কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়ায় জমাতে চাহারমে ভর্তি হন। বৎসরান্তে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেই বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ১৯১৭ সালে আলিম ও ১৯১৯ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারী বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। তৎপর তিন বৎসরে কামিল ফখরুল মুহাদ্দিসীন কোর্স সমাপ্ত করে ১৯২২ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে ফখরুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় পাস করেন। উক্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

খুব সুনামের সাথে একটানা ৩৭ বৎসর শিক্ষকতা করার পর ফিক্হ শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে ১৯৫৯ সালে ৫৭ বৎসর বয়সে চাকুরী হতে পেনশন সহকারে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কলকাতা হতে মাদরাসার সঙ্গে ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর তিনি ঢাকা শহরের কায়েতটুলীতে একটি বাড়ি খরিদ করেছিলেন। অবসর গ্রহনের পর হতে উক্ত বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মালিটোলা ইলিয়ট মাদরাসা হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁর অমায়িক ও মধুর ব্যবহারে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

মাওলানা হরমুজ উল্লাহ শায়দা

মাদরাসা-ই-আলিয়ার কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক এবং সিলেটের কৃতী সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ হরমুজ উল্লাহ ১৯০৩ সালে ২৯ জুন সিলেট সদর উপজেলাধীন তুড়ুক খোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেমন ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলিম তেমনি ছিলেন উর্দূ-ফারসীর একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। কাব্যে তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'শায়দা' অর্থাৎ আত্মহারা প্রেমিক বা মাস্তান।

বাল্যাবস্থায় তিনি গ্রাম্য পাটশালায় ১ম শেণী হতে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রত্যেক শ্রেনীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপর তাঁরে বাড়ি হতে প্রায় মাইলখানিক দূরে রেবতি রমন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। এ সময়ে তাঁর মাতা

পর পর তিন রাত্রি ছেলেটিকে মাদরাসায় ভর্তি করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। তখন তাঁর মাতা দাউদিয়া জুনিয়র মাদরাসার হেড মাওলানা গাওসউদ্দীন সাহেবকে দাওয়াত করে বাড়িতে এনে তাঁর স্বপ্নের কথা জানালেন। মাতার আগ্রহে ও মাওলানা সাহেবের পরামর্শে তাঁকে স্কুল ত্যাগ করিয়ে দাউদিয়া জুনিয়র মাদরাসাতেই ভর্তি করা হয়। এই সময়ে তিনি জনৈক গৃহ শিক্ষকের নিকট কায়দা, আমপারা ও কুরআন শরীফ শিক্ষা করেন।

সে সময়কার জুনিয়র মাদরাসার পাঠ্য তালিকায় আলিফ-বায়ে ফারসী হতে আরম্ভ করে কুর'আন শরীফ, আরবী সাহিত্যে নাহু, সরফ, ফিক্‌হ উর্দু এবং বাংলা ও অংকসহ মোল্লাজামী পর্যন্ত বিষয়াবলী পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল। মাদরাসা শিক্ষার ৮ম শ্রেণীর হেদায়াতুন নাহুর জমাতে একটা সেন্টার পরীক্ষা আসাম বোর্ডের অধীনে নেওয়া হত। ১৯১৪ সালে তিনি উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সাথে বৃত্তি লাভ করেন।

১৯১৬ সালে শরহে মোল্লাজামীর জমাতে (বর্তমান দশম শ্রেণীতে) আসাম বোর্ডের অধীনে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতপর তিনি ১৯১৭ সালে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ফাযিল ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বেই তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। সেই সময়কার আসামে কালাজ্বরের মহামারিতে বহুলোক প্রাণ হারায়। কালাজ্বরে আক্রান্ত দুর্বল শরীর নিয়েই তিনি পরীক্ষা দেন এবং বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ডাক্তার শাহাবুদ্দীন চৌধুরী কর্তৃক পরিচালিত মেডিকেল সেন্টারে তিনি সপ্তাহে দু'টি করে কালাজ্বরের ইনজেকশন নিতেন। ১৯টি ইনজেকশন নেওয়ার পর একটু সুস্থ হলে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় গমন করেন।

১৯২৫ সালের জুলাই মাসে কলকাতা পৌঁছিয়ে ১১নং এমদাদ আলী লেনে অবস্থিত মাদরাসা-ই-আলিয়ার মুহাদ্দিস শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন সিলেটী-এর বাসায় ১০/১২ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ে কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়ায় টাইটেল ক্লাসে ভর্তি হয়ে মাদরাসার ইলিয়েট হোস্টেলের সীট লাভ করেন। কলকাতা যাওয়ার সময় সিলেটের ডা. শাহাবুদ্দীন চৌধরী তাঁকে কালাজ্বরের বাকি

ইনজেকশন নেওয়ার জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজে রেফার করেছেন। সেমতে তাঁকে সপ্তাহে দুইদিন সকালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে ইনজেকশন নিতে হত। জ্বরতাপ নিয়েই এহেন অবস্থায় লেখাপড়া করে তিন বছরের কোর্স শেষ করেন।

কামিল ফখরুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করে সনদলাভ করেন। ইতিপূর্বে যাবতীয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সে কারণে শেষ পরীক্ষাটিতে তৃতীয় স্থান লাভ করিলেও তিনি রিচার্স স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন। সেকালে সরকারী গবেষণা বৃত্তি পাওয়া একটি বিরাট সৌভাগ্যের বাপার ছিল। মাদরাসা লাইব্রেরীতে দেড় বছর গবেষণা করে লাইব্রেরীতে অবস্থিত অপ্রকাশিত আরবী, ফারসী ও উর্দু হাতের লেখা গ্রন্থ পুস্তকাদির চার -পাচ হাজার পাণ্ডুলিপির একটি রেজনী ক্যাটালগ তৈরি করেন।

আল্লামা শাওকানীর একটি জীবনীও রচনা করেন। তাঁর গবেষণা কার্য সন্তোষজনক হওয়ায় আরও দেড় বছরের জন্য সরকারি গবেষণা বৃত্তি মঞ্জুর করে তাঁকে ১৯৩০ সালে অধিক গবেষণার জন্য সরকারী খরচে দাক্ষিনাত্যের হায়দরাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি ইলমে কিমিয়ার যাবতীয় অপ্রকাশিত কিতাবের একটি বিরাট রেজনী ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন। উক্ত ক্যাটালগের ইংরেজী অনুবাদও সরকারী খরচে প্রকাশিত হয়। তাঁর উভয় গবেষণা কাজ সন্তোষজনক হওয়ায় হায়দারাবাদ হতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৩২ সালে তাঁকে মাদরাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

১৯৩২ সালের ১২ এপ্রিল হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত তিনি কৃতিত্বের সাথে কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়ায় অধ্যাপনা করেন। দেশ বিভাগের পর আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি ঢাকায় এসে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। ঢাকা হতে বদলী হয়ে ১৯৫০ সালে ১লা মার্চ সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ে সিলেটের ছাত্র-শিক্ষক সকলেই শায়দা সাহেবকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। এখান হতে তিনি ১৯৫৮ সালের ২৮

জুলাই পরিণত বয়সে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি হজ্জ্বব্রত পালন করেন।

হজ্জ করার পর হতে তিনি ওয়াজ নসীহত ও ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে সিলেটের কতিপয় উলামায়ে কেরাম ও ভানুগাছের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হাজী কেরামত আলী সাহেবের অনুরোধে তিনি ১৯৬৭ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চার বৎসর বানুগাছ আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনার কাজ করেন। আবার লোকজনের অনুরোধে ২০টি মৌজার সমন্বয়ে জালালপুর বাজারের সন্নিকটে আয়োজিত একটি ওয়াকফকৃত জায়গায় তাফসীরে কুরআনের জন্য নির্মিত ঘরে ১৯৭৫ সাল হতে প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা হতে অপরাহ্ন ২টা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে কুরআন শরীফের তাফসীর বয়ান আরম্ভ করেন এবং ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত চার বৎসরে এক খতম তাফসীর বয়ান শেষ করে মুনাজাত করেন। তিনি উর্দু ও ফারসীর এজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। যে কোন বিষয়ে হঠাৎ কবিতা রচনা করা তাঁর জন্য সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল। তাঁর অসংখ্য কবিতা পাণ্ডুলিপি আকারে তাঁর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

শেষ জীবনে তিনি ১৯৮৩ সালে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং ১৯৯০ সালের ২ ডিসেম্বর রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে এক স্ত্রী, ৪ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে যান। দাউদপুর মসজিদের পার্শ্ববর্তী গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মাওলানা আবু উবায়দ শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নদভী

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার খ্যাতিমান উস্তাদগণের মধ্যে মাওলানা আবু উবায়দ শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নদভী ছিলেন ভারত ও বাংলাদেশের অন্যতম নামকরা আলিম। তিনি পশ্চিম বঙ্গের বিরভূম জেলায় ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর দারুল উলূম নুদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌতে উচ্চস্তরের দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর কিছুকাল উক্ত মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতপর মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতায় আরবী সাহিত্যের প্রভাষক নিযুক্ত হন। কুরআন, হাদীস ছাড়াও আরবী সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। যেকোন বিষয়ে আরবী কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

খান বাহাদুর মৌলভী জিয়াউল হক ১৯৪৩ সালে যখন কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়ায় প্রিন্সিপাল পদে যোগদান করেন তখন তাঁর অভ্যর্থনায় উপস্থিত ক্ষেত্রে আরবীতে যে কবিতা রচনা করেছিলেন, অর্ভর্থনায় উপস্থিত উলামায়ে কিরাম ও শিক্ষকমণ্ডলী তাঁর স্বরচিত আরবী কবিতা শুণে অবাক হয়ে যান। সেজন্য তিনি সকলের ভূঁয়সী প্রশংসা লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনিও মাদরাসার সঙ্গে ঢাকায় হিজরত করে আসেন এবং মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত থাকেন। ঢাকা শহরের অদুরে টঙ্গীতে বসতি স্থাপন করেন।

শেষ জীবনে তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসায় সিনিয়র মাওলানার পদে বদলী করা হয়। সেখানে তিনি হাদীস, তাফসীর ও আরবী সাহিত্যের উচ্চতম স্তরের কিতাবসমূহ পড়াতেন। সেখান হতে ১৯৬০ সালে জানুয়ারীতে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকাস্থ নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করেন এবং ঢাকা ট্রেজারী হতে পেনশন গ্রহণ করার পর ১৯৭২ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি দুই স্ত্রী ও অনেক সন্তান-সন্ততি রেখে যান। আরবী সাহিত্যের উপর রচিত তাঁর অনেক প্রবন্ধ ও বই-পুস্তক রয়েছে। তাঁর রচিত আল মুস্তাতরিফ নামক আরবী সাহিত্য পুস্তক আজও মাদরাসা পাঠ্যের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তিনি মাওলানা নদভী নামেই সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

মাওলানা সুলতান মাহমুদ

বাংলাদেশের নামকরা কৃতী ছাত্র এয়ার ভাইস মার্শাল (অব) এ. জি. মাহমুদ-এর সুযোগ্য পিতা মাওলানা সুলতান মাহমুদ মাদরাসা-ই-আলিয়ার একজন কৃতী ছাত্র ও সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। তিনি নোয়াখালী জেলার দাগনভুঁইয়ায় ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

মাদরাসা-ই-আলিয়া হতে আলিম, ফাযিল ও টাইটেল (কামিল) মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষাসমূহে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করার পর তিনি উক্ত মাদরাসাতেই শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। শিক্ষকতার জীবনে প্রথমে সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রভাষক ও অধ্যাপক

পদে উন্নীত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে মাদরাসা-ই-আলিয়ার সাথে কলকাতা হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে আসেন এবং ইসলামপুরের একটি সরকারি রিকুইজিশন্ড বাড়িতে সপরিবার অবস্থান করেন।

কলকাতা মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষকতা জীবনেই কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক আবদুর রহীম সাহেবের এক সুন্দরী কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

তিনি নয় পুত্র ও চার কন্যার পিতা ছিলেন। তাঁর সন্তানরা সকলেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত। সপরিবার ঢাকায় পৌঁছার পর ইসলামপুরের সরকারি বাসায় অবস্থানকালে তিনি ঢাকা শহরের ২৭ নং ধানমন্ডি রোডে একটি সরকারি প্লটের বরাদ্দ লাভ করে তথায় নিজবাড়ি নির্মাণ করেন।

১৯৬২ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় অধ্যাপনার চাকুরী হতে ৫৭ বৎসর (পরিণত) বয়সে অবসর গ্রহণ পূর্বক নিজ বাড়িতেই অবসর জীবন যাপন করেন এবং বিগত ২৪-০৪-১৯৯৫ তারিখ বুধবার দিবাগত রাত্রে ঢাকাস্থ কমবাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ৯০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ২৮-০৪-১৯৯৫ তারিখ মোতাবেক ১৫ বৈশাখ ১৪০২ বঙ্গাব্দ এবং ২৭ যিলকদ, ১৪১৫ হিজরী রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআব বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর নামাযের জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং শংকর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণের গোরস্থানে তাঁর স্ত্রীর কবরপাশ্বে তাঁর নির্ধারিত জায়গায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিনি অতি সুদর্শন, সদালাপী এবং বৈষয়িক জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞ আলিম ছিলেন। অবসর জীবনে দিবারাত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও তসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকতেন।

১৯৮১ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়ার দুইশত বর্ষপুর্তি অনুষ্ঠানে তিনি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সেমিনারের এক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন এবং শেষ বারের মত তাঁর কর্মস্থল বকশীবাজারে অবস্থিত বর্তমান মাদরাসা-ই-আলিয়া স্বচক্ষে দেখে অভিভূত হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তি জীবনে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)

দৈহিক গঠন ঃ তাঁর দৈহিক গঠন ছিল উচুঁ লম্বা, চেহারা ছিল গোলগাল ও অতীব উজ্জ্বল ।[১]

বেশ-ভূষা ঃ পোষাক পরিচ্ছেদ ও বেশ ভূষায় তিনি সম্পূর্ণ সুন্নাতের পা'বন্দ ছিলেন। তিনি পা-জামা, পাঞ্জাবী ও লুঙ্গী পরতেন, মাথায় টুপি রাখতেন ।[২]

মাওঃ মুহিউদ্দীন খান বলেন, " তাঁকে দেখলে মনে হত আগের আগের যমানার যে সমস্ত ওলী দরবেশ এবং মুহাদ্দিসগণের যে সমস্ত চরিত্র আমরা দেখতে পাই ঠিক তাঁদের মত ছিলেন। আমি আমার শিক্ষাজীবনে অন্তত দশ বছর ওনার নিকট সান্নিধ্যে ছিলাম। আমি এর মধ্যে কোন দিন তাঁকে উচ্চস্বরে কোন কথা বলতে দেখিনি। তিনি কাউকে কোন শক্ত কথা বলছেন তাও শুনিনি।

অভ্যাস ঃ তিনি দৈনন্দিন জীবনে চা, পান খেতে অভ্যস্ত ছিলেন ।[৩] তামাক, বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি সেবন করতেননা। তিনি ছিলেন অতিথি পরায়ণ ।[৪] মেহমানদের কখনো না খেয়ে বিদায় দিতেন না ।[৫] তিনি সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য বিশেষ ভাবে আতর ব্যবহার করতেন ।[৬] সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে থাকতেন ।[৭]

জীবন যাপন পদ্ধতি

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর শৈশব, কৈশর, যৌবন ও সামগ্রিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি পুরোপুরি সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন ।[৮] কুরআন সুন্নাহ্‌র বিধান অনুযায়ী তিনি স্বীয় জীবন পরিচালনা করে গেছেন। তিনি কোন প্রকার হৈচৈ পছন্দ করতেন না। অযথা সময় নষ্ট করতেন না। খাওয়া-দাওয়া খুঁজে খেতেন না।

---

১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ইনি মাওলানা মমতায উদ্দীন আহমদের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সাক্ষাৎকার; ৩১-০৫-০৫ ।

২. সাক্ষাৎকার ; ঐ, ৩১-০৫-০৫ ।

৩. সাক্ষাৎকার ; ঐ, ৩১-০৫-০৫ ।

৪. সাক্ষাৎকার ; ঐ, ৩১-০৫-০৫ ।

৫. সাক্ষাৎকার ; ঐ, ৩১-০৫-০৫ ।

৬. সাক্ষাৎকার ; ঐ, ৩১-০৫-০৫ ।

৭. সাক্ষাৎকার ; ঐ, ৩১-০৫-০৫ ।

৮. সাক্ষাৎকার ; ঐ, ৩১-০৫-০৫ ।

যা পেতেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। কম কথা বলতেন, তাঁর মেযাজ ছিল অতি কোমল। সব সময় পড়ালেখা ও জ্ঞান গবেষণায় সময় কাটাতেন।

এ সম্পর্কে তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, "ওনাকে আমি সব সময় পড়ালেখাতে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। এমনকি কায়েতটুলি বাসা থেকে রিক্সায় মাদ্‌রাসায় আসার সময়ও একটি বই হাতে থাকত। বাসা থেকে বের হয়ে রিক্সায় উঠে বই পড়তে পড়তে মাদ্‌রাসায় আসতেন। তিনি দামী পোশাক পরিচ্ছেদ ও আরাম-আয়েশকে পরিহার করে চলতেন। সর্বোপরি তিনি সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি প্রতিদিন ফযরের নামায আদায় করতেন পরীবাগ মসজিদে।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এ সম্পর্কে তাঁর জীবনের খেলাঘর গ্রন্থে উল্লেখ করেন "পরীবাগের শাহ্ সাহেব মাওলানা মমতাযউদ্দীন সাহেবকে খুবই সম্মান করতেন এবং বড় মাওলানা হিসেবে ডাকতেন। পীরসাহেবের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি থাকতেন ১১নং কায়েতটুলিতে। প্রতিদিন ফযরের নামায পড়তেন পরীবাগ মসজিদে। এটা ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। নামাযের পর রমনা মাঠে একটা চক্কর দিয়ে পায়ে হেটে শান্তিনগর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাসায় গিয়ে নাশ্‌তা করতেন। এই ফাঁকে আমার ও খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি আমার ছেলে মেয়েদের সাথে কিছুক্ষণ খেলা-ধুলা ঝগড়া-বিবাদ করে বাসায় ফিরতেন। প্রতিদিন তাদের জন্য চকলেট নিয়ে আসতেন। তিনি আমাকে কতটুকু স্নেহ করতেন তা পরিমাপ করাও ছিল কঠিন"।[৯]

স্বভাব-চরিত্র ঃ

মাওলানা মতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র ছিল একেবারেই সাদামাটা। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও সাদাসিদে এবং সদালাপী ছিলেন।[১০] তাঁর হৃদয় ছিল উদার ও অতীব কোমল। তিনি একজন অতীব উচুঁ মানের আল্লাহর ওলী ছিলেন।[১১] বর্তমান হতাশাগ্রস্থও পরশ্রীকাতর সমাজে এমন সৎ সচেতন ও বিবেকী মানুষ খুবই বিরল।

---

[৯] মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ইনি মাওলানা মমতায উদ্দীন আহমদের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সাক্ষাৎকার: ৩১-০৫-০৫।

[১০] সাক্ষাৎকার ; ঐ, ৩১-০৫-০৫।

[১১] সাক্ষাৎকার ; ঐ, ৩১-০৫-০৫।

তাঁর মাঝে মহানবী (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম ও আগের যুগের ওলামায়ে হাক্কাণীগণের স্বভাব-চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি সত্য প্রিয় ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। সত্য প্রিয়তা ও স্পষ্ট ভাষণ দানে তিনি সদা সোচ্চার ছিলেন। তিনি ছিলেন সবধরনের পক্ষপাতের উর্ধ্বে। সে জন্য তিনি সবার শ্রদ্ধার প্রিয় পাত্র ছিলেন।

তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁরই ছাত্র মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন- "আগের যমানার ওলী দরবেশ এবং মোহাদ্দেসগণের যে রকম স্বভাব-চরিত্র ছিল তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও ছিল তাঁদের মত। আমার শিক্ষা জীবনের অন্ততঃ দশ বছর আমি তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম। আমি এর মধ্যে কোন দিন তাকে উচ্চস্বরে কোন কথা বলতে শুনিনি। তিনি কাউকে কোন শক্ত কথা বলেছেন তাও শুনিনি। তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল একেবারেই শিশুর মত। মানুষ হিসেব তিনি এত উদার ছিলেন যে, কোন ছাত্রকে একটু ম্লান ও জীর্ন- শীর্ণ কাপড় পরা অবস্থায় দেখলেই কানে কানে গিয়ে বলতেন, কোন অসুবিধা নেইতো? অর্থাৎ আর্থিক কোন সমস্যা নেইতো?

সমাজ সেবা ঃ মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (রহঃ) ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন গরীব দুঃখী মেহনতী মানুষের পরম বন্ধু। অসহায় দুঃস্থ এতিম মিসকিনদের সাহায্যার্থে তিনি সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তিনি তাঁর সম্পত্তির তিন গণ্ডা মক্তবের জন্য ৬ গন্ডা মানিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ওয়াক্ফ করে যান।

এছাড়াও নিজবাড়ী ও কান্দারপাড় নানা বাড়ীর মসজিদ সংস্কারের জন্য কিছু সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে যান। বাড়ীর সামনে মক্তবটি একতলা পাকা করা হয়েছে। সেখানে এলাকার গরীব-অসহায় পরিবারের ছেলেমেয়েরা পবিত্র কুরআন শিক্ষা করছে। তাঁর সমাজ সেবার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁরই ভাগিনা হাজী মোজাম্মেল হক বলেন- "মামা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন আমি ও মামাকে খুবই ভালবাসতাম এবং সম্মান করতাম। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ট সমাজ সেবক ও পরোপকারী। সকলের বিপদ-আপদে তিনি সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন । কারো উপকার করতে পারলেই তিনি আত্মতৃপ্তি

পেতেন। ১৯৪৬ সালে আমি কলকাতা ক্লথ রেশনিং মিলের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে মামার সাথে দেখা করি। মামা আমাকে ১৯৪৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী বসুরহাট সাব রেজিষ্ট্রারী অফিসে একটি চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে তিনি যখন যেভাবে পেরেছেন মানুষের সেবা ও উপকার করে গেছেন। তাঁর গুনের কথা ভুলা যায়না"।

বিশিষ্ট লিখক 'শফিউল আযম' তাঁর সমাজ সেবা সম্পর্কে বলেন- "এ সাধক পুরুষ শুধু মাত্র ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ইসলামের অনুসরণ করে বসে থাকেননি বরং তিনি অগনিত ভক্ত ও দেশবাসীর কল্যাণের লক্ষ্যে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র, শুভাকাংখী ও অনাথ, অসহায় মানুষের সরকারি-বেসরকারি চাকুরীর সুপারিশ করে সকলকে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে গেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি যখনই শুনতেন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে সাথে সাথে সেখানে গিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। সম্ভাব্য সাহায্য ও শান্ত্বনা দিতেন। এভাবে তিনি নবী করিম (সাঃ)-এর মহান শিক্ষাকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত অনুসারীর প্রমাণ রেখে গেছেন"।

ইন্তেকাল

এই মহান জ্ঞানতাপস ও আধ্যাত্মিক সাধক ১৯৭৪ সালের ৭ই জুলাই বুধবার দিবাগত রাত ১ টার সময় ৮৮ বৎসর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৯ পুত্র, ৩ মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র ও অনেক গুনগ্রাহী ভক্তবৃন্দ রেখে গেছেন।

তাঁর পুত্র, কন্যারা সকলেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাঁর জৈষ্ঠ পুত্র এডভোকেট মাসুম ঢাকায় একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি সুপ্রিম কোর্টের আয়কর বিভাগের স্বনামধন্য আইনজীবি হিসেবে অদ্যাবধি পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর অপর এক পুত্র ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী এবং বর্তমান আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

তিনি নিজ পূর্ণতা, জ্ঞানার্জন ও আধ্যাত্মিক সাধনায় উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর আত্ম-জীবনীর পরিসমাপ্তিতে যে উদ্ধৃতি করে গিয়েছিলেন তা তাঁর জীবন দর্শনের অগ্রপথিক। তিনি লিখেছিলেন- "সর্বশেষ সেখসাদী রচিত অসীম চরিত্রের অধিকারী হযরত রাসূলুল্লাহর জীবনী চর্চা থেকে বই লিখে অবসর গ্রহণ করছি।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞান গবেষনায় অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা বিস্তারে অবদান

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দীস। তিনি বাংলাদেশ পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস চর্চার শীর্ষ যুগে[১] জন্ম গ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষার এ সোনালী যুগে জন্ম গ্রহণ করায় হাদীস শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। হাদীস শিক্ষার প্রতি তাঁর এ অদম্য আগ্রহই জীবনে তাঁকে হাদীস শাস্ত্রের একজন পন্ডিত বানিয়ে দেয়। তিনি তাঁর শিক্ষকতা জীবনে হাজারো বিদগ্ধ মুহাদ্দিস এবং ইসলামী পন্ডিত সৃষ্টি করে গেছেন। যাঁরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে দক্ষতা ও সুনামের সাথে ইলমে হাদীসের শিক্ষা দান করে যাচ্ছেন। সমসাময়িক যুগে মাওলানা মমতাযউদ্দীন ছিলেন বিরল পান্ডিত্যের অধিকারী।

এ সম্পর্কে তার প্রিয় ছাত্র বর্তমান বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় আলেম মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন-ওনার সময়ে পাঁচজন সেরা আলিমের মধ্যে ওনি শীর্ষস্থানীয় একজন মুহাদ্দিস ছিলেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

মানব দরদী এ মহামনীষী সারা জীবন পরোপকারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে গেলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার এবং প্রসারের জন্য তিনি সম্পত্তি, টাকা-পয়সা অকাতরে দান করে দিয়ে গেছেন। তাই তিনি জ্ঞান পিপাসু লোকদের কাছে আজীবন শ্রদ্ধার পাত্র ও স্মরনীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর ওয়াক্ফ কৃত সম্পত্তির দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-নিজ গ্রামের বাড়ীর সামনের মক্তব, মসজিদ ও মানিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়া কান্দার পাড় নানা বাড়ীর সামনে একটি মসজিদের সংস্কারের কাজ ও তিনি করে যান।

১। দিল্লীর মুহাদ্দীস শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-এর হাতে এ যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইল্‌মে হাদীস সব ইসলামী জ্ঞানের মূল কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠদান পদ্ধতি

তাঁর পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান আরো বলেন-"মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর পাঠদান পদ্ধতির কথা মনে পড়লেই আমার কাছে ইহা রূপ কথার মতই মনে হয়। আমার মনে হয় ওনার দরস্ অনুধাবন করার মত কোন যোগ্য মুহাদ্দীস বর্তমানে বাংলাদেশে নেই।[১]

তিনি আরো বলেন- ঐ সময়ে সারা বাংলাদেশে সেরা পাঁচজন আলেমের নাম নিতে হলে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর নাম নিতে হয়। আরেকটা বিষয় আমি তাঁর মুখে এবং ফররুখ আহমদের মুখে শুনেছি তাঁর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং কবি নজরুল ইসলামের আমপারার কাব্য অনুবাদের পুরোটাই মাওলানা মমতায উদ্দীনের নির্দেশনায় রচিত হয়েছিল"।[২]

বিশিষ্ট লিখক শফিউল আযম এ প্রসঙ্গে বলেন-"১৯৩৩ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমপারা রচনা কালে আরবী থেকে পূর্ণতত্ব অবগত হওয়ার জন্যে তাঁর স্মরণাপন্ন হলে তিনি কবির এক কাব্য রচনায় আত্ম নিয়োগ করে তাকে প্রচুর সহায়তা করেন যা কবি ১৩৪০ সালে "কাব্যে আমপারার প্রথম সংস্করনের ভূমিকাতে" গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেছেন। বাংলাভাষায় উচ্চতর কোন ডিগ্রী লাভ না করে ও তিনি এ ভাষায় যেসব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন তা তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যাবসায়ের পরিচায়ক।[৩]

এছাড়াও তিনি কুরআন, তাফসীর, ফিকাহ, বালাগাত, মানতিক, নাহু, সরফ ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করতেন।

বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ [৪] তাঁর সম্পর্কে বলেন- হাদীস শাস্ত্রে মাওলানা মমতাযউদ্দীনের জ্ঞান ছিল ব্যাপক ও গভীর। কর্ম জীবনের শেষের দিকে তিনি প্রধানতঃ হাদীসই শিক্ষা দিতেন। কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় তাঁর নিকট হাদীস পড়ার সুযোগ আমার হয়েছিল (১৯৪৫-৪৭)।

১। মাওলানা মুহিউদ্দীন খানও সাক্ষাৎকার; ৩১-০৫-০৫

২। মাওলানা মুহিউদ্দীন খানও সাক্ষাৎকার; ৩১-০৫-০৫

৩। শফিউল আযম, প্রাগুক্ত, তাঃ বিঃ।

৪। ড. এম. আবদুল্লাহ সাক্ষাৎকার; ১৭-০৫-০৫

ইলমে শরীআ'তের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পাশাপাশি তিনি ইলমে মা'রিফাত তথা আধ্যাত্মিক জগতের ও উচ্চ শিখরে আরোহন করেন। কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় থাকাকালে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ওলিয়ে কামিল যমানার কুতুব শামসুল উ'লামা হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (দাদা হুযুর) রাহমাতুল্লাহ আলাইহ-এর হাতে বায়আ'ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর বিশিষ্ট খলীফা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি মাদরাসায় ছাত্রদের কুরআন হাদীস শিক্ষা দানের পাশাপাশি ইলমে মা'রিফাত ও শিক্ষা দিতেন।

বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সীর[১] মন্তব্য ঃ ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় মাওলানা মমতাযউদ্দীন সাহেব আমাদেরকে নাসাঈ শরীফ পড়াতেন। তাঁর আলোচনায় হাদীসের নানা জটিল বিষয়ের পর্যালোচনার পাশাপাশি ইলমে মা'রিফাতের নানারূপ সুক্ষ্মতিসূক্ষ্ম তথ্যাদি প্রকাশ পেত।
এছাড়া ও তিনি আরবী, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন যা সুধী মহলে উল্লেখযোগ্য প্রশংসার দাবিদার।

---

[১] মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী; ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় তিনি মাও লানা মমতাযউদ্দিন (রহঃ)-এর নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। সাক্ষাৎকার, ১২ মার্চ ০৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রন্থ রচনা

ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা একটি ব্যাপক বিষয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী মৌলিক বিষয়ে মাওলানা মমতায উদ্দীন (রহঃ) বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর মসজিদ, মক্তব, বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এচাড়াও তিনি অনেক জ্ঞানী, স্কলারগণের পৃষ্ঠ পোষকতা প্রদান করেছেন। সর্বোপরী ইসলামী জ্ঞান গবেষণায় তিনি মানুষকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা নয়টি।

এগুলো হলো

ইতিহাস বিষয়ক ঃ ২টি। নবী পরিচয় ও কুরআন পরিচয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিষয়ক ঃ ২টি। হাললুল ‘উক্বদাহ্ ও কাশফুল মা‘আনী।[১]

জীবনী বিষয়ক ঃ ২টি। পরিবাগের শাহসাহেবের জীবনী ও মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস।

প্রশ্নোত্তর বিষয়ক ঃ ১টি। সাইলুল উসূল লিহাদীসীর রাসূল।

---

[১] কাশ্ফুল মা'আনী গ্রন্থটি ব্যাপক অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায়নি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী সংরক্ষণ ও তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ পুস্তকসমূহ

মাওলানা মমতায উদ্দিন (রহঃ) শিক্ষার প্রতি গভীর জ্ঞান অনুরাগের ফলে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ভূমিকা রাখেন ঃ

(১) দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

(২) পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন এবং

(৩) শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ।

নিম্নে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হলো ।

কৈশোর হতেই তিনি আগ্রহের সঙ্গে পুস্তক সংগ্রহে ব্রতী হন। ছাত্রজীবনে নাস্তার পয়সা বাঁচিয়ে সে পয়সা দিয়ে পুস্তক ক্রয় করতেন। পরিণত বয়সে বর্হিদেশ হতে মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ অথবা পান্ডুলিপির কপি সংগ্রহ করতেন। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে অথবা বিদেশ হতে প্রত্যাগত কোন শিষ্য, ভক্ত আপনজনের মাধ্যমে তিনি পুস্তক সংগ্রহ করতেন, পুর্ব-পুরুষ ও নিকটাত্মীয় কোন জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত গ্রন্থাগার হতে মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ করতেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন প্রচেষ্টায় তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পুর্বে তাঁর সংরক্ষিত কিতাবাদি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় দিয়ে দেন। মাদ্‌রাসা লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে নিম্নে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হলোঃ

১. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন (মিসর, ১৯১১)।

২. আল-মারাকিব (মৃ.১১০৮), আল-মুফরিদাত (মিসর, ১৯০৬)।

৩. আল-আরবী, আত্-তাফসীরুল কাবীর, (মিসর, ১৮৮৮)। ১৮৮৬)।

৪. মোল্লা জিউন (মৃ. ১৭১৭) আত্-তাফসীরপতু আহমদিয়া দিল্লী বারাকী (প্রেস, ১৯৩০)

৫. আল-মারাকিব (মৃ. ১১০৮), আল-মুফারিদাত (মিসর, ১৯১২)।

৬. কাযী সানা উল্লাহ (মৃ. ১৮১০), আততাফসীরুল মাযহাবী (বিহসার, ১৮৫৫)।

৭. আস-সায়ূতী; আদ-দুররুল মানসুর ফিত- তাফসীর বিল মামুর, (মিসর,

৮. সায়ূতী, আল-তাব্বীবুল কুরআন (লাহোর, সন অজ্ঞাত)।

৯. ইমাম বুখারী, আল- জামিউস-সাহীহ (কানপুর, ১৩০৯ হি.)

১০. ইমাম মুসলিম, কিতাবুল জামিউস সাহীহ (দিল্লী, ১৯৩০)।

১১. ইমাম আবূদাউদ, কিতাবুস সুনান (কানপুর, মজিদিয়া প্রেস, ১৯১৯)।

১২. ইমাম নাসায়ী, কিতাবুস সুনান (দিল্লী, ফারুকী প্রেস, ১৩৫০) হি.)।

১৩. ইমাম তিরমিযী, আল-জামি (দিল্লী, মুজতাবায়ী প্রেস, ১৩৫০)।

১৪. ইমাম ইবনু মাজাহ, আল-সুনান (দিল্লী, ফারুকী প্রেস, তাং অজ্ঞাত)।

১৫. ইমাম মালিক, আল-মুওয়াত্তা (দিল্লী, ১২৬৬ হি.)।

১৬. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মাসনাদ (মিসর ১৮৮৮)।

১৭. আবুদাউদ আত্-তায়ালিসী, আল-মুসনাদ (হায়দরাবাদ, দায়িরা আল-মা‘আরিফ,১৯০৩)।

১৮. ইমাম শাফেয়ী, আল-মুসনাদ (হায়দরাবাদ, দায়িরা আল-মা‘আরিফ, ১৯০৩)।

১৯. ইমাম আবু হনীফা, আল মুসনাদ (দিল্লী, মুজতাবায়ী প্রেস, ১৮৮৮)।

২০. আল-হাকেম, অল মাস্তাদরাক (হায়দরাবাদ, দা. মা, ১৯২৪)।

২১. ইবনুল-জারুদ, আল-মুনতাকা (হায়দরাবাদ, ১৮৯১)।

২২. আল-দারেমী, আস-সুনান (কানপুর, নিযামী প্রেস, ১২৯৫ হি.)।

২৩. আত্-তাহাভী, শরহু মা’আনিয়িল আসার (মিসর, মুস্তাফায়ী প্রেস, ১৯৯২)।

২৪. ইবনু আবী শায়বা, আল-মুসন্নাফ (মূলতান, তাং অজ্ঞাত)।

২৫. আত্-তিবরানী, আল মু’জামুস-সাগীর।

২৬. আবূ নায়ীম, আদ্-দালায়িল। (হায়দরাবাদ, দা, মা, ১৯২)।

২৭. আবু ইয়ূসুফ, কিতাবুল খারাজ (মিসর, ১৯৩৬)।

২৮. ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আসার (লাহোর, ১৯০৮)।

২৯. ইমাম আবু ইয়ূসুফ কিতাবুল আছার (মিসর, ১৯৩৬)।

৩০. ইমাম যায়িদ, আল-মুসনাদ (মিসর, ১৯২১)।

৩১. আবূ ওবায়দ, কিতাবুল-আমওয়অল (মিসর)

৩২. হাফিয ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী মিসর, ১৯২৯)।

৩৩. আল-আইনী, ওমদাতুল-কারী (তুরস্ক-কুসতুন তুনিয়া, ১৮৯০)।

৩৪. আল-খাওয়ারিজমী, জামিআল-মুসনাদ (হায়দরাবাদ, দা মা, ১৯১৩)।

৩৫. আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী (কলকাতা, ১৮৫৫)।

৩৬. আস্-সুহায়লী, আর-রাউযুল আনফ (মিসর, আল-জামালিয়া; ১৯১৩)

৩৭. হাফিয ইসন-হাজার, বুলুগুল-মুরাম (দিল্লী, আল-মুজতাবায়ী প্রেস ১৯১৩)।

৩৮. ইবনু আসীর, জামিউল উসূল (মীরাঠ, খাইরিয়া প্রেস ১৯২৬)।

৩৯. শায়খ আলী আল-মুত্তাকী, কানুযুল উম্মাল (হায়দরাবাদ, দা. মা. ১৮৯৪)।

৪০. আল-শাওকানী, নাইলুল আওতার (মিসর, বুলাক, ১৯৭৯)।

৪১. আল-সাবকী, শিফা, আল-সিকাম (হায়দরাবাদ, দা, মা, ১৮৯৭)।

৪২. আল-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (হায়দরাবাদ, দা. মা. ১২৩৪হি.)

৪৩. হাফিয ইবন হাজার, আল-ইসাবা (মিসর, শারকিয়া প্রেস, ১৯৭)।

৪৪. ইবনু কুতায়বা, কিতাবুল মা'আরিফ (লাইডেন, ১৮৫০)।

৪৫. হাফিয ইবনু হাজার, তা'জিলুল-মানফাআ(হায়দরাবাদ,দাঃমাঃ ১৯০৫)

৪৬. নুখবাতুল ফিক্‌র (দিল্লী মুযতাবায়ী প্রেস,১৯২৭)

৪৭. আল- ইরাকী,আল- আলফিয়া (লক্ষ্মী)

৪৮. আল্-সায়ূতী, তাদরীবুল-রাবী (মিসর, জামালিয়া প্রেস, ১৮৮৯)।

৪৯. আস্-কাসানী, কিতাবুল বাদায়ি ওয়াস সানায়ি (মিসর, জামালিয়া, ১৯০৬)।

৫০. আবুল-লাইছ, বুস্তানুল ফাকীহ (মিসর, দারুল কুতুব, ১৯০৮)।

৫১. আল-সারাখ্‌সী, আল-মাসবুত (মিসর, মাতবাআ আস-সা'আদাত, ১৯০২)।

৫২. ইবরাহীম আল-হালভী, গুনিয়াতুল মুস্তামালী। (দিল্লী, মুযতাবায়ী প্রেস, ১৮৮৯)।

৫৩. ইবনু কাইম, আ'লামুল মুওয়াকিকয়্যিন (মিসর, ১৯২৬)।

৫৪. ইবনু রুশদ, বিদায়তুল মুজতাহিত।

৫৫. আল-কারী, শরহুল মানসিক (দিল্লী, মজিদিয়া প্রেস, ১৯১০) ।

৫৬. বুরহান উদ্দীন আল-মুরগিনানী, আল-হিদায়া (কলকাতা; নওলকিশোর, ১৮৭৬) ।

৫৭. ইবনু হুমাম, ফতহুল-কাদীর (মিসর, মায়মানিয়া, ১৮৮৯) ।

৫৮. ইবরাহীম আল-তারালবিলী, মাওয়াহিবুর রহমান ।

৫৯. আল-হাসফাফী, আদ্-দুরুল মুখতার (মিসর, মায়মানিয়া, ১৯০০) ।

৬০. শায়খ ইবন আবেদীন, রাদউল মুহতার (মিসর, মায়মানিয়া, ১৯০০) ।

৬১. ফখরুল ইসলাম, উসূল আল-বায়দাবী (মিসর, ১৭৯৩) ।

৬২. তাফতাযানী, আত-তালভীহ ।

৬৩. আল-দুমাইরী, হায়াতুল হায়ওয়ান (মিসর, মায়মানিয়া, ১৮৮৭) ।

৬৪. খাইর উদ্দীন যিরক্লী; আল-আলাম (মিসর, ১৯২৬) ।

৬৫. হাজী খলীফা, কাশফুয্যুনূন । (মিসর, মায়মানিয়া ১৯২৬) ।

৬৬. ইবনু নাজিম, আল-বাহরু-রায়িক (মিসর, ১৮৯৩) ।

৬৭. শায়খ আব্দুল হাই, মাজমুআ আল-ফাতাওয়া ।

৬৮. আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, তারীখুল ইসলাম ।

৬৯. আল- মু'জামুল মুফাহরাস (লিডেন, ১৯৩৬)

৭০. তাবকাতুল মুদাল্লিসীন (মিসর, ১৯০৪) ।

ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রতিটি পুস্তক তিনি বার বার আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেন বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায় । অধ্যয়নকালীন সময় দৃষ্টি আকর্ষনী ও প্রয়োজনীয় বিষয় পৃথক কাগজে নোট করে নিতেন । মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে প্রতিষ্ঠানটিতে তিনি তাঁর কর্মজীবনের পুরোটা সময় কাটিয়েছেন সেই আলিয়া মাদরাসার গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করার জন্যে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সংগৃহিত পুস্তাকাদি দান করে যান ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা

মাওলানা মমতায (রহঃ)-এর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্নমুখী উদ্যোগের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এবং নানা প্রকার শিক্ষা কার্যক্রম নিয়েও তিনি ব্যস্ত জীবন কাটাতেন।

তাঁর সময়কালে (১৮৮৬-১৯৭৪) বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশে শিক্ষা- ব্যবস্থা ছিল তিনটি ধারায় বিভক্ত ঃ

১. ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্রের আধুনিক শিক্ষাধারা,

২. প্রাচীন ধর্মীয় জ্ঞান সমৃদ্ধ কাওমী মাদরাসা শিক্ষাধারা।

৩. আধুনিক ও ধমীয় জ্ঞান সমর্থিত সরকারী মাদরাসা শিক্ষাধারা।

প্রথমোক্ত ধারায় শর্ত-নিরপেক্ষ বিষয়ে প্রাধান্য স্বীকৃত। তাই এ শিক্ষার অধীন সমাজে এক ধরনের ধর্মবিমুখ পার্থিব সুবিধাভোগী ও বস্তুবাদী বদ্ধিজীবী সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময় ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়ের সাথে কিছুটা ধর্মীয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তবে তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। উক্ত শিক্ষা ধারায় সমাজ জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও পন্ডিতগণের মনে ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ শিক্ষাধারা পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের মাঝে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। মাদরাসা শিক্ষা ধারা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এ শিক্ষায় সমাজ ও দেশ গঠনের চাহিদা এবং দাবী পূরণের উপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় পাঠ্যভুক্ত ছিল না। এমনকি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ও ছিল অপ্রতুল। তাই এর পাঠ্যসূচী ছিল অপূর্ণ ও লক্ষ্যহীন। এ শিক্ষার মাধ্যমে বস্তুদর্শন ও আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য নির্ণয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই এ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্তরা ইহ ও পরকালীন জীবনে ভারসাম্য রক্ষায় অক্ষম।

উক্ত বিপরীতমুখী দু'টি শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমাজে এমন দু'শ্রেনীর শিক্ষিত লোকের জন্ম হয়, যাঁরা

১. জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুটা সমৃদ্ধ ও বস্তুবাদী, কিন্তু ইসলামী (ধর্মীয়) জ্ঞানে অজ্ঞ।

২. আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অজ্ঞ, তবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত।

ফলে তাঁরা একে অপরের বিদ্যা ও জ্ঞানের মূল্যায়নে অসমর্থ হন। তাঁদের চিন্তাধারা দু'টি পরস্পর বিরোধী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হয়। এই সুবাদে সমাজের সাধারণ লোকগণ জীবনের সঠিক পথ ও যথাযথ চিত্রের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হন। কোন শিক্ষা তাঁদের জীবনে সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি এবং সহজ আলোকময় পথের অনুসন্ধান দিতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি।

তাই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আধুনিক ও ধর্মীয় পন্ডিতবর্গ এ (পর্বত প্রমান) ব্যবধান দূর করার জন্য বিভিন্ন সময় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এদের কেউ কেউ, ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগও গ্রহণ করেন। স্যার সাইয়িদ আহমদ খাঁ ও শামসুল ওলামা মাওলানা আবূ নসর মুহাম্মদ ওয়াহীদ সেসব শিক্ষা সংস্কারকগণের অন্যতম ছিলেন।

তাঁর সময় কালে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সরকারী পর্যায়ে বহু কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়। মু'আযযম উদ্দীন কমিটি (১৯৪৬), পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা- ব্যবস্থা পূনর্গঠন কমিটি (১৯৪৯) হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন, নূরখাঁ শিক্ষা কমিশন (১৯৬৯) এবং আকরম খাঁ শিক্ষা কমিটি (১৯৪৯) এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ সময় মাওলানা মমতায উদ্দিন শিক্ষকতার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি এসব কমিটি ও কমিশনের নীতি ও কার্যক্রমের ব্যাপারে অবহিত এবং বিষয়বস্তু ও সুপারিশমালার সাথে পরিচিত ছিলেন। কর্মজীবনের সর্বাবস্থায়ই ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও প্রগতিতে তিনি নানাভাবে উৎসাহিত করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধ্যাত্মিক জীবন

বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সঠিক হযরত মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ ছিল উল্লেখযোগ্য। শরীআত ও মা'রিফাতের উভয় জ্ঞানে উজ্জীবিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় উত্তরাধিকার সুত্রেই তিনি ইলমে শরীআতের সাথে সাথে ইলমে মা'রিফাতের সৌন্দর্যে সুষমা মন্ডিত হয়ে উঠেন। শিশু বয়স হতেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য তাঁর ব্যবহারে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। তা ছাড়া তিনি ইলমে শরীয়াতের পাশাপাশি ইলমে মা'রিফাতে ও উচ্চ স্থানে পৌঁছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিক সাধক

বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মাওলানা মমতাযউদ্দীন আহমদ (রহঃ) সুন্দর সৌম্য ও আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল জ্যোতির্ময় ও সৌন্দর্য প্রদীপ্ত। চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন অনুকরনীয়। সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন তিনি। তাঁর ব্যবহারে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত আকার্ষিত হতো। অথচ কেউ তাঁকে পীরের মত আচরণ করলে তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া জীবন বিধান অনুযায়ী চলার উপদেশ দিতেন। যারা তাঁর অত্যন্ত আপনজন ছিলেন তারা তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা উপলব্ধি করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন।

মুর্শিদের সান্নিধ্য

এ মহামনীষী কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় অবস্থান কালে বিশ্ববিখ্যাত পীর যমানার কুতুব শামসুল উলামা হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (দাদা হুযুর)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর বিশিষ্ট খলীফা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আল্লাহর প্রিয় দুইজন খাস ওলীর সংশ্রব লাভ

আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা মতায উদ্দীন (রহঃ) জীবনে যুগ শ্রেষ্ঠ আল্লাহর ওলীগনের সান্নিধ্য ও সংশ্রব লাভ করেছিলেন এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে ফয়জে বারকাত হাসিল করেছেন তম্মধ্য হতে হযরত সফিউল্লাহ (দাদাজী) ও পরীবাগের শাহ সাহেব অন্যতম।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বলেন ঃ কলকাতায় হযরত সফিউল্লাহ (দাদা হুযুর) রাহেমাহুল্লাহর খেদমতে সুদীর্ঘ ৩০ বছরের ও অধিক সময় এবং ঢাকায় পরীবাগের শাহ সাহেব রাহেমাহুমুল্লাহর সংশ্রবে দীর্ঘ এক যুগের ও কিছুবেশী সময় অতিবাহিত করবার সুযোগ আমার হয়েছে। আল্লাহর দু'জন খাস ওলীর সংশ্রবে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দেয়ার ফলে তাঁদের উভয়ের মধ্যে যে যোগাযোগ আমার নযরে পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে সে সম্বন্ধে কিছু বলার মনস্থ করেছি এ জন্য যে, তার মধ্যে বুঝার, জানার ও শিখার অনেক কিছুই রয়েছে।

আল্লাহর ওলীদের দর্শনলাভ

মাওলানা সাহেব যে সমস্ত ওলীদের দর্শন লাভ করে নিজেকে ধন্য করেছেন তাঁরা হলেন ঃ

১. সীমান্ত প্রদেশের বাম খেলের হযরত বাদশাহ সাহেব (রহঃ)

২. থানে ভবনের অধীনে উম্মত হযরত মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রহঃ)

৩. ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবুবকর (রহঃ)

৪. হযরত মাওলানা আব্দুররফ জৌনপুরী (রহঃ)

৫. নারিন্দার মসুরী খোলার শাহ সাহেব হযরত শাহ আহসান উল্লাহ (রহঃ)

৬. চট্টগ্রামের মাইঝভান্ডারের মাওলানা গোলামুর রহমান (রহঃ)

৭. এ ছাড়াও কলকাতার বরকতীয়া খানকা শরীফে এবং তালতলার খানকা শরীফে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

এ সমস্ত আল্লাহর ওলীগণের দর্শন লাভ করে তিনি নিজেকে ধন্য করেছেন এবং সম্ভবও করেছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, অর্থাৎ ঃ প্রত্যেক ফুলের রং এবং গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইলমে মা'রিফাতের পরিচয়

হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের মতে আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশ নিষেধ পালন এবং হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নাতের অনুসরনে অন্তরে যে এক প্রকার নূর অর্থাৎ জ্যোতির উদ্ভব হয়, যার দ্বারা সে অন্তরে বহু জিনিসের অসংখ্য গুনাবলীর বিকাশ ঘটেছে তাকেই ইলমে মা'রিফাত বলে। এর ফলে আল্লাহর ওলীগণ এমন অনেক কিছু দেখতে, জানতে, বুঝতে ও করতে পারে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য। ওলী দরবেশ গণের এই অসাধরণ ক্ষমতাকে কারামত বলে।

ইলমে মা'রিফাতের শিক্ষা

হযরত মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) ক্লাসে ছাত্রদেরকে যেমন ইলমে শরীআত শিক্ষা দিতেন তেমনি তাঁর গুনগ্রাহীদের ইলমে মা'রিফাত শিক্ষা দিতেন। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদান কালে তাঁর মধ্যে সুপ্ত মা'রিফাতের সূক্ষ্ম জ্যোতি উদ্ভাসিত হতো যা শিক্ষার্থীদের বিশেষ ভাবে তাঁর প্রতি আকর্ষিত করে তুলতো।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, লেখকও গবেষক মাওলানা এ.কে. এম. ফযলুর রহমান মুন্সী বলেন- ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন কালে আমি হয়রত মাওলানা মমতায উদ্দীনের (রহঃ) নিকট হাদীস অধ্যয়ণ করেছি, তিনি কামিলে নাসাঈ শরীফ পড়াতেন। হাদীস শরীফের আলোচনাকালে ইলমে শরী'আত ও মা'রিফাতের সংমিশ্রণে তাঁর আলোচনা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতো। তাঁর আলোচনায় হাদীসের নানা রূপ জটিল, কঠিন বিষয়ের পর্যালোচনার পাশাপাশি ইলমে মা'রিফাতের মহামূল্যবান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যাদি প্রকাশ পেতো।

ঢাকায় আসার পর তিনি পরীবাগের শাহ সাহেব সৈয়দ শাহ আব্দুর রাহীমের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি পীর সাহেবের দরবারে পরীবাগের বড় মাওলানা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বলেন, অর্থাৎ ঃ ওলীদের কারামত বাস্তবিক সত্য। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) আততাকাশ শোফ নামক কিতাবের ১১১ নং পৃষ্ঠায় ইলমে মা'রিফাতের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, অর্থাৎ, যাহেরী শরী আতের পূর্ণ অনুসরনে অন্তরে যে ছাফাই ও আলোর সঞ্চার হয়-যার ফলে অন্তরের উপর জগতের নানা বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব এবং আল্লাহতা'য়ালার বহুগুনাবলী প্রকাশ পায়, তাকে মা'রিফাত বলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরীবাগের সাহ সাহেবের সাথে তাঁর সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ লাভ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় তখন ২৯ জন আলিম সহ মাওলানা মমতায উদ্দীন (রহঃ) ঢাকায় চলে আসেন। তাঁদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ তখন মাওলানা ঢাকায় স্থায়ী ভাবে থাকার মনস্থ করলেন।

ইত্যবসরে খবর পেলেন ধানমন্ডি এলাকায় একটি বাড়ী বিক্রয় হবে। একদিন বাড়ী দেখতে গেলেন। বাড়ী দেখা শেষ করে তিনি মাগরিবের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে পরীবাগ মসজিদ ঢুকলেন। নামায শেষ করে তিনি মসজিদের এক পাশে এক নূরময় মহাপুরুষকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত মাওলানা সাহেব পীর সাহেবকে অবলোকন করে তন্ময় হয়ে গেলেন। ঘোর কেটে গেলে পার্শ্ববর্তী একজনকে জিজ্ঞেস করলেন।

ইনি কে?

তিনি বললেন,

পরীবাগের শাহ সাহেব।

ইশার নামায শেষে তিনি শাহ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে দুই-চার মিনিট কথা বললেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাত্র দুই-চার মিনিটের কথা বার্তা আমার কাছে দুই-চার ঘন্টার চেয়ে ও যথেষ্ট মনে হয়েছিল। শাহ সাহেব হুযুর এক প্রশ্নের জবাবে বললেন, যে তালাশ করে সে পায়।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বলেন, জনাব শাহ সাহেব কেবলার এই বানী হতে আমি পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারলাম, আমার যে উদ্দেশ্য ছিল তা শুধু তার আভাস ও ইঙ্গিত নয় বরং ইহাই প্রকাশ্য ঘোষনা।

শাহ সাহেব ক্বেবলার নিকট মুরিদ হওয়ার পদ্ধতি

জনাব শাহ সাহেব ক্বেবলার মুরীদ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির লোক। *সহজে তিনি কখনো এ কাজে ধরা দিতেননা। ঢাকাশহরের লক্ষাধিক* লোক তাঁর ভক্ত ছিল। আপদে বিপদে দৈনিক কম করে হলেও

চার/পাঁচশত লোক জনাব শাহ সাহেবের নিকট আসতো এবং ছুরা তাবিজ ঝাঁড় ফুক নিয়ে বহু লোক উপকৃত হতো। কিন্তু তিনি কখনো তাদেরকে তাঁর মুরিদ/বাইয়াত হতে ভুলেও বলেননি। দর্শনার্থীদের কেউ কেউ শাহ সাহেবকে নিজেদের পীর মুরশিদ বলেও মনে করতো। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল শাহসাহেব ক্বেবলার ভীষণ ভক্ত।

তবে যারা অটল ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে দুই চার বছর পর্যন্ত শাহ সাহেব ক্বেবলার নিকট যাতায়াত করতো এবং তাঁর সান্নিধ্যে থেকে রোযা নামায করতো সেই সাথে যাহেরী শরীআত পালনের মাধ্যমে সাহ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারতো কেবল তারাই শাহ সাহেবের মুরীদ হিসেবে গণ্য হতো। এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যাহেরী শরীআত পালনের মাত্রানুযায়ী শাহসাহেব (র) মা'রিফাতের ফয়েয দিতেন।

আর যারা জনাব শাহ সাহেব ক্বেবলার (রহঃ)-এর স্বভাব চরিত্রের অনুসরণ করতো তাদের অন্তর হতে চিরতরের জন্য গর্ব অহংকার প্রভৃতি স্বভাব দুর হয়ে যেতো। আত্ম সংযমও আত্মসন্তুষ্টি তাদের চরিত্রে স্থান লাভ করতো। আল্লাহ ও রাসুলকে খুশী করার আগ্রহ এবং নফল ইবাদত বন্দেগী করার আবেগ তাদের অন্তরে সতেজ হয়ে উঠতো। যা বহু সাধ্য সাধনা এবং যথেষ্ট পরিমাণে যিকিরও হালকা যিকিরের ফলে হয়ে থাকে। ইহাই হলো মা'রিফাতের শেষ ফল এবং ইহাই হলো মোরাকাবা মোশাহিদার যিকির ও হালকার শেষ পরিনাম।

জনাব শাহ সাহেব ক্বেবলা (রহঃ) শরীআতের মাধ্যমে মা'রিফাত দান করতেন। মাধারণ মানুষ মা'রিফাত দানের পদ্ধতি জানতে পারতনা। শাহ সাহেব ক্বেবলা (রহঃ) এর মুরিদ অল্প ও সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ তাঁর মুরিদান হওয়ার পথ সাধারণ মানুষ জানতনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খেযেরী তরীকার বৈশিষ্ট্য

হযরত খেযেরের নিকট হতে মা'রিফাত প্রাপ্ত ব্যক্তি অন্য কাউকেও মুরীদ হওয়ার জন্য আহবান জানাতে পারেনা। আহবান জানানোর কোন বিধান ও নাই। তবে যে সকল লোক তার (শাহ সাহেবের) সংশ্রবে থেকে যাহেরী শরীআত পালনে তাঁর অনুসরণ করতে থাকবে, কেবল তারাই তাঁর মুরীদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে এ তরীকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১. এই তরীক্বাত প্রচলিত কাদেরীয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদীয়া প্রভৃতি তরীক্বার অর্ন্তভূক্ত নয়।

২. এই তরীক্বাতে হালকা যিকির মোরাকাবাহ মোশাহাদার কোন আবশ্যক করেনা।

৩. এই তরীক্বা হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবেতাবি'য়ীগণের তরীক্বার সম্পূর্ণ অনুকরণ।

৪. এই তরীক্বাতে নফল ইবাদত, ভাল কাজ করার আগ্রহ অন্তরের মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত হতে থাকে।

৫. এই তরীক্বার আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খারাপ কাজ আর দুঃশ্চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত রাখে।

৬. এই তরীক্বাতে স্থলবর্তী নির্দেশ করার কোন বিধান নেই তবে শরী'আত পালনের একটি নির্দিষ্ট স্তরে হযরত খেযেরের দর্শন লাভ হয়।

৭. খেযেরী তরীক্বার ওলীগণ সিলসিলার ফয়েয ও দো'আ লাভের আশায় প্রসিদ্ধ কাদিরীয়াহ, চিশতীয়া বা নক্‌শবন্দীয়া তরীক্বার অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকেন।

৮. এই বিধান মতেই পরিবাগের জনাব শাহসাহেব (রহঃ) নিজেকে সুরাসী শরীফের কাদেরীয়াহ তরীক্বার প্রসিদ্ধ পীর হযরত খাজা আব্দুর রহমান (রহঃ) সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত বলে প্রকাশ করতেন বটে, কিন্তু এ তরীক্বার বিধান মতে তাকে কাজ করতে দেখা যায়নি।

তাঁর উপদেশাবলী

১. আল্লহ্ এক ও অদ্বিতীয় অভিভাবক, মালিক ও মুখতার, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী ও অধীন।

২. যে আলিমকে দেখলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে মনে পড়ে তিনিই মহানবীর সত্যিকারের অনুসারী। প্রকৃত আলিম বা ওয়ারিস-এ নবী।

৩. আল্লাহ প্রেমের পথে কোনরূপ অবহেলা করা যাবেনা।

৪. স্বল্প-আহার, কম শয়ন, স্বল্প-কথা ও অল্প-মেলামেশা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৫. দিলকে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখা উচিত।

৬. প্রত্যেক বৈধকাজ ও অভ্যাসে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা চাই।

৭. শেষ রাতের নামাযের পর পাপমার্জনা ও প্রার্থনা করার অভ্যাস করতে হবে।

৮. সচ্চরিত্রবান হতে হবে এবং অসচ্চরিত্র পরিত্যাগ করতে হবে।

৯. পরনিন্দা, ছিদ্রান্বেষণ, চুগলখোরী, মিথ্যা দোষারোপ ও মিথ্যা বলা ত্যাগ করতে হবে।

১০. অন্যকে মন্দ জানা পরিত্যাজ্য বিষয় বলে বিবেচনা করতে হবে।

১১. আত্ম-অহংকার পরিত্যাগ করে সবার সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে ও নিজেকে ছোট জ্ঞান করত আল্লাহর আযাবকে ভয় করা উচিত।

১২. নিজ পাপকে অধিক জ্ঞান করে ভীত সন্ত্রস্ত অন্তরে পরকালের প্রতি স্থির হতে হবে।

১৩. অপরের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা ও ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাঁর অনুগ্রহের শোকর গুজার করতে হবে।

১৪. সুদৃঢ় ঈমান, সৎআমল ও সর্বদা সময়নিষ্ঠ গুণ অর্জনের প্রতি সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৫. শরী'আতের পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে, কেননা শরী'আতের বিধি-বিধান পালন না করে কেউই তরীকত হতে উপকৃত হতে পারেনা।

১৬. তরীকতের পথ, আদব ও মহব্বতের সাথে সুন্নাতের অনুসরণ করেই এ পথ পাওয়া সম্ভব।

১৭. পৃথিবীর সবকিছুই মানবকল্যাণের জন্য সৃষ্টি। মানুষ এ ধরায় রিক্ত হস্তে আসে আবার শূন্যহাতেই ফিরে যায়। শুধু তার সাথে যায় তার আমল বা কর্ম। দুনিয়ার প্রতিটি কর্মের জন্য মানুষকে পরকালে হিসাব দিতে হবে। সুতরাং মানুষ যেন দুনিয়ার দাস না হয়।

১৮. সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে থাকা উচিত। অন্তরের কালিমা দূর করার জন্য যিকির রেতের মত।

১৯. তাঁর প্রধান ওয়াযীফা হলো আল-কুরআন। এর মর্ম উপলব্ধি করে আমল করতে হবে।

২০. ইমাম ও মাশায়িখদেরকে সম্মানের চোখে দেখেতে হবে। কারণ তাঁরা সুন্নাতের তাবেদারীর উপলক্ষ্য এবং মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পথে আহবানকারী।

২১. আদবের অপর নাম তাসাউফ। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সব আদেশ-নিষেধ পুরোপুরিভাবে পালন করার নামই আদব অভিহিত হয়।[১]

---

[১] ড.এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, মুহিউদ্দীন খান, সালিমওয়াহিদী, ড. আবদুল্লাহ্; সাক্ষাৎকার, ২৯-০৫-০৫ ঃ ০২-০৫-০৫ ঃ ৩১-০৫-০৫ ও ০৬-০৬-০৫।

সপ্তম অধ্যায়

তাঁর গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা

ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) ছিলেন ইসলামী মৌলিক বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর জীবনের পুরোটাই ইসলামী জ্ঞান সাধনায় অতিবাহিত করেন। তৎকালীন সময়ে ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার মত মহান পেশার মাধ্যমে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।

পরবর্তী সময়ে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কর্ম জীবনে তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যক্তিত্ব। তাঁর পাঠদান পদ্ধতিও ছিল অতি উচ্চমানের।

পাঠ দানের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর মসজিদ, মক্তব, বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছন। এ ছাড়াও তিনি অনেক জ্ঞানী, স্কলারগণের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন।

সর্বোপরি ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় তিনি মানুষকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা নয়টি।

এগুলো হলো–

১। নি'মাতুল মুন'ইম।

২। কাওকাবুদ্দররী।

৩। রিসালাতু সাহলুল উসূল লি হাদীসির রাসূল (সাঃ)।

৪। হাল্‌লুল ' উক্বদাহ্'

৫। কাশ্‌ফুল মা'আনী ফী মাক্কা'মাতি বদিউজ্জমান হামদানী।[১]

৬। মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস।

৭। নবী পরিচয়।

৮। কুরআন পরিচয়।

৯। পরিবাগের শাহ্‌ সাহেবের জীবনী।

---

[১] কাশ্‌ফুল মা'আনী ফী মাক্কা'মাতি বদিউজ্জামান হামদানী গ্রন্থটি ব্যাপক অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায়নি।

نعمة المنعم

على

(شرح اردو)

مقدمة صحيح مسلم

লেখক ঃ ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)
রচনাকাল ঃ ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৭ খ্রী.
প্রকাশক ঃ ম্যানেজার মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা
ছাপাখানা ঃ এমদাদীয়া প্রেস, উর্দূ রোড, ঢাকা- ১২১১
প্রকাশকাল ঃ ২৯ আগস্ট, ১৯৬১ খ্রী.
সাইজ ঃ ৮.৫" - ৬.০"
মূল্য ঃ
সাদা ঃ অজ্ঞাত
নিউজ ঃ অজ্ঞাত
প্রকাশনী ঃ মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা

نعمة المنعم على شرح مقدمة صحيح مسلم

সহীহ মুসলিম শরীফের ভূমিকার সহজ ব্যাখ্যা

পবিত্র কুরআনে কারীমের পর বিশুদ্ধ ছয়খানা গ্রন্থের অন্যতম একটি হলো 'সহীহ মুসলিম শরীফ', ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ গ্রন্থখানা রচনা করেন। গ্রন্থকার গ্রন্থের পূর্বে একখানা ভূমিকা লিখেন, যা ছাত্রদের অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাওলনা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর সময়ে কিতাবখানা মাদ্‌রাসায় পাঠ্যভূক্ত ছিল। তিনি মূলগ্রন্থ যাতে ছাত্ররা সহজভাবে বুঝতে পারে সে জন্যে এর ভূমিকার স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করে নামকরণ করেন نعمة المنعم على شرح مقدمة صحيح مسلم এ গ্রন্থখানি তিনি ১৯৫৫ সালে রচনা করেন। গ্রন্থখানার বিষয় সূচী মাওলনাা আরবী বর্ণমালার ভিত্তিতে ১২টি শিরোনাম দিয়ে সাজিয়েছেন। এরপর ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর প্রণীত ভূমিকাটা হুবহু তুলে ধরেছেন, নিম্নে মাওলানা মমতায উদ্দীন (রহঃ)-এর "نعمة المنعم" এর ১২টি শিরোনাম তুলে ধরা হলোঃ

(১) حمد ونعت (প্রশংসা ও গুণকীর্তন)।

(২) بعثت نبی وحقیقت معجزه (নবীর" আবির্ভাব এবং মু'জিযার হাকীকত)।

(৩) انبیاء سابقین کے معجزات اور نبی اخر الزمان کے معجزه میں فرق (পূর্ববর্তী নবীগণের মু'জিযা এবং বিশ্বনবীর মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য)।

(৪) انبیاء سابقین کی قبروں کا صحیح پتہ کیوں نہیں ملتا (পূর্ববর্তী নবীগণের কবরের সঠিক সন্ধান মিলেনি কেন?)

(৫) قران وحدیث کی حفاظت (কুরআন এবং হাদীসের হেফাযত)।

(৬) عهد نبوی میں پورا قران کاحافظ (নবীর (সাঃ)-এর যুগে কুরআনের হাফেয)।

(৭) ذكر جمع القران فى حيات نبى عليه الصلاة والسلام وجامع القران حضرت عثمان رضـ(নবী (সাঃ) এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ এবং কুরআনে সংকলক হযরত ওসমান (রাঃ)।

(৮) اثر کا نبوت پر کرام صحابه সাহাবীগণের উপর নবুওয়াতের প্রভাব)।

(৯) کب اور کیوں اصول حدیث کی بنیاد پڑی (কখন এবং কেন উসূলে হাদীসের ভিত্তি স্থাপিত হয়?)

(১০) مقدمه مسلم کی اهمیت (মুসলিম শরীফের ভূমিকার গুরুত্ব)।

(১১) عرض حال (সমসাময়িক অবস্থা)।

(১২) خلاصة مافى المقدمة لمسلم (ইমাম মুসলিমের (রহঃ) মুকাদ্দামার সারমর্ম)।

গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট এবং উপকারিতা

গ্রন্থখানি ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর লিখা একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থ-এর 'মতন' বা মূল গ্রন্থ হলো "مقدمة صحيح مسلم" । এ গ্রন্থকার (রহঃ) দীর্ঘ দিন ধরে مسلم شريف-এর পাঠদানের সেবায় নিয়োজিত থাকাকালে এ কিতাব এবং এর مقدمة এর বহুবিধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন যখন ঐগুলোর কাঠিন্যতা, ভাষার জড়তার দিকগুলো অবলোকন করেন, তখন তিনি তাঁর সমকালীন বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ কামেল ব্যক্তিদ্বয়ের অনুমতিক্রমে পাঠক সমাজের সামনে সহজভাবে مسلم شريف এর مقدمة কে তুলে ধরার জন্য এ গ্রন্থখানি রচনা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন ।

গ্রন্থকার এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মুসলিম শরীফের ' মুকাদ্দামাহ্' - এর সহজ সরল এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাখ্যা করেন । ব্যাখ্যা গ্রন্থ শুরু করার পূর্বে স্বীয় কিতাবের একটি সংক্ষিপ্ত মুকাদ্দামাহ্ রচনা করে مقدمة এর মূল বক্তব্য জ্ঞান পিপাসু পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেন । যা অধ্যয়ন করে পাঠক সমাজ অতি সহজেই مسلم شريف রচনায় ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর অনুসৃত রীতি নীতি এবং সামগ্রিক বৈশাষ্টাবলী ও অনির্বচনীয় গুরুত্ব ও মাহাত্ব অনুধান করে তাদের জ্ঞান পিপাসা নিবারনের প্রয়াস পায় । তিনি তাঁর উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে "مقدمه مسلم كى اهميت" নামক শিরোনামে উল্লেখ করে মুলত "نعمة المنعم" কিতাব খানা রচনার যৌক্তিতা ও আবশ্যকতা সম্পর্কে পাঠক সমাজের দৃষ্টি নিবন্ধনের প্রয়াস চালিয়েছেন ।

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর "مقدمة" -এর সারমর্মঃ

ব্যাখ্যাকার মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) এ শিরোনামের মধ্য দিয়ে পাঠক সমাজের জন্য مسلم شريف-এর مقدمة -এর ব্যাখ্যা সহজ ও সাবলীল করে সহজ থেকে সহজতর করার লক্ষ্যে পূর্ণ "مقدمة" এর আলোচ্য বিষয়গুলোকে সারমর্ম আকারে তুলে ধরে তাঁর এ মহান খেদমতকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন । নিম্নে ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যের মূল কথা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি ।

* ব্যাখ্যাকার মাওলানা মমতায উদ্দীন (রহঃ) মুসলিম (রহঃ)-এর বক্তব্যের আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর প্রথিতযশা ছাত্র আবূ ইসহাকের অনুরোধক্রমে তিনি ধর্মীয় বিধান সম্বলিত (রাসূল (সাঃ)-এর সহীহ্ হাদীসের আলোকে একটি কিতাব রচনা করার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেন । তখন তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজের কল্যাণ ও পাঠক সমাজের কল্যাণ উভয় সফলতাকে সামনে রেখে কোন হাদীস তাক্বরার করা ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ এ হাদীস গ্রন্থ রচনা কাজে আত্ম নিয়োগ

করেন। হাদীস রচনার ক্ষেত্রে তিনি তিন শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণ যোগ্য মনে করে তা مسلم شريف এ সংযোজন করেন। সেই তিন শ্রেণীর রাবীগণ হলেন-

(১) ঐ সব راوى যারা বিশ্বস্থতা এবং স্মরণ শক্তির দিক দিয়ে পাকাপোক্তা ছিলেন।

(২) ঐ সব راوى যারা এক্ষেত্রে মধ্যমগুণের অধিকারী ছিলেন ।

(৩) ঐ সব راوى যারা সাধারণত মুহাদ্দিসগণের কাছে বিশ্বস্থ বলে পরিচিত। এ দিকে ইঙ্গিত করে ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন-

واليه اشار الامام المسلم بقوله "وتاليفه على شريطة سيوف اذكر هالك وهو انا نعمد الى جملة ماسند من الاخبار عن رسول الله صلعم فنقسمها على ثلاثة اقسام وثلث طبقات من الناس على غير تكرار (صـ٧-٦) [১] (نعمة المنعم)

সার কথা হলঃ- গ্রন্থকার (রহঃ) কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই তাক্বরার হাদীস সংযোজন থেকে বিরত থেকে দীর্ঘ দিন প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে স্বীয় অনবদ্য কীর্তি مسلم شريف এর রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। তাছাড়া গ্রন্থকার তাবি'য়ীন এবং তাবা-তাবি'য়ীগণের মধ্য থেকে ও কতিপয়ের স্তরকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাইতো কুরআন বলছে وفوق كل ذى علم عظيم

এ সম্বন্ধে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে عن عائشة رضـ امرنا رسول الله صلعم ان تنزل الناس منازله

তা ছাড়া তিনি এখানে কিছু কিছু راوى গণের বর্ণনাকে منكر বলে অভিহিত করেছেন। এ জাতীয় منكر হাদীস এবং দূর্বল ও ত্রুটিযুক্ত ফাসিক ব্যক্তিদের হাদীস বর্ণনাও তিনি তাঁর গ্রন্থে সংযোজন করেননি। এ প্রসঙ্গে মূলতঃ তিনি কুরআনের বাণীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন-

ياايها الذين امنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا

এ ছাড়াও মহানবী (সাঃ) বলেছেন -

من حدث عنى بحديث يراى انه كذب فهو احد الكاذبين

এরপর গ্রন্থকার কতিপয় তাবিয়ী'নগণের ও তাবা-তাবিয়ীগণদের নাম সংযোজন করেন যেমন- আতা, ইয়াযিদ, লাইছ, মনসুর, সোলায়মান, আ'মাশ, ইসমাইল ইবনে আওন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাররাব, আবূ জাফর হাশেমী, আব্দুল কুদ্দুস, যাবের বিন ইয়াযিদ প্রমুখ বর্ণনাকারীগণের থেকে কতিপয়কে মিথ্যাবাদী এবং কতিপয়কে দূর্বল ও ত্রুটিযুক্ত راوى বলে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় তুলে ধরেছেন।

---

১. মাওলানা মমতাযউদ্দীন, 'নি'মাতুল মুন'ইম', মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ২৯ আগষ্ট ১৯৯১ খ্রী.পৃ. ৬ - ৭।

এরপর ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উপর কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে ইমাম বুখারীর উপর এ সব আপত্তি ও অভিযোগের যথাযথ উত্তর প্রদান করে গ্রন্থখানাকে অত্যধিক আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। এ সব আপত্তির দু'একটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ-

(১) ইমাম বুখারী (রহঃ) দলীলরূপে গ্রহণ করার জন্য এবং হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার জন্য সংশ্লিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারীকে তাঁর উর্ধ্বতন "শায়খ"-এর সাথে لقاء ও سماع এর শর্তারোপ করেছেন অথচ কিছু কিছু তাবি'য়ীন যেমন - নো'মান ইবনে 'আয়াশ, ' আতা ইবনে ইয়াযিদ এবং হামিদ ইবনে আবদুর রহমান জাযরী যথাক্রমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, তামীম দারী এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)থেকে হাদীস বর্ণনা করেছন কিন্তু তাঁদের সাথে উপরোক্ত সাহাবীগণের সাক্ষাৎ ঘটেনি, এরপরও প্রায় সকল বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের নিকট উক্ত روايت গুলো বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত। গ্রন্থকার মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বলেন-

پس یه تابعین مذکوریں جو صحابه رضـ سے روایت کرتے هیں ان کا سماع اور
ملاقات کهیں ثابت نهیں - [1] (نعمة المنعم- صفحه- ١٠٩)

তাহলে لقاء ও سماع এর শর্তারোপ করার তো কোন প্রয়োজন পড়ে না।

* نعمة المنعم প্রণেতা ইমাম বুখারী (রাহ্.) এর পক্ষ থেকে জবাব দিতে গিয়ে বলেন - উপরোক্ত তাবি'যীগণ বিশ্বস্ত তাবি'য়ীন আয় مراسیل ثقات تابعین গ্রহণীয়। তাঁদের মধ্যে ثقة থাকার কারণে তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য। যেমনঃ তিনি বলেন -

امام بخاری رح اور جمهور محدثین کی طرف سے ان سب روایتوں کے متعلق یه
جواب هے که جب لقاء کا ثبوت نهیں تو ان میں ارسال کا احتمال تها مگر چونکه
مراسیل صحابه اور مراسیل ثقات تابعین مقبول هیں- اس بنا پر ان سب روایتیں
صحیح اور قابل حجت هیں- نه اس بنا پر که معارضت اور امکان لقاء جو امام مسلم
رح کا مسلك هے- [2] (نعمة المنعم صحفه- ١١٠)

* যারা لقاء ও سماع কে শর্ত করেছেন তথা ইমাম বুখারী ও তাঁর মতের অনুসারীগণের মতে معنعن হাদীস ও গ্রহণীয় নয়। যেহেতু সেখানে انقطاع এর সম্ভাবনা থাকে, অথচ معنعن হাদীসে لقاء ও سماع এর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলে তা গ্রহনীয় তাহলে لقاء ও سماع এর শর্তারোপ যথার্থতা কোথায় ?

---

১. মাওলানা মমতাযউদ্দীন, 'নি'মাতুল মুন'ইম', মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ২৯ আগষ্ট ১৯৯১ খ্রী.পৃ. ১০৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

এর উত্তরে গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, এ ধরণের হাদীসে একবার لقاء সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা اتصال এর দিকটা راجح হওয়ায় আর انقطاع এর দিকটা مرجوح হওয়ায় তা গ্রহণ যোগ্য। যেমনঃ তিনি বলেন-

امام بخاری رح کی طرف سے اس جواب یہ ھے کہ جب لقا ثابت نہ ھو تو اتصال وانقطاع کا احتمال مساوی ھو تا ھے- اور یہ روایت کی جس میں راوی مجھول ھو اور جب ایك مرتبہ لقا ثابت ھو جاوے تو جانب اتصال راجح اور جانب انقطاع مرجوع ھوتاھے۔[১] (نعمة المنعم صفحہ- ۱.۱)

نعمة المنعم এর বৈশিষ্ট্যঃ

(১) আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে তেরটি শিরোনাম করা হযেছে।

(২) তাছাড়া গ্রন্থকার "مقدمة مسلم" এর خلاصة শিরো নাম দিয়ে সহজভাবে পূর্ণ مقدمة এর মূল বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

(৩) সরল উর্দু তরজমা, শাব্দিক বিশ্লেষণ, نحوی ترکیب তথা আরবী ব্যাকরণ নিয়মে বাক্য বিশ্লেষণ করেছেন।

(৪) যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র ভারত বর্ষের পাঠকের উপকারীতার দিক লক্ষ্য করে সহজ উর্দু ভাষায় এ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

(৫) মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) উক্ত গ্রন্থের مقدمة-এর মধ্যে علم حديث ও اصول حديث এর প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণের প্রাথমিক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে চমৎকারিত্ব দান করেছেন।

(৬) এ গ্রন্থ খানার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো গ্রন্থকার مقدمة مسلم এর সরল অনুবাদ করে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে تشريح শব্দের পরিবর্তে الحاصل শব্দ ব্যবহার করেছন।

(৭) তিনি ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে উথাপিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গতানুগতিক পদ্ধতি তথা سوال ও جواب উল্লেখ না করে الحاصلএর অধীনে প্রশ্নের নমুনা এবং "فائدة" এর অধীনে উত্তর প্রদান করেছেন।

(৮) এ গ্রন্থের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) "مقدمة مسلم" এর জটিল শব্দ ও বাক্যের সহজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে الملحقات নামে একটি শিরোনাম প্রদান করেছেন।

সর্বোপরি গ্রন্থখানি সুন্দর, সাবলীল, সহজ ভাষায় রচনা করে গ্রন্থকার মাওলানা মমতাযউদ্দীনের (রহঃ) তাঁর জ্ঞান-গবেষনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

---

[১] মাওলানা মমতাযউদ্দীন, 'নি'মাতুল মুন'ইম', মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ২৯ আগষ্ট ১৯৯১ খ্রী.পৃ. ১০১।

الكوكب الدرى

شرح اردو

مقدمة المشكواة للشيخ الدهلوى

লেখক ঃ ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)
রচনাকাল ঃ ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৭ খ্রী.
প্রকাশক ঃ ম্যানেজার মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা
ছাপাখানা ঃ আযীযীয়া আর্ট প্রেস, ঢাকা
কাতেব ঃ সিরাজুল হক ইসলামাবাদী
প্রকাশকাল ঃ ১৯৬৯ খ্রী.
সাইজ ঃ ৮.৫" - ৬.৫"
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০
কপির সংখ্যা ঃ ২০০০ (দুই হাজার)
মূল্য ঃ
সাদা ঃ অজ্ঞাত
নিউজ ঃ অজ্ঞাত
প্রকাশনী ঃ মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা

الكوكب الدرى
مقدمة المشكواة للشيخ الدهلوى

আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী (রহঃ)-এর মিশকাত শরীফের ভূমিকার ব্যাখ্যা

কিতাবের নামকরণঃ اصول الحديث-এর জগতে এটি একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। কিতাবটির নামالكوكب الدرى তথা মুক্তাখচিত তারকা। ঠিক নভোমন্ডলে উদ্ভাসিত জ্যোতির্ময় তারকার মতই উহা সর্বমহলে পরিচিতি লাভ করে আপন গতিতে বিকশিতি হতে চলেছে। যুগ যুগ ধরে, এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটির মূল বা মতন হলো "مقدمة الشيخ" কিতাব খানা, মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) এ গ্রন্থেই একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসাবে তাঁর উক্ত গ্রন্থটি রচনা করে নাম দেন 'আল- কাওকাবুদ্দুর্‌রী'।

এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি লিখার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যাকার (রহঃ) মূলতঃ মিশকাত শরীফের مقدمة যেটি مقدمة الشيخ عبد الحق دهلوى নামে পরিচিতি। উহার গভীরে মুক্তার ন্যায়, লুট্‌কিয়ে থাকা ভাব সমূহ এবং কাঠিন্য ও জটিল বিষয়বস্তু সমূহকে ভাষার অলংকারীত্বে, উর্দুভাষায় নুপুর ঝংকারের আবর্তনে অতীব মার্জিত, সাবলীল ও সহজ পদ্ধতিতে তুলে ধরেছেন। আর সে মর্মেই হয়তো ব্যাখ্যাকার (রহঃ) এর স্বার্থক নামالكوكب الدرى হিসেবে নাম করণ করে স্বীয় কীর্তির যথার্থতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকার মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বলেন - কিছু কিছু জ্ঞানী সমাজ مقدمة الشيخ কিতাব খানাকে سهل مشكل তথা সহজ জটিল কিতাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বিষয়বস্তুঃ

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) গ্রন্থখানি আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে (ا-ب-ت-ث- ইত্যাদি) ২০টি বিষয়বস্তুর অধীনে নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি সূচী তৈরী করে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে সুনিপুন কলমের আঁচড়ে তুলে ধরেছন। যা নিম্নরূপঃ

১। নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা।

২। আরবের মর্যাদা।

৩। তদানিন্তন জাতীর জনপ্রিয় বিষয়ের আলোকে নবীর মু'যিজা।

৪। আরবীদের স্মৃতি শক্তির ব্যাপারে এক অমুসলিম ইংরেজ মনীষীর বর্ণনা।

৫। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবীগণের আমলের ভিত্তি।

৬। হাদীসের উৎপত্তির সময়কাল।

৭। হাদীস বর্ণনা কখন এবং কিভাবে আরম্ভ হয়।

৮। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি।

৯। মৌখিক বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব।

১০। রাসূল (সাঃ) কর্তৃক শিক্ষা দান পদ্ধতি।

১১। লিখিত বর্ণনায় ক্ষতির সম্ভবনা।

১২। সাহাবীগণের হাদীস শিক্ষার পদ্ধতি।

১৩। সাহাবীগণের সময় হাদীসের শিক্ষালয়।

১৪। হাদীস লিখা নিষিদ্ধ। পরবর্তী লেখার অনুমতি প্রদান।

১৫। হাদীস সংকলনের কারণ।

১৬। কোন দেশে কোন মুহাদ্দিস হাদীস সংকলণের নিয়োজিত ছিলেন।

১৭। সর্ব প্রথম কে হাদীস একত্রিত করেন এবং কে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সংকলণ করেন।

১৮। مقدمة মিশ্‌কাতের বৈশিষ্ট্য।

১৯। كوكب الدرى রচনার কারণ।

২০। অপারগতা প্রকাশ।

রচনা ও প্রকাশকালঃ

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারী গ্রন্থখানি রচনা করেন।

১৯৬৯ সালে মুহাম্মদী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা-এর ম্যানেজার কর্তৃক গ্রন্থের ২০০ কপি মুদ্রিত হয়। এরপর এর আর কোন মুদ্রণ হয়নি।

গ্রন্থ রচনার পেক্ষাপট ঃ ব্যাখ্যাকার মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন -

کیونکه بظاهر اس کی عبارت سلیس اوراسان معلوم هوتي هے مگردر حقیقت اسرار خفیه اورمطالب عالیه کي حادی هے تعمق نظرسے دیکھا جائےتومقدمه کااشکال حل کا محتاج هے[১] (صفحه - د)

যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিতাবটির ভাষা সহজ কিন্তু এটার অভ্যন্তরীন সূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করা হলে অবশ্যই উহা বাস্তবসম্মত একটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে। সংক্ষিপ্ত এ বইটি আরো বিস্তারিত হওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

কারণ সর্বসাধারণ পাঠকগণ গভীর বিষয় উপলব্ধি করার ব্যাপারে উৎসাহিত নয় বিধায় ঐ সূক্ষ্ম বিষয়ের বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা গ্রন্থকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষাপটে মরহুম ব্যাখ্যাকার (রাহ.) এর এ মহান প্রয়াস যা তিনি তাঁর যুগ শ্রেষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা

---

১. মাওলানা মমতাযউদ্দীন, ' কাওকাবুদ্দুররী', মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. د

সফিউল্লাহ্, (রহঃ) ও অন্যান্য ওস্তাদগণের পরামর্শক্রমে মহান আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় ও রাসূল (সাঃ) এর আন্তিক করুণা নিয়ে তদানীন্তন ভারতীয় উপমহাদেশের সকল অঞ্চলের জনগণের বোধগম্যের দিক বিবেচনা করে বাংলা ভাষী হওয়া সত্বেও ব্যাখ্যাকার উর্দু ভাষায় সহজ-সরল ও প্র্যাঞ্জল ভাষায় "কাওকাবুদ্দুর্রী" কিতাবখানি রচনা করে সমগ্র উপমহাদেশের জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন।

বৈশিষ্ট্য ঃ

একথা সর্বজন স্বীকৃতি যে, যে ব্যক্তির কীর্তি ব্যাপক হবে এবং নিজস্ব গন্ডি পেরিয়ে সামগ্রিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়বে, ততটাই সেই কীর্ত মহিমান্বত হবে। মুলতঃ গ্রন্থকার উর্দুভাষায় এ গ্রন্থ রচনা করে সেই মৌলিক দাবী পুরণ করে গ্রন্থটিকে আরো বেশী স্বার্থক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি গ্রন্থখানির আরেকটি স্বার্থক সুন্দর নাম করে পাঠককুলের চাহিদাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়েছেন।

এ গ্রন্থের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো গ্রন্থকার (রহঃ) হাদীসে নববী (সাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলো এবং উসূলে হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে অভিনব পদ্ধতিতে পয়েন্ট ভিত্তিক আলোচনাকে সুবিন্যস্ত করে পাঠক সমাজের অভাবনীয় মনের খোরাক পূরণ করেছেন। বলতে গেলে গ্রন্থকার (রহঃ) এ গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে বিশাল এক সমুদ্রকে ছোট্ট একটি পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। যা ব্যাখ্যাকারের ভাষায় এভাবে ফুটে উঠেছে। صحیح معنوں میں دریاکو کوزہ میں بھر دیا ھے

এছাড়া এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট হলো ভাষায় সহজসাধ্যতা, ভাবের গভীরতা, ব্যতিক্রম ধর্মী প্রকাশ ভঙ্গীর অনুপম রচনা শৈলী, পয়েন্ট ভিত্তিক স্থানে স্থানে জটিল শব্দ ও বাক্যের যথার্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রন্থখানিকে একটি অতুলনীয় গ্রন্থে পরিগণিত করেছন। আর এটি অবশ্যই গ্রন্থকারের এক অনির্বাচনীয় পরিশ্রমের ফসল এতে তিলার্ধ পরিমান সন্দেহ নেই।

পর্যালোচনাঃ "الکوکب الدری" গ্রন্থখানা পর্যালোচনা করতে গিয়ে এতদসংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় বিষয় আলোকপাত না করলেই নয় যেগুলোকে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) তাঁর উক্ত গ্রন্থ রচনার শিরোনাম হিসেবে সংযোজন করে, ইল্‌মে হাদীস, আরবী ভাষা, রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীগণের যুগে ইল্‌মে হাদীসের লিখন পঠন,

সংরক্ষণ, সংকলন ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে নির্ভুল এবং তাত্ত্বিক প্রামান্য গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে উক্ত গ্রন্থখানাকে মূল্যায়ণের মাপ কাটির উর্ধ্বাসনে আসীন করে গেছেন। যেমন তার দু-একটি বাস্তব নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

---

১. মাওলানা মমতাযউদ্দীন, 'কাওকাবুদ্দুররী', মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ১

* **হাদীস রেওয়ায়তের সূচনা পর্বঃ** এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকার (রহঃ) বলেন, ইসলাম সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন যখন নবী (সাঃ)-এর দরবারে গমনাগমন করা কষ্টসাধ্য হয়, তখন থেকেই হাদীস রেওয়ায়েতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। ফলে নিকটস্থ সাহাবায়ে কেরামগণ দূরবর্তীদের কাছে মৌখিকভাবে রাসূল (সাঃ)-এর বাণী সমূহ প্রচার করতে শুরু করেন এবং প্রাথমিকভাবে প্রচারের কাজ মৌখিকভাবে চলতে থাকে। এক দিকে লেখার উপকরণের অপর্যাপ্ততা অন্যদিকে বিশুদ্ধ উচ্চারণ, এ'রাব ও হরকতের যথার্থতা রক্ষার খাতিরে এবং ভাষাগত অভিন্ন হওয়ার কারণে কুরআনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রনের প্রবল আশংকায় মৌখিক ভাবেই ইল্‌মে হাদীসের প্রচার ও প্রসারের কাজ শুরু হয়।[১]

* সাহাবায়ে কেরামগণের সময়ে তাঁরা মৌখিকভাবে হাদীস শুনাতেন এবং তাবি'য়ীগণ তা মুখস্থ করে নিত, যেমন তিনি دارمی شریف-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)-এর দরসে কোন ছাত্র হাদীস লিখতে চাইলে তিনি সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে তিরস্কার করে বলতেন তুমি কেন লিখতেছ? আমরাতো রাসূল (সাঃ) থেকে হাদীস শ্রবণ করা মাত্রই মুখস্ত করে নিয়েছি।১ সুতরাং তোমরা তাই কর। হযরত আনাস (রাঃ) থেকেও ও অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

* সাহাবীগণের সময়ে যে সব স্থানে علم حدیث এর চর্চা হতো সে সবস্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য স্থান হলো মসজিদে নববী। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন হযরত আবূ মুসা আশ্‌'আরী, আবূ হুরায়রা 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম উল্লেখ যোগ্য।

* এরপর কুফা কেন্দ্রিক হাদীস চর্চার ও শিক্ষাদানের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস'উদ' (রাঃ) এর তত্ত্বাবধানে।

* দামেস্কে 'ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা দান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয় হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে।

* এদিকে মদীনা কেন্দ্রিক ইল্‌মে হাদীসের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়লো হযরত ' আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর ও যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)-এর উপর।

طبقات الاقرا- تذكرة الحفاظ- مسند احمد بن حنبل-اسرار الانوار) (صفحة- ح) [২]

* এরপর যখন কুর'আনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রনের আকাংখা অনেকটা দূরীভূত হতে লাগলো তখন, রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে হাদীস মুখস্ত করার পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করার ও অনুমতি পাওয়া গেল। আর এ

---

১. মাওলানা মমতায উদ্দীন, কাওবাবুদ্দুরবী; পৃ. ৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

অনুমতি সাপেক্ষে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্নে 'আমর ইব্নুল আ'স মুখস্থ করার পাশাপাশি 'ইল্মে হাদীসের এক বিশাল ভলিয়াম লিখে ফেলেন। তিনি তাঁর লিখিত পান্ডুলিপির নাম দিয়েছিলেন الصادقة। এভাবে অপরাপর সাহাবীগণও নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে হাদীস লিখা শুরু করেন। যেমন - ব্যাখ্যাকার (রহঃ) এখানে তিরমিযী শরীফের একটি উদ্ধৃতি নকল করেছেন। জনৈক সাহাবী হাদীস ভূলে যাওয়ার আপত্তি করলে নবী করিম (সাঃ) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন - তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে লিখ রাখ।

* এরপর ক্রমান্বয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে মুসলিম সমাজে বহু ভ্রান্ত জাতি-গোষ্ঠী যেমন-খারিজী, রাফিজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। অন্য দিকে লিখার প্রক্রিয়া চালু হওয়ার কারণে মুখস্থ করার পরিবর্তে লিখার উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়লে লোকজন তখন উমাইয়্যা বংশের অষ্টম খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর এ ক্ষেত্রে অন্যান্য মনীষী ইমামগণের তুলনায় ইমাম ইব্নে শিহাব যুহ্রীর স্থান শীর্ষে বিধায় তাকেই অনেকে হাদীসের শ্রেষ্ঠ সংকলক বলে মনে করেন। "তাঁর সংকলিত হাদীস কয়েক উটের[১] বোঝাই ছিল।"

* এ সংকলণ প্রক্রিয়ার কাল বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বলেন -

১. یہ کام سنہ ۱۲ ھ سے سنہ ۱۵۰ ھ تك كے زمانہ میں ھوتا رھا .

অর্থাৎ " এ সংকলন প্রক্রিয়া ১২০ হিজরী থেকে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত চলতে থাকে "

এ সময়েই অনেক احاد পর্যায়ের হাদীস مشهور এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ সময়ের সংকলকদের কারো উপর কারো প্রাধান্য না দিয়ে فتح الملهم গ্রন্থ প্রণেতা বলেন[২]

وكان هولاء فى عصر واحد لايدرى أيهم سبق

---

[১] মাওলানা মমতায উদ্দীন, কাওবাবুদ্দুররী, পৃ. خ

[২] মাওলানা মমতাযউদ্দীন, কাওকাবুদ্দুররী; পৃ. خ

رسالة سهل الاصول لحديث الرسول

লেখক ঃ ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)
রচনাকাল ঃ ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৭ খ্রী.
প্রকাশক ঃ ম্যানেজার মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা
ছাপাখানা ঃ আযীযীয়া আর্ট প্রেস, ঢাকা
কাতেব ঃ সিরাজুল হক ইসলামাবাদী
প্রকাশকাল ঃ ১৯৬৯ খ্রী.
সাইজ ঃ ৮.৫″ - ৬.০″
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩২
কপির সংখ্যা ঃ ২০০০ (দুই হাজার)
মূল্য ঃ
সাদা ঃ অজ্ঞাত
নিউজ ঃ অজ্ঞাত
প্রকাশনী ঃ মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা

رسالة سهل الاصول لحديث الرسول

রাসূল (সাঃ) -এর হাদীসের ছোট্ট সহজমূলনীতি

এটি الكوكب الدرى গ্রন্থের শেষের অংশ, এর আলোচনা একটু ভিন্ন হওয়ায় ভিন্ন নাম দিয়ে লেখক এটি আল্ কাওকাবুদ্দুরী-এর শেষে এটিকে সংযোজন করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস গ্রন্থকার মাওলানা মমতায উদ্দীন (রহ.)-এর হাদীসের সেবায় রেখে যাওয়া অফুরন্ত কীর্তিসমূহের অন্যতম আরো একটি কীর্তি হলো এ ছোট্ট গ্রন্থটি। যা পাঠক সমাজের দৃষ্টি গোচর হলে সত্যিই তারা অভিভূত না হয়ে পারবে না যে, কতই না সুন্দর ও সাবলীল ভাষায়, প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকে اصول حديث-এর মৌলিক পরিভাষাগুলোকে তিনি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন, যা সাধারণ পাঠক ও পরীক্ষার্থী ছাত্র সমাজ উভয়ের সমানভাবে চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। আরো বেশী উপকৃত হওয়ার জন্য বাংলাতে এর অনুবাদ হওয়ার ও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কাওকাবুদ্দুররী গ্রন্থটিকে আরো সহজভাবে উপলব্ধি করার জন্য তিনি এর শেষাংশে উপসংহার আকারে ভিন্ন নাম দিয়ে এ ছোট্ট গ্রন্থখানির সংযোজন করেছেন। ব্যাখ্যাকারের অন্তর্নিহিত প্রেরণা, অনুযায়ী পাঠক ও শিক্ষক সমাজ যদি উক্ত গ্রন্থখানিকে الكوكب الدرى এর ব্যাখ্যা مقدمة الشيخ এর সাথে মিলিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে এর সদ্ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই اصول حديث শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হবেন। তাইতো এই رسالة এর শুরুতে এবং মূল বই الكوكب الدرى-এর ৭৮ নং পৃষ্ঠায় "هداية" কলামে উপদেশ দিতে গিয়ে মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বলেন -

(هدایت)، شایقین حدیث میرے اس رسالہ "سھل الاصول" کے ایک ایک مضمون کو ملاتے ھیں اور شرح ذھن نشیں کر لینے کے بعد اسی مضمون کو مقدمة مشکواۃ سے میں اس کی توضیح وتمثیل دیکھ لیں [১]

---

[১] মাওলানা মমতাযউদ্দীন, 'রিসালাহ সাহ্‌লুল উসূল লি হাদীসির রাসূল' ১৯৬৯ খ্রী. পৃ. ৯১। মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

حل العقدة للسبع المعلقات

লেখক ঃ ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)
রচনাকাল ঃ ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৭ খ্রী.
প্রকাশক ঃ ম্যানেজার মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা
ছাপাখানা ঃ আযীযীয়া আর্ট প্রেস, ঢাকা
কাতেব ঃ সিরাজুল হক ইসলামাবাদী
প্রকাশকাল ঃ ১২ জুলাই, ১৯৪২ খ্রী.
সাইজ ঃ ৮.৫″ - ৬.০″
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৩২
কপির সংখ্যা ঃ অজ্ঞাত
মূল্য ঃ
সাদা ঃ অজ্ঞাত
নিউজ ঃ অজ্ঞাত
প্রকাশনী ঃ মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা

حل العقدة للسبع المعلقات

সাবা‘ মুয়াল্লাক্বার সহজ সমাধান

আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আরবগণ সাহিত্য চর্চায় বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় যারা চাঞ্চল্যকর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতেন তাদেরকে পুরুস্কৃত করা হতো। তারই ধারাবাহিকতায় কাব্য ও সাহিত্যে যারা নিজেদেরকে অন্যতম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করতেন তারা তাদের লিখিত কবিতা বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালে লট্‌কিয়ে দিতেন বক্ষ্যমান লিখায় যে কবিতা গুচ্ছের আলোচনা করা হচ্ছে সেই কবিতা গুচ্ছ ও বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালে লট্‌কিয়ে দেয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে ইমরুল কায়সই নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর সাতজন কবির সাতটি কবিতাগুচ্ছ একত্রে একটি পুস্তকে সন্নিবেশিত করে যে পুস্তকটির নামকরণ করা হয় তার নামই سبعة المعلقة তথা সাতজন কবির লট্‌কানো কবিতাগুচ্ছ।

* উপমহাদেশ তথা পাক বাংলাদেশের মাদরাসার ছাত্রদেরকে আরবী সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্য অর্জনের জন্য এ কবিতাগুচ্ছের পাঠদান করা হয়ে আসছে। তাই মাদ্‌রাসা সমূহে ইহা পাঠ্যভূক্তি করা হয়েছে।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) মাদ্‌রাসার কোমলমতি ছাত্রদের যাতে উক্ত গ্রন্থটি বুঝতে কস্ট না হয় সেজন্য উর্দূ ভাষায় এর ব্যাখ্যা রচনা করে নাম দেন حل العقدة। যার অর্থ সাবা‘ মুয়াল্লাকার সহজ সমাধান।

নামকরণঃ

ফখরুল মুহাদ্দিস মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহ.) তাঁর حل العقدة তে سبعة معلقة এর নাম করণের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-রাসুল (সঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে জাহেলী যুগে এ নিয়ম ছিল যে, প্রতি বছর আরবের বিশিষ্ট কবিগণ মক্কায় একত্রিত হতেন এবং তাদের রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা কা‘বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিতেন। হজ্বের সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে দার্শনিকগণ আসতেন এবং যে কবিতা সাবলীল মধুর ও অলংকারিত্ব পেতেন সেগুলোর প্রসংসা করতেন এবং তা মূল্যায়ন ও সম্মান স্বরূপ ক্বা‘বার সাথে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হতো। শিষ্টাচারিতা ও অলংকারিক ক্ষেত্রে যে কবিতা যত মূল্যবান হতো সে অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করে ঝুলিয়ে রাখা হতো। যখন এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার কোন কবিতা আসতো তখন পূর্বের কবিতাটিকে খুলে পরেরটাকে ঝুলানো হতো।

কিন্তু سبع معلقة এর ব্যাপারে বিচারকগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারতে ছিলেন না যে কোনটি রেখে কোনটি নামানো হবে। পরে সর্ব সম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত হলো যে এই সাতটির প্রত্যেকটিই কা'বার সাথে ঝুলানো থাকবে।

এই সাতটি কবিতার সমন্বয়ে লিখিত سبع معلقة গ্রন্থটি। এজন্যই এর নামকরণ করা হয়েছে سبع معلقة বা সাতটি লট্‌কানো কবিতা গুচ্ছ।

রচনা পদ্ধতিঃ

বিশ্বের প্রচলিত প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আরব ভাষা। যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে এই ভাষা সর্বত্র খ্যাতি লাভ করে। আরবী কবিগণের প্রথম স্তর জাহেলী স্তর। আর سبع معلقة জাহেলী স্তরের কবিতা যা ৫১৫ - ৫৩০ খ্রীঃ সময়ের মধ্যে খ্যাতি লাভ করে।

এই সমস্ত কবিতায় মরুভূমির পরিবেশ, লাগামহীন জীবনের ভাব ও অনুভূতির প্রভাব বিস্তার করেছে। নিম্নের চরণ হতে এর প্রমান মিলে। যেমন ঃ

مهفهفة بيضاء غير مضافة
ترائبها مصقولة كالسجنجل[১]

কবি এখানে তার প্রেমিকার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সে চিকন কোমর, পাতলা পেট বিশিষ্ট সুন্দুরী নারী, শরীরের গঠন খুব শক্ত, তার বক্ষ আয়নার মত উজ্জ্বল চমকানো।

বিষয় বস্তুঃ ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) এ গ্রন্থটি নিম্ন লিখিত ১৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যেমন-

১। حمد ونعت প্রশংসা ও গুণকীর্তন।

২। وجه تسمية নাম করণ।

৩। سبع معلقات كى اهميت সাব'য়া মু'য়াল্লাকার গুরুত্ব।

৪। خصوصيات اصحاب معلقات আসহাবে মু'য়াল্লাকার বৈশিষ্ট্য।

৫। طبقات الشعراء কবিদের স্তর।

৬। خداكے نزديك سبعة معلقة كا رتبة আল্লাহ্‌র নিকট সাতটি লট্‌কানো কবিতাগুচ্ছের মর্যাদা।

৭। قران كريم اور سبعة معلقة কুরআনে কারীম এবং সাব'য়া মু'য়াল্লাকাহ্‌।

৮। رسالت رسول الله اور قصائد جاهلية আল্লাহ্‌র রাসূলের রিসালাত ও মূর্খ যুগের কবিতা গুচ্ছ।

---

১. মাওলানা মমতাযউদ্দীন, 'হাল্লুল'উক্বদাহ্ ফীশরহে সাবা'মু'আল্লাকাহ্' এটি চকবাজার, ঢাকা -এর মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী-এর ম্যানেজার ১২ জুলাই, ১৯৪২ খ্রী. প্রকাশ করেন, পৃ.৩৮

৯। علم دین اور سبعة معلقة ধর্মীয় জ্ঞান এবং সাব'য়া মু'য়াল্লাকাহ্।

১০। ایك شبه اور اس کا ازاله একটি সন্দেহ এবং তার নিরসন।

১১। سوانح امرا القیس ইমরুল কায়েসের জীবনী।

১২। فهرست مضامین اور قصیدة امر القیس আলোচ্য সূচী ও ইম্‌রুল কায়েসের কবিতা।

১৩। نادرالو جود چند قواعد অবাস্তব কিছু ঘটনা।

১৪। تقسیم النقوش বৈষকি বিভক্তি।

১৫। ساعات النهار দিনের অতিবাহিত সময়গুলো।

১৬। ساعات اللیل রাতের অতিবাহিত সময়গুলো।

১৭। نبذة من احوال الشارح ব্যাখ্যা কারের জীবন বৃত্তান্ত।

বৈশিষ্ট্য ঃ سبع معلقات এর এমন অনেক বৈশিষ্ট রয়েছে যার কারণে আজও পৃথিবীতে অতুলনীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে এটিকে মূল্যায়ন করা হয়। -যেমন

১। এতে মরু ভূমির পরিবেশ এবং কবি জীবনের ভাব অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

২। বাক্য সমূহ সাজানোর চাকচিক্য, শব্দসমূহ্ প্রকাশের সৌন্দর্যতা দেখার মত।

৩। বর্ণনা পদ্ধতি দূর্লভ, আশা-আখাংকার রহস্য দেখার মত।

৪। তুলনা ও ইশারা ইঙ্গিত বাচক শব্দ সমূহ্ রচনার বৈশিষ্ট্যই আলাদা।

৫। নাহ্ শরফ, ঈলমুল মা'আনী, বয়ান ও বিভিন্ন পারিবারিক শব্দের সমাহার।

৬। মু'য়াল্লাকার লিখকগণ কারো প্রশংসা বা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেননি বরং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যখন যে অবস্থার সম্মুখিন হয়েছেন তখন সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবলীল সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় কবিতার মাধ্যমে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইলমে নাহও ও সরফ এর প্রচলন ছিল না এ সময় কাফেরদের বিষয়ক বিভিন্ন অবস্থায় প্রশ্নের জবাব দেয়া হতো কবিতার মাধ্যমে।

যেমন - আল্লাহর বাণী القیا فی جهنم کل کفار عنید কাফেররা প্রশ্ন করেছিল যে, জান্নামের দারোয়ান একজন কিন্তু এখানে দ্বি-বচন ব্যবহার করা হয়েছে কেন ? এটা ভুল। এই প্রশ্নের উত্তর سبع معلقات এ বইয়ের প্রথম চরণের قفا দ্বারা দেওয়া হয়েছে। যেমন -

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * يسقط اللوای بين الدخول فحومل

অর্থাৎ হে আমার দু'বন্ধু তোমরা থাম আমরা আমার প্রেমিকা ও তার ঘরের স্মরণে একটু কান্নাকাটি করবো। যে ঘর বালুর টিলার প্রবেশ পথে অবস্থিত।

এখানে প্রকৃত পক্ষে ইমরুল কায়েসের সাথী ছিল একজন, কিন্তু তিনি এ চরণের দ্বি-বচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেননা আরবীগণ مخاطب الواحد مخاطبة الاثنين দ্বি-বচন শব্দ দিয়ে একজনকে সম্বোধন করতো। আর এই শব্দ দিয়ে কাফেরদের القيا শব্দের জবাব দেওয়া হচ্ছে।

*** সমালোচনার জবাবঃ**

বর্তমান যুগে অনেকে سبع معلقات -এর ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছে যে, এতে অধিকাংশ প্রেম কাহিনী, মদ, জুয়া খেলা ইত্যাদির কাজ আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এটা পড়া ঠিক হবে না।

তাদের উত্তরে আল্লমা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) তাঁর حل القعدة من المعلقة তে বলেছেন, যে, سبع معلقات -এর কবিগণ জাহেলী যুগের কবি। তাদের কথা বা কাজ আমাদের জন্য দলিল নই। কিন্তু তাদের কবিতা পড়া যাবে না এই দাবী ঠিক না। কেননা কুরআনে যদি ফেরআউন-নমরূদের কাহিনী পড়া যায় তাহলে এই সমস্ত কবিতাও পড়া যাবে। ফেরআউন-নমরুদের কাহিনী থেকে হযরত মূসা ও ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রজ্ঞার কথা প্রমান হয়। এই রূপ কবিতা দ্বারা কুরআনের মু'জিযা ও ব্যাখ্যা প্রকাশ পায়।

নবী পরিচয়

লেখক ঃ মাওলানা মমতাযউদ্দীন
প্রকাশক ঃ মহিউদ্দিন আহমেদ
ছাপাখানা ঃ দি লেমিনেটরস, গেন্ডারিয়া, ঢাকা]
প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৬২
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৯৮
সাইজ ঃ ৮.৫´´- ৫.৫´´
মূল্য ঃ ১৮০ টাকা
প্রকাশনী ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)- এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে রচিত ‘নবী পরিচয়’ গ্রন্থটি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতায উদ্দীন (রহঃ) কর্তৃক রচিত পাঠক সমাদৃত একখানা গ্রন্থ।

এ গ্রন্থে তিনি মহানবী (সঃ)- এর আদর্শ ও কর্মময় জীবনকে সুসংগত যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মহানবী (সঃ)- এর জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে যুক্তির আলোকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যা যে কোন পাঠককেই অনায়াসে আকৃষ্ট করে। গ্রন্থটিতে বিশ্বনবীর পরিচয় স্বার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে এটি একটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীসহ সকল ধর্মের মানুষের কাছে তথ্যপূর্ণ ও সাবলীল গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) এ গ্রন্থটিকে আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি অধ্যায়ে একাধিক শিরোনাম দিয়ে মহানবী (সঃ)- এর ঘটনাবহুল জীবনের সকল আলোচনা স্থান দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থটি এ বিষয়ে লিখিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়েছে।

কোরআন পরিচয়

লেখক	ঃ	মাওলানা মমতাযউদ্দীন
প্রকাশক	ঃ	মহিউদ্দিন আহমেদ
ছাপাখানা	ঃ	দি লেমিনেটরস, গেন্ডারিয়া, ঢাকা]
প্রকাশকাল	ঃ	প্রথম প্রকাশ ১৯৬২
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৯২
সাইজ	ঃ	৮.৫´´- ৫.৫´´
মূল্য	ঃ	১২৫ টাকা
প্রকাশনী	ঃ	ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

পবিত্র কোরআন একটি শ্বাশ্বত গ্রন্থ। এ গ্রন্থ সম্পর্কে জানার আগ্রহ ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই রয়েছে। পবিত্র কোরআন মাজীদ সম্পর্কিত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) বিরচিত কোরআন পরিচয় গ্রন্থে উঠে এসেছে। কোরআন কখন কিভাবে; কোথা থেকে নাযিল হলো, কার প্রতি নাযিল হলো, কিভাবে তা অদ্যাবধি অক্ষত থাকলো, পূর্বে নাযিলকৃত অন্যান্য আসমানী কিতাবের সাথে কোরআন মজীদের সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য কি, স্থায়ী সুরক্ষার ব্যবস্থা কি, অবতরণের নিখুঁত বিবরণ, পাঠরীতি নিয়ে বিভ্রান্তির নিরসন, যতিচিহ্নসমূহের ব্যবহার কিভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সূরাহ, আয়াত, পারা ইত্যাদি বিষয়ে গভীর তথ্যবহুল আলোচনা এ গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে।

আদি মানব থেকে শুরু করে মানবজাতির ক্রমবিকাশ ও তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য মহাগ্রন্থ কোরআন মাজীদে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে, মানব সৃষ্টির মূল রহস্য, নবী-রসূল ও ওলীগণের বিবরণ, আল্লাহ্ প্রেমিক সৎকর্মশীল এবং অসৎ, দাম্ভিক-অহংকারী মানুষদের বিষয়াবলী কিভাবে কোরআন মাজীদে আলোচিত হয়েছে তাও জানা যাবে এ গ্রন্থ পাঠে। এমনকি পাক কোরআন ও বর্তমান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক অত্যন্ত সাবলীলভাবে এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস

লেখক ঃ মাওলানা মমতাযউদ্দীন
প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রব
ছাপাখানা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫৪
সাইজ ঃ ৮.৫˝ - ৫.৫˝
মূল্য ঃ ৫৩ টাকা
প্রকাশনী ঃ ইফাবা প্রকাশনা, ২০৭৮

মাদরাসা-ই-আলিয়া উপমহাদেশের ইতিহাসে এক ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এটি কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয় বরং এক অবিস্মরণীয় আন্দোলনের নাম যা বহতা নদীর মত এখনো প্রবহমান। ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা-ই-আলিয়া ছিল উপ মহাদেশের প্রথম নিয়মিত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বৃটিশ বেনিয়াগোষ্ঠী ১৭৫৭সালে মুসলমানদের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেয় এবং ওয়াকফ ষ্টেটগুলোর আয় থেকে বঞ্চিত করে ইসলামী শিক্ষার প্রাণশক্তিকে নিঃশেষিত করে দেয়। এ সময় শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ)-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য মাওলানা মজদুদ্দীন (রহঃ)- ও তৎকালীন নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সচেতন ও সংগঠিত দাবির মুখে বৃটিশ সরকার মাদরাসা -ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠার সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ছিল রাজ্যহারা মুসলমানদের গভীর হতাশার অন্ধকারে জ্বলে ওঠা হঠাৎ কোন বাতিঘরের মত। ভারতের পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এ আলিয়া মাদরাসাই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সুপ্ত বীজ যা শুভক্ষণে অঙ্কুরিত হয়ে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয় এবং এর বহু শাখা বা কর্মকান্ড আজ বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিস্তৃত।

দু'শতাব্দীর প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বর্ণাঢ্য কর্মগাথায় বিভূষিত হলেও কালস্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে এর প্রকৃত ইতিহাস। ক্রমশ কিংবদন্তির মত কিছু কথা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হচ্ছে। অথচ মাদরাসা-ই-আলিয়ার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসাসিক প্রেক্ষাপট এবং এটি এখন ইসলামী শিক্ষার একটি পদ্ধতির নাম। এ ধারায় বর্তমানে বাংলাদেশে হাজার হাজার মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে এবং এখান থেকে শিক্ষালাভ করে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী সমাজের অসংখ্য উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে অমূল্য অবদান রেখে যাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসকে বাস্তবানুগভাবে উপস্থাপন করেছেন এ দেশের কৃতী আলেম ও সুলেখক, মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতার প্রাক্তন মুহাদ্দিস মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)। ছাত্র জীবন থেকে শিক্ষকতা জীবন মিলিয়ে মাদরাসা-ই-আলিয়ার সাথে সুদীর্ঘ প্রায় ৬৫ বছরের নিবিড় সম্পৃক্ততাসঞ্জাত বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার আলোকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস গ্রন্থটি। এটি আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস তথা জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান প্রামাণ্য দলিল।

বিষয়বস্তু

এ গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মুসলিম শাসনাধীন বাংলাদেশ, পলাশীর যুদ্ধ ও তার প্রতিক্রিয়া, হিন্দুদের অত্যাচার, হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী পুরুষ শহীদ তিতুমীর শীর্ষক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাদরাসা-ই-আলিয়ার পত্তনের গোড়ার কথা, বিধর্মীদের অর্থে ধর্ম শিক্ষায় আলিমগণের মতবিরোধ, ইংরেজ সরকারের নতুন ব্যবস্থা ও মাদ্রাসা মহাল দ্বারা বিরোধের অবসান, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সংখ্যার তারতম্য, মাদরাসা-ই-আলিয়ার প্রিন্সিপাল, হেড মাওলানা, খ্যাতিমান ওস্তাদ ও কৃতী ছাত্রদেও জীবন চরিত, মাদরাসা-ই-আলিয়ার পাঠ্য তালিকা, শ্রেণী বন্টন, মাদরাসা-ই-আলিয়ার গৌরবময় মর্যাদা শীর্ষক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মাদরাসা-ই-আলিয়া বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ও মাতৃভাষা বাংলা, কওমী মাদরাসা ও বাংলা ভাষা, সমাজ সেবায় মাতৃভাষা, পাকিস্তান আমলে বাংলা শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষাকে দোষমুক্ত করার সহজ উপায় এবং সবশেষে লেখক পরিচিতি শীর্ষক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

পরীবাগের শাহ্ সাহেবের জীবনী

লেখক	ঃ	মাওলানা মমতাযউদ্দীন
প্রকাশক	ঃ	কে. এ চৌধুরী
ছাপাখানা	ঃ	কথাকলি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
প্রকাশকাল	ঃ	প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৬৩ ।
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৯২
সাইজ	ঃ	৮.৫´´- ৫.৫´´
মূল্য	ঃ	৬০ টাকা
প্রকাশনী	ঃ	চৌধুরী পাবলিশার্স

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর আরেকটি অনবদ্য সৃষ্টি কর্ম হচ্ছে পরিবাগের শাহ্ সাহেবের জীবনী গ্রন্থটি । এটি একটি মৌলিক ও জীবনী মূলক গ্রন্থ । এ গ্রন্থটি তিনি তাঁর শায়খ শাহ্ সৈয়দ আবদুর রহিম (ওরফে পরীবাগের শাহ সাহেব নামে খ্যাত) (রহঃ)-এর জীবন চরিতের উপর রচনা করেন । যা সাধারণ মানুষের আমলী যিন্দেগিতে অতি প্রয়োজনীয় । মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) পরীবাগের পীর হযরত শাহ সৈয়দ আবদুর রহীমের সান্নিধ্যে শেষ জীবনের দীর্ঘ একযুগ সময় কাটান । শাহ সাহেবের আচার-আচরন, জীবন-যাপন পদ্ধতি, শরীয়ত ও তরিকতে তাঁর স্থান, পরিবার ও সমাজের লোকদের সাথে তাঁর মেলামেশা, যিকির আযকার, নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ পালন ও ধ্যান-ধারনা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁর মুরশিদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এ গ্রন্থটি রচনা করেন । বইটিকে তিনি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি অধ্যায়ে কয়েকটি শিরোনাম দিয়েছেন । যেমন- প্রথম অধ্যায়ে পীর আবদুর রহিমের বংশ পরিচয়, মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর সাথে তাঁর প্রথম দর্শন, হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (রহঃ)-এর সাথে তাঁর যোগাযোগ, পীর সাহেবের যাহেরী শরী'য়ত পালন ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইলমে মা'য়ারিফাতের পরিচয়, মা'য়ারেফাতের ক্ষেত্রে ওলীদের শ্রেণী বিভাজন, মা'য়ারিফাতের আদিকথা ইত্যাদি বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন । তৃতীয় অধ্যায়ে শাহ সাহেবের তরীকার অযীফা, তাঁর স্বভাব-চরিত্র, দৈনিক কর্মকান্ড, জনসেবা ও তাঁর কুতুব হওয়ার প্রমাণ বর্ণনা করেছেন । চতুর্থ অধ্যায়ে শরীয়তে কবর যিয়ারতের পদ্ধতি, যিয়ারতের উত্তম সময় ও কবর যিয়রতের সুফল ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তুলে ধরে পাঠক সমাজের অভাবনীয় মনে খোরাক যুগিয়েছেন । সর্বোপরি এ বইটিতে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষক শাহ্ আবদুর রহিম (রহঃ) এর জীবন কর্মকে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত

ড.এম. আব্দুল্লাহ[১]

শিক্ষক হিসেবে বলা যায় তিনি সফল। তাঁর জ্ঞান-গভীরততার কারণে মেধাবী ছাত্রগণ বেশী উপকৃত হতেন। এ জ্ঞান-গভীরতার কারণে তিনি আলোচ্য বিষয় অতিক্রম করে আলোচনা দীর্ঘ করতেন এতে ভাল ছাত্র বেশী উপকৃত হতেন। তিনি আমার শিক্ষক। ছাত্রদের প্রতি তাঁর আচরণ খুবই ভাল ছিল। একজন হিসেবে আমি কোন বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করতে চাইলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আলাপ করতেন এবং যতদূর সম্ভব তাঁর একটা সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতামূলক মনোভাব ছিল। অপরকে সাহায্য করার জন্য তাঁর অনুভূতি ছিল। তিনি কোনদিন রাগারাগি করতেন না, কাউকে কোনদিন গালমন্দ করতেন না। যতটুকু সম্ভব তিনি আভ্যন্তরীন সমস্যা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতেন।

তিনি কলকাতার সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। তিনি ফিক্‌হ, হাদীস, সহীহ্ আল-মুসলিম ও উর্দূ সাহিত্য পড়াতেন। ছাত্রদের প্রতি তিনি খুব দয়াবান ছিলেন। তাঁদের সাথে তিনি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি খুব একাগ্রচিত্ত ছিলেন। তাঁর বাসগৃহে কোন ছাত্র কিতাবের পড়া বুঝার জন্য গেলে তিনি এতে খুশি হতেন। তিনি অতিথিকে নিজ হাতে আপ্যায়িত করতেন।

তিনি খুব নরম তবিয়্যতের লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তিনি পাঠদানে খুবই উদার ছিলেন। তাঁর শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার ছিল খুব বেশি। পাঠালোচনায় তিনি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারনা করতেন না। তবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বোঝাবার জন্য প্রয়োজনীয় উদাহরণ ও দীর্ঘ বিষয়ের অবতারনা করতেন। এতে তাঁর জ্ঞান-গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যেত। তিনি মাঝে মাঝে পরিবাগ মসজিদে জুম'আর খুতবা দিতেন। তাঁর খুতবায় সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যেত। খুৎবাসমুহ ছিল সময়োপযোগী। তিনি যুগসচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পত্র-পত্রিকা পড়তেন। যেমন মাসিক আল-মদিনা পত্রিকা পড়তেন। দেওবন্দী উলামার প্রতি তিনি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব পোষন করতেন।

---

[১] প্রফেসর, উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন।

দেশ ও রাষ্ট্রীয় কোন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি কোন ফাত্ওয়া দিয়েছেন কিনা তাও আমার জানা নেই। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর নিকট ফাতওয়া চেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। আমি যতটুকু জানি তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখতেন না। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে তার যোগাযোগও ছিলনা। ছাত্রদেরকে এ প্রসঙ্গে তিনি কোন প্রকার উৎসাহ উদ্দীপনাও দিতেন না। তিনি উর্দূ ভাষায় পাঠদান করতেন। তবে, হাদীসের ব্যাখ্যা করার সময় কখনো কখনো আরবী বলতেন।

তিনি দেশে গঠিত কোন শিক্ষা কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা দেশের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য করেছেন কিনা আমি জানিনা। সাক্ষাৎপ্রার্থী ও অভ্যাগতদের সাথে তিনি অমায়িক ব্যবহার করতেন। তিনি কোন কোন ফাংশনেও দাওয়াত গ্রহণ করতেন। খতমে কুরআন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেমন-জানাযায় অংশ গ্রহণ করে তিনি কোন প্রকার হাদিয়া বা বিনিময় গ্রহণ করতেন না। কিন্তু কেউ স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে নিষেধ করতেন না।

তাঁর যুহুদ ও তাক্ওয়ার শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হলো এই যে, তিনি খুব পরহিযগার ব্যক্তি ছিলেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি একজন বড় মাপের সুফী ছিলেন। তিনি পেশাজীবী পীর-মুর্শিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন নিরেট শিক্ষক। অপরাপর শিক্ষক অপেক্ষা তাঁর মাঝে জ্ঞানাহরণ ও জ্ঞান বিতরন প্রবনতা বেশি ছিল। তাঁর মত শিক্ষাদানে এতো আগ্রহী শিক্ষক আমি আর কখনো দেখিনি। আমরা তাঁকে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি।

তিনি একজন উচ্চাঙ্গের মুহাদ্দিস ছিলেন। সারা জীবন হাদীস পড়িয়েছেন। তাঁর মোটামুটি অবদান ছিল হাদীস, ফিক্হ ও উসূল, বালাগাতনাহু, সরফ ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে। তবে ফিক্হ ও হাদীসে তাঁর যথেষ্ট গবেষণামূলক কর্ম আছে। তাঁর গ্রন্থাগারে অগণিত দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। তিনি দেশ-বিদেশের পত্রিকায় কোন লেখা-লেখি করতেন কিনা তা আমার জানা নেই। তাঁর মাঝে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা করতেন। তাঁর সময়নিষ্ঠা ও গবেষণা প্রবণতা অনুপম আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তিনি বৈষয়িক ও বাস্তববাদী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদান স্পৃহা ছিল আদর্শস্থানীয় তিনি ছিলেন নিরেট হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

মাওলানা সালিম ওয়াহিদী

প্রশ্ন ঃ মাওলানা মমতায উদ্দীন (রঃ) আপনার কি হয়?

উত্তর ঃ তিনি আমার একনিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ তাঁর ইন্তিকালের পর তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ব্যক্তি অথবা সরকারী উদ্যোগে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি?

উত্তর ঃ না, এমন কিছু হয়নি। তবে আলিয়া মাদরাসা একবার একটি স্মরণ সভা করেছিল। পরবর্তী সময় তাঁর স্মরণে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল জাতীয় প্রেসক্লাবে। তথায় তাঁর পুত্র ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ প্রধান অতিথি ছিলেন। ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা সালেম ওয়াহিদী, ডঃ এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরীসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান প্রমুখ দেশ বরেণ্য উলামা উক্ত সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। হুযুরের জীবন ও অবদানের ওপর একটি প্রবন্ধ ও পাঠ করা হয়।

তিনি শেষ রাতে শয্যা ত্যাগ কওে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। অতঃপর ফযরের নামায পরিবাগ মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। নামায শেষে রমনা পার্কে প্রাতঃ ভ্রমন করতেন নিয়মিত। জামা'আতে শরীক হতেন। নামায সমাপ্তির পর নিজ বিশেষ কক্ষে প্রবেশ করতেন। তথায় তাসবীহ-তাহলীল এবং তিলাওয়াতে কালামে পাক ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করতেন। সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করতেন। ইশরাক পর্যন্ত এরূপ করতেন। অতঃপর ইশরাক আদায় কওে বিশ্রাম কক্ষে কিছু সময় বিশ্রাম নিতেন। তারপর প্রাতরাশ করতেন।

তাঁর নাস্তা ছিল সাধারণত, রুটি, গোস্ত, মুরগীর গোস্ত, ডিম কম পরিমাণ খাসির গোস্ত, সকালে রুটি, দুপুরে ভাত এবং রাতে রুটি, সাঁঝের বেলা নাস্তার কোন বাধ্যবাধকতা ছিলনা। তবে চা চলত। পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। নাস্তার পর এক ঘন্টা সময় ভালভাবে ঘুমাবার চেষ্টা করতেন। নিদ্রা ত্যাগ করে ওযূ সমাপন কওে সালাতুত দোহা পড়তেন। অতঃপর বিশেষ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করতেন ও সাড়ে নয়টা পর্যন্টত লেখা্ পড়ায় আত্মনিয়োগ করতেন। এ সময় তিনি কুরআন তিলওয়াত করতেন। এর পর তিনি কিছু ওযিফা কালামও পড়তেন।

অতঃপর সাড়ে নয়টা হতে দশটার কাছাকাছি সময় মা্দ্রাসায় চলে যেতেন। মাদরাসা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সাক্ষাৎপ্রার্থীদেরকে

সাক্ষাৎ দিতেন। কোন সময় হাদীস ও তাফসীর অধ্যয়ন করতেন। কিছু লিখতেন। যুহর নামায সমাপ্তির পর ঘরে ফিরে এসে মাধ্যাহ্ন ভোজে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি জীবনে কখনো বাম পাশে শোননি। অতঃপর তিনটার দিকে শয্যা ত্যাগ করতেন। সাড়ে তিনটার দিকে পাঠকক্ষে প্রবেশ কওে পুস্তক অধ্যয়ন ও লিখায় মনোনিবেশ করতেন। আসর পর্যন্ত এরূপ করতেন। আসর নামায সমাপন কওে পুণরায় পাঠকক্ষে ফিরে আসতেন এবং দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দিতেন ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহন করতেন। কোন সময় তাফসীর করতেন। মাগরিবের পর সকাল বেলা ও আসরের পর এ তিন সময় সাক্ষাৎ প্রার্থীদেরকে সাক্ষাৎ দিতেন। ইশার পর শয্যাগ্রহণ করতেন। তিনি সচরাচর রাত দশটার মাঝেই শয্যা গ্রহণ করতেন। তাঁর দরবারে আলিম উলামা, আধুনিক শিক্ষিত, সাধারণ সকল পর্যায়ের লোকদের আগমন ঘটত।

প্রশ্ন ঃ তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যবর্গ কারা?

উত্তর ঃ তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মাঝে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, লোকমান আহমদ আমীমী, ড. আব্দুল গফুর, ড. সাইয়িদ লুৎফুল হক সাহেব, ড.এ.কে.এম. আইয়ুব আলী, ড. এ.বি.এ. হাবীবুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও পন্ডিতবর্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ তাঁর কাশফ ও কারামতের প্রমান সাপেক্ষ কিছু ঘটনার উল্লেখ করুন।

উত্তর ঃ তিনি সাহেবে কাশফ ছিলেন। বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী তাঁর কাশফ প্রকাশ পেত, তবে তিনি কখনো তা দাবী করেননি। তিনি আপাদমস্তক নবী করিম (সঃ) -এর সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর সর্বোত্তম কারামাতের প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা এমন কতিপয় বিষয় মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেত যা তাঁর কাশফের প্রমান বহন করে।

প্রশ্ন ঃ তাঁর খুতবার বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

উত্তর ঃ তিনি খুতবা গতানুগতিক দিতেন না। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুতবা দিতেন।

প্রশ্ন ঃ তিনি কোন ধরনের সভা সমিতিতে যোগদান করতেন?

উত্তর ঃ ধর্মীয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনামূলক সভা সমিতিতে তিনি যোগদান করতেন।

মাওলানা নুর মুহাম্মদ

১৯৪৮ সাল হতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আমি মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় অধ্যয়ন করার সময় মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)- এর ছাত্র ছিলাম। তাঁকে মাদরাসায় তাঁর কুতুবখানায় গবেষণায়রতাবস্থায়, মানুষের সাথে তাঁর মেলামেশার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন মাহফিলে যাতায়াত, পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই।

আমি ইতিহাস থেকে যতদূর জেনেছি তাহলো তিনি খেযেরী তরীকার অনুসারী সূফীসাধক ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র সূফীতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না বরং অতি কঠোরভাবে এ তত্ত্বের ওপর সাধনাও করতেন। তিনি একজন বুযুর্গ পীর ছিলেন। তবে, কোন পেশাদার পীর ছিলেন না। এ ধরনের কোন মনোবৃত্তিও তাঁর মাঝে কখনো দেখা যায়নি। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় উদাহারণ হলো এই যে, তিনি কারো নিকট হতে কর্জ গ্রহণ করেন নি। কেউ তাঁর কাছে কর্জ চাইতে আসলে তিনি তাঁকে কিছু দান করে দিতেন। তিনি প্রায়শ বলতেন, কর্জ দিলে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যেতে পারে। তিনি ওযূ ব্যতীত হাদীসের ক্লাসে যেতেন না। রাসূলকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ তিনি ঠিক সেভাবে হাদীসকে ইয্‌যত করতেন। তিনি বর্তমান যুগের চাহিদানূযায়ী মনোরম ব্যাখ্যা সহকাওে হাদীসের দরস দিতেন। তাঁর সমকালীন যুগে তিনিই অনেক বেশি কিতাবের খোঁজ রাখতেন। কোন কিতাব পড়াবার সময় তিনি অগণিত গ্রন্থেও উদ্ধৃতি দিতেন। অযথা বাক্য ব্যয় করে বৃথা সময় নষ্ট করা তিনি অপছন্দ করতেন। মহানবী (সাঃ)-এর ক্ষুদ্র একটি সুন্নাতও তিনি পরিহার করেননি। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গেও ডাকে সাড়া দিতেন না। তিনি ছিলেন পার্থিব লোভ-লালসার বহু উর্দ্ধে।

আমার জানামতে তিনি মাঝে মাঝে কায়েতটুলি মসজিদ ও পরিবাগের মসজিদে নামায পড়াতেন। অবস্থা ও সময়ের চাহিদানুযায়ী তিনি সুন্দর আরবী ভাষায় খুতবা দিতেন। তিনি আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে খুতবা প্রদান করতেন। তাঁর খুতবা শোনার জন্য অনেক লোক নামায পড়তে আসতেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব স্বভাব রয়েছে। তিনি তাঁর জীবনকে ইলম হাদীস, ইলম ফিক্‌হ এবং সূফীবাদে উৎসর্গ করেন। যদি তিনি

রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হন তাহলে উক্ত বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারতেন না। তাই তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত হননি। এমনকি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করাও তিনি অপছন্দ করতেন।

তিনি সদালাপী ও শান্ত মেযাযের অধিকারী ছিলেন। উগ্রতা প্রদর্শন ও অপরের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞান বিতরণ করা তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। পার্থিব কোন লোভ-লালসায় তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন না, তিনি আত্ম প্রচারিবিমুখ ছিলেন। নিজেকে সূফী অথবা পীর ফকীর এ জাতীয় ভাব প্রদর্শন হতে দূরে রাখতেন। কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ প্রবণতা তাঁর ছিলনা। তিনি স্বল্পভাষী ও উদারমনা ছিলেন। তিনি বলতেন, ইসলামে লেবাসের কোন সুনির্দিষ্ট কথা নেই। যেমন আমি যেভাবে লেবাস পরি ঠিক সেভাবে লেবাস পড়তে হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই। চুল কি রকম কাটতে হবে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলতেন যেরূপ কাটলে ব্যক্তির সৌন্দয্য ফুটে ওঠে সেরূপ কাটবে। এজন্য তাঁকে সে সময়কার সূফী মতাবলম্বীগণ বলতেন, তিনি শরী'আর ব্যাপারে খুবই শিথিল।

তাঁকে দেখতে লম্বা মনে হতো। তাঁর কাদ ছিল মাঝারি, গোলগাল চেহারা অবিকল পূর্ণিমার চাঁদের মত। শব্দ করে না হেসে বরং মুচকি হাসতেন। তাঁর নাসিকা একটু চ্যাপ্টা ছিল, তাঁর দাত ছিল চিকন । তিনি পান খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। হাদীসের দরস দেওয়ার সময় কুলকুচ্য করে নিতেন।

তাঁর লাইব্রেরীতে অনেক দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। কোন মতে পয়সা হাতে আসলেই তিনি কিতাব ক্রয় করতেন। কেউ কোন দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ দান করলে তিনি এটাকে বিরাট অবদান বলে স্বীকৃতি দিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে এমন ধরনের কিতাব সংগৃহীত ছিল যা মাদ্‌রাসা আলিয়ার লাইব্রেরীতেও ছিলনা। তাঁর হস্তাক্ষর খুবই সুন্দর ছিল। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। তাঁর মত রাসূলের আদর্শেও ওপর প্রতিষ্ঠিত চলনে বলনে, আচার-আচরণে ও মুখায়বে ইলমে হাদীসের একজন শায়খ আমি এ যুগে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শ্রুত হয়ে আমি এতো চিৎকার করে কেঁদেছি যেন আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

১৯৫২ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। তিনি খুবই ভদ্র, নম্র, শান্ত ও মেধাবী ছিলেন।

তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকগণ হলেনঃ আব্দুল হক হাক্কানী, মাওলানা নাযের হাসান দেওবন্দী, সাইয়িদ ওয়াসীউদ্দীন। তাঁর জীবনের ওপর হাদীসের ক্ষেত্রে শামসুল উলামা বিলায়েত হোসাইন এবং হিকমাতের ক্ষেত্রে মাওলানা নাযির উদ্দীনের বেশি প্রভাব ছিল। তিনি অনেক সফল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এমনকি তিনি আমার অপেক্ষাও অধিকতর বিজ্ঞজন। আমি তাঁর জীবনে ব্যর্থতা দেখিনি।

সহকর্মী ও ছাত্র সবার সাথে (আচার-আচরণে) ভাল ব্যবহার করতেন। কর্তৃপক্ষ ও উর্দ্ধতনের সাথে অত্যন্ত অনুগত ও ভাল ব্যবহার করতেন। তিনি জীবনে কখনো ক্লাস কামাই করেননি। শিক্ষক জীবনে তিনি সবার সম্মান কুড়িয়েছেন। তাঁর শ্রেণীকক্ষে জ্ঞান পিপাসুদের ভীড়জমে যেত। তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করে দূর্বোধ্য ও কঠিন বিষয় সহজবোধ্য করে দিতেন।

তিনি খুব সময়ানুবর্তী ছিলেন। সময় পেলেই গ্রন্থ পাঠ ও গ্রন্থ প্রণয়নে আত্ম নিয়োগ করতেন। পাঠদানে খুব উদার ছিলেন। পাঠদানের সময় প্রসঙ্গান্তর ঘটাতেন না। কোন বিষয় বুঝাতে গিয়ে উদাহরণত কিছু অতিরিক্ত বক্তব্য রাখতেন। এতে পাঠদানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হত না বরং বিষয়টি আরো খোলাসা ও স্পষ্ট হতো।

পারিবারিক সদস্য ও আত্মীয় স্বজনের সাথে তিনি খুব ভাল ব্যবহার করতেন। ওয়াজ মাহফিল ও মিলাদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন তবে কখনো সভাপতিত্ব করেননি। তাঁর যুহুদ ও তাক্‌ওয়া ভাল ছিল।

তাফসীরের ওপর তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ নেই। তিনি তাফসীরের ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনা ও পূর্ববর্তী আলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করতেন।

তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বহু কিতাব, প্রায় দু'হতে আড়াই হাজার গ্রন্থ মওজুদ ছিল। তন্মধ্যে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও আছে। তিনি এসব গ্রন্থের প্রতি বেশ যত্নবান ছিলেন। সময় নির্বাচন করে এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থ দেশ-বিদেশে খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথা বলতেন। সময়ানুবর্তী ছিলেন। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলেন না। এ বিষয়ে কোন প্রকার আগ্রহও পোষণ করতেন না। একজন বাস্তব ব্যক্তি ছিলেন। ঋণ গ্রহণ করতেন না। প্রয়োজনে দান-সাদকা করতেন। সদুপদেশ দিতেন।

জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরনে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের নেপথ্যে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য সক্রিয় ছিল। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ও নিয়মানুবর্তী ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁকে একজন অন্তরঙ্গ ও হৃদয়বান শিক্ষক ও ভাই পেয়েছিলাম। মনে হত যেন আমি তাঁর পরিবারেরই একজন সদস্য। তাঁর বাসায় গেলে তিনি আমাকে খুব আদর-আপ্যায়ন করতেন।

মাওলানা ওবায়দুল হক

ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় মাওলানা মমতাযউদ্দীন আমার সহকর্মী ছিলেন। চকবাজার ইসলামী পুস্তকের কেন্দ্র। এখানে চক বাজার এমদাদিয়া লাইব্রেরী, হামিদিয়া লাইব্রেরীসহ প্রসিদ্ধ কিতাব ব্যবসায়ীদেও সমাবেশ। তিনি একজন ওয়ালী ছিলেন। দেখলেই মুহাব্বতের ভাব মনে জাগে। আমার মত ঢোলা-ঢালা জামা পরতেন। সুন্দর, সুগঠিত এবং উঁচু লম্বা ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। সময় সময় বাবরি চুল রাখতেন। শারীরিক দিক দিয়ে তাঁকে ভারী দেখা যেত। কিন্তু কাজে কর্মে প্রয়োজনে ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত তৎপর ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন। তাঁর গায়ের রং লালচে ছিল। আরবদেও বর্ণের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। নাসিকা খুব উন্নত ধরা যেত না। চলাফেরার সময় খুব তড়িৎ ও সোজা ঋজুভাবে চলতেন। দেখলে মনে হত খুব বাহাদুর এবং তাঁর মাঝে জওয়ানী ভাবটা ফুটে ওঠতো। কথোপকথন সাধারণত উচ্চ ও স্বাভাবিক ছিল। ক্লাসে তাকরীর করার সময় উচ্চ কণ্ঠে বলতেন। খুব যাওক-শাওক ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণত হাসি-তামাশা ইত্যাদি করতেন না, তবে তাকাল্লুফী বা গাম্ভীর্যতা দেখাতেন না খুব হাসি-খুশি থাকতেন। পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে পান খেতেন। চা পান করারও অভ্যাস ছিল। যে কেউ সাক্ষাৎ করলে তাকে অবশ্যই চা পান করাতেন ও নিজেও তার সাথে এক কাপ পান করতেন।

১৯৫০ সনে যখন আলিয়া মাদ্‌রাসায় আমি যোগদান করি তখনও তিনি লেকচারার পদে হাদীস গ্রুফ এবং ফিক্‌হ গ্রুফে মুসলিম শরীফ এবং অন্যান্য কিতাব পড়াতেন। আমিও একজন জুনিয়র সহকর্মী হিসেবে তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাই। তিনি বড় হাসিমুখ ও শারীফুতবা ছিলেন। কারো উপর নারায হলেও বাহ্যিকভাবে তা প্রকাশ করতেন না। আর ধৈর্য্যেও সাথে তিনি তা হজম করে নিতেন। তাঁর অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। জানতে পারলাম যে, তিনি বাল্য জীবন থেকে মেধাবী ছিলেন। উর্দূ পরিবারের বিষয় ছিল। শুধু দারসের এবং নিসাবের কিতাবাদির ওপর কানাআত করেন নি বরং অতিরিক্ত জ্ঞান হাসিল করার জন্য বিশেষ বিশেষ উস্তাদেও সান্নিধ্যে তিনি যাতায়াত করেছেন এবং ফায়দা ওঠাবার বে-নযীর চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে দু'জন শিক্ষকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা ইয়াহইয়াহ সাহসারামী, তাঁর কাছে প্রাইভেটভাবে ফিক্‌হ ও হাদীসে উপকৃত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত মাওলানা নাযের হাসান দেওবন্দী (রহঃ)- তাঁর দ্বারাও ক্লাসে যেমন তিনি উপকৃত হয়েছেন অতিরিক্ত সময়। আর বিভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান হাসিল করেন তার কাছে।

প্রাচীন ধর্মীয় জ্ঞানের দিক দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যা সাধারণত আলিয়া মাদ্‌রাসার ছাত্রদের মাঝে খুব কমই পাওয়া যায়। তার পরে উক্ত বিষয়াবলী নিয়ে তিনি আরও পরিশ্রম করেন, হাদীস-ফিক্‌হতো আছেই। এর সাথে ইলমে হ্‌ইয়াত, ফালসাফা মানতিক এগুলোর সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

তিনি আমাদের যুগের শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ ছিলেন। তিনি তো আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ জাতীয় ধর্মাভিজ্ঞ আলিম ও আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর তিরোধানের ফলে দেশ একজন বড় আলিমকে হারাল। প্রবাদ আছে আলিমের মৃত্যু জনপদেও মৃত্যু সদৃশ।

তাঁকে হারিয়ে আমি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সে ক্ষতি আর পূরণ হবার নয়। আমি তাঁর আখেরাতে মুক্তি ও বুলন্দ দরজা কামনা করি।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানগণের চরম দুর্দিনে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা স্থাপিত হয়। এ মাদরাসা এক সময় ভারতীয় মুসলমানগণকে ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে। এটি ছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাকে কেন্দ্র করে এদেশীয় মুসলমানগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় তৎপরতা স্ফুরিত হয়। এ কারণে মাদরাসাটি মুসলিম সমাজের মুখবন্ধ হিসেবে চিহ্নিত। এ মাদরাসায় নিজ প্রতিভা ও অধ্যবসায় সময় সময় বহু কীর্তিমান ও প্রথিতযশা পুরুষ সৃষ্টি হয়েছেন। ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) তন্মধ্যে অন্যতম একজন কৃতিপুরুষ। তাঁর জন্মকালে এ উপমহাদেশে মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা বড় করুণ ও সংকটে নিপতিত ছিল। এ সময় সমাজের ধর্মীয় দিক কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির পংকিলে নিমজ্জিত ছিল। এ দুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্য তৎকালীন সমাজ সচেতন দূরদর্শী ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসের শিক্ষা সার্বজনীন করে তদানুযায়ী আমল করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসের শিক্ষা ব্যাপক ও সার্বজনীন করা সম্ভবপর হলে এর মাধ্যমে কুসংস্কারের পংকিলতা হতে সমাজকে উদ্ধার করা যাবে। এ প্রবল আত্ম প্রত্যয় ও দৃঢ় সংকল্পের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে বিংশ শতাব্দীতে অনেক আলিমকে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে দেখা যায়। এঁদের সবার লক্ষ্য ছিল নিজ সম্প্রদায়কে নির্ভেজাল ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাঁরা কেউ গ্রন্থ প্রণয়ন, কেউ অধ্যাপনা, কেউ খুৎবাদান, কেউ ফাত্ওয়া চর্চা, কেউ সাংবাদিকতা, কেউ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কেউ আধ্যাত্মিক দীক্ষা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এসব কর্ম তৎপরতার মাঝে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের শিক্ষা সম্প্রসারণ তথা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিঃসন্দেহে অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। কেননা শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর মুসলিম জাতির মেরুদণ্ড ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

যিনি দ্বীনি ইল্‌মে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী তিনিই আলিম। অবশ্য আমলের দিক দিয়েও তাঁকে আদর্শস্থানীয় হতে হবে। তিনি শুধু নিজের উপকার ও উন্নতির কথা চিন্তা করবেন না তিনি মানুষের কথা ভাববেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাবেন। এ ধরণের আলিম সম্পর্কে আল-কুরআনুল কামীমে এরশাদ হয়েছে-"নিশ্চয় বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলিমগণই আল্লাহ তা'আলাকে সঠিকভাবে ভয় করেন।" মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেন-"আবেদ-এর উপর আলিমের ফযিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) তেমনি যেমন-তোমাদের মধ্যে একজন নিম্নস্তরের ব্যক্তির তুলনায় আমার ফযিলত।" (মিশকাত, কিতাবুল ইল্‌ম)।

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ) একজন সত্যনিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এবং আমল ও আখলাকে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁর মহৎ জীবনের ইতিবৃত্ত সঠিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা অতি কঠিন কাজ। তবুও আমার স্বল্প জ্ঞান দিয়েই আমি এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছি, এই ভেবে যে, আমার আলোচনার দ্বারা পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন এবং তাঁর শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হবেন। তদুপরি এ মহান আলিমের জীবনী সর্বোতভাবে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি দুনিয়াতে এখন নেই, কিন্তু তাঁর বহুকীর্তি এদেশের নানাস্তানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এগুলো দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। সর্বোপরি তিনি কিছু মানুষ গড়ার কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁর অনুসারীগণ, তাঁর সান্নিধ্যে এসে মহান আল্লাহর সত্যিকারের বান্দায় পরিণত হয়েছেন। আমি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শ ও কীর্তি-কলাপের একটি সঠিক তথ্য যথাসম্ভব নির্ভুল সূত্র হতে আহরণ করে উক্ত অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার এই যৎকিঞ্চিৎ গবেষণা কর্ম হয়ত আশা করা যায় আরো জ্ঞানী গুণীদের এ কাজে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা মমতাযউদ্দীন, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ। (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৯৬-১০৩।

২। জুলফিকার আহমদ কিসমতি, মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, বাংলাদেশ সংগ্রামী উলামা ও পীর মাশায়েখ। (ঢাকা, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮) পৃ. ২০৭-২১৮।

৩। আব্দুল ওহাব, এম.এঃ হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (র.)। (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯)

৪। আযীযুর রহমান মল্লিক ঃ বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান। (ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৮২)।

৫। আযীযুল হক ঃ বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা। (ঢাকা, ১৯৮৫)।

৬। আব্দুর রহীম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)। (ঢাকা, ১৯৬৯)।

৭। আমীন উল্লাহ ঃ মুসলিম আমলে বঙ্গ-ভারত ও পাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থা। (ঢাকা, ১৯৬৯)।

৮। ওয়াকিল আহমদ ঃ বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী। (ঢাকা, বা/এ, ১৯৮২)।

৯। কে.আলী ঃ মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস। (ঢাকা, আলী পাবঃ ১৯৯০)।

১০। জুলফিকার আহমদ কিসমতী ঃ বাংলাদেশের সংগ্রামী উলামা ও পীর মাশায়েখ। (ঢাকা, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮)।

১১। মাওলানা মুশতাক আহমদঃ তাহরীকে দেওবন্দ । (ঢাকা; ই,ফা, ১৯৮৩) ১ম সংস্করন।

১২। শাহেদ আলী (সম্পাদক) ঃ ইসলামে চিন্তার বিকাশ। (ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী, ১৯৭৪)।

১৩। রশীদুল আলম ঃ মুসলিম দর্শনের ভূমিকা। (বগুড়া, সাহিত্য কুটির, ১৯৭০)।

১৪। বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২

১৫। পাকিস্তান শাসনতন্ত্র ১৯৫৬

১৬। আবুল হাসানাৎ নদবী ঃ উপমহাদেশে প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র (অনুঃ সম্পাঃ)। ইসলামিক ফাউঃ পত্রিকা, (ঢাকা, ইঃ ফাঃ ১৯৮৭ জুলাই-সেপ্টেম্বও হতে ১৯৮৮ এর এপ্রিল-জুন পর্যন্ত ধারাবাহিক)।

১৭। আকরাম খাঁ ঃ মুসলেম বঙ্গেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি (সম্পাঃ)। মাসিক মোহাম্মদী, (কলকাতা, ১৩৪৩-আশ্বিন)।

১৮। মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (সম্পাঃ)। মাসিক মোহাম্মদী, (কলকাতা ১৩৫৮ বাংলা বৈশাখ)।

১৯। আবুল আসাদঃ উপমহাদেশের সিপাহী বিপ্লবোত্তর রাজনীতি। দৈনিক সংগ্রাম, (ঢাকা, ১৭/১/৯৩) বিশেষ ক্রোড়পত্র।

২০। আব্দুল কুদ্দুস ঃ বাংলার ওল্ড স্কীম মাদরাসার অবস্থা। মাসিক মোহাম্মদী (কলকাতা, ১৩৪৮ বাং- কার্ত্তিক)।

২১। আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ঃ বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস। মাসিক মোহাম্মদী। (কলকাতা, ১৩৬৪ বাং-ভাত্র)।

২২। আহমদ হাসান দানী ঃ বঙ্গদেশের সহিত মুসলমানদের যোগাযোগ। মাসিক মোহাম্মদী (কলকাতা, ১৩৫৯ বাং-কার্তিক, অগ্রহায়ন)।

২৩। এ.বি.এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী ঃ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদরাসা আলিয়া অতীত ও বর্তমান, (ঢাকা; মা.আ, শতবর্ষ উদযাপন কমিটি, ১৯৮১)।

২৪। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ঃ মুসলিম ও বৃটিশ যুগে উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, (ঢাকা, ১৯৮৫)।

২৫। ওয়াকিল আহমদ ঃ কলকাতা আলিয়া মাদরাসা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা। বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৭ বাং) ৯ম সংস্করণ।

২৬। মুহাম্মদ শফীউল আযম ঃ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ মৌলিক গলদ। দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা ২৪/১/৯৩।

২৭। ইসলামী শিক্ষা সংকলন, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৭।

২৮। ইসলামী শিক্ষা সেমিনার-৭৮। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

২৯। মাসিক পৃথিবী। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯০-১৯৯১।

৩০। নবনূর। কলকাতা, ১৩২২ বাং-আষাঢ়।

৩১। J. Milton Cowan (edt) : A dictionary of modern Arabic Writings. (New York: Spoken Language Services, 1976).

৩২। A New Survey of Universal Knowledge-Encyclopaedia, (London).

৩৩। Dr. Sayyed Mohammad Ishaq: Indias Contribution to the study of Hadith Literature. (Dhaka: Dhaka University, 1955).

৩৪। Dr. Sekander Ali Ibrahimi: Report on Islamic Education and Madrasha Education in Bengal. (Dhaka Islamic Foundation, 1985).

৩৫। G. Allana (edt) : Pakistan Movement Historic Documents, Karachi, 1968.

৩৬। K. Fazle Rabbi: The Origin of the Musalmans of Bengal. (Calcutta, 1985).

৩৭। M. Aziz al-Haq: History and Problems of Muslim Education in Bengal. (Calcutta, 1917).

সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর জীবন ও অবদান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি ঃ

১) প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পি-এইচ,ডি
উর্দূ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তাং-১৭-০৫-২০০৫
শিষ্য

২) মাওলানা ওবাইদুল হক, ফাযিলে দেওবন্দ
খতীব, বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।
প্রাক্তন সহকর্মী
তাং- ১৪ মার্চ, ২০০৫

৩) মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার, এম.এম.এম.এ (ঢাকা)
ইমাম ও খতীব, আমীনবাগ জামে মসজিদ, শান্তিবাগ, ঢাকা।
শিষ্য।
তাং- ২৮ জুন, ২০০৫ ।

৪) মাওলানা সালিম ওয়াহীদী, এম.এম
কাযী, সূত্রাপুর, ঢাকা।
তাং- ১২ জুন, ২০০৫ ।

৫) মাওলানা সাইফুল ইসলাম, এম.এম.এম.এ (ঢাকা)
প্রধান, ইসলামের ইতিহাস, মাদরাসায়ে আলিয়া, ঢাকা।
শিষ্য
তাং- ২০জুন, ২০০৫ ।

৬) মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী
প্রাক্তন সদস্য সচিব, শরীআ বোর্ড, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ
শিষ্য।
তাং- ১৮ মার্চ, ২০০৫

৭) মাওলনা হাকীম আযীযুল ইসলাম, এম.এম; ডি.ইউ.এম.এইচ.
অধ্যক্ষ, তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ, উমেশ দত্ত রোড, ঢাকা
শিষ্য।
তাং- ৬ মার্চ, ২০০৪ ।

৮) ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী
এম.এম. (ঢাকা), এম.এ ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী (ঢাকা),
পি-এইচ.ডি (লন্ডন)
শিষ্য।
তাং- ১০জুন, ২০০৫ ।

৯) মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, এম.এম.এম.এফ (ঢাকা)
শিষ্য, তাং- ৩১মে, ২০০৫ ।

১০) আবুল কাসেম, নাতী
তাং-২৯ জুন, ২০০৫।

১১) ডাঃ এরফান উদ্দীন
নাতী
তাং - ২৯ জুন, ২০০৫

১২) হাজী মুজাম্মেল হক
আপন ভাগিনা
তাং- ২৯ জুন, ২০০৫

১৩) সৈয়দ মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ
মানিকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক
তাং - ৩০ জুন, ২০০৫

১৪) শাহজাহান
প্রতিবেশী
তাং - ২৯ জুন, ২০০৫

১৫) ফযলে হালিম মাসুম
বড় পুত্র
তাং - ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০২

১৬) খাইরুল আলম
পান দোকানদার
কায়েৎটুলি
তাং - ২২জুন, ২০০৫

১৭) রহমতুল্লাহ
মুদি দোকানদার
কায়েৎটুলি
তাং - ২২জুন, ২০০৫

১৮) শহিদুল ইসলাম
ঘড়ি মেকানিক
কায়েৎটুলি
তাং- ২২ জুন, ২০০৫

১৯) রফিকুল ইসলাম
চা দোকানদার
কায়েৎটুলি
তাং -২২ জুন, ২০০৫

আলোকচিত্র

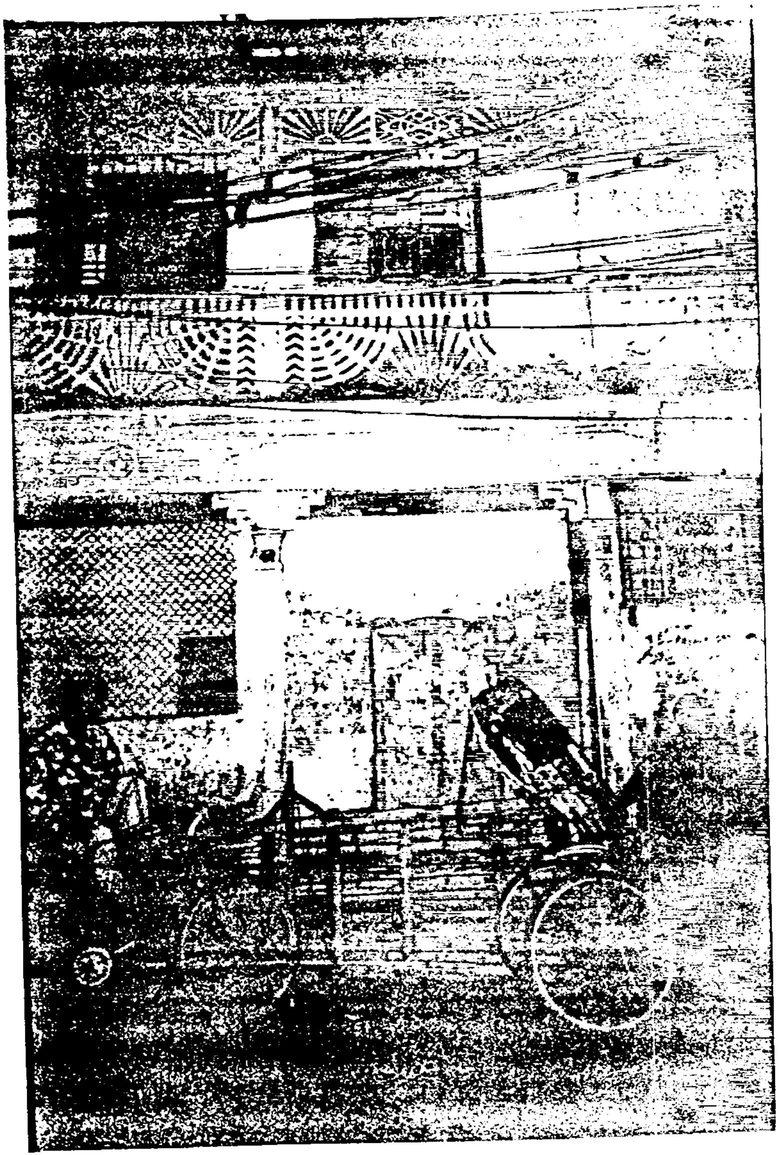

১১নং কায়েতটুলির এ বাড়ীতেই মাওলানা
মমতাযউদ্দীন (রহঃ) শেষ জীবন কাটিয়েছেন

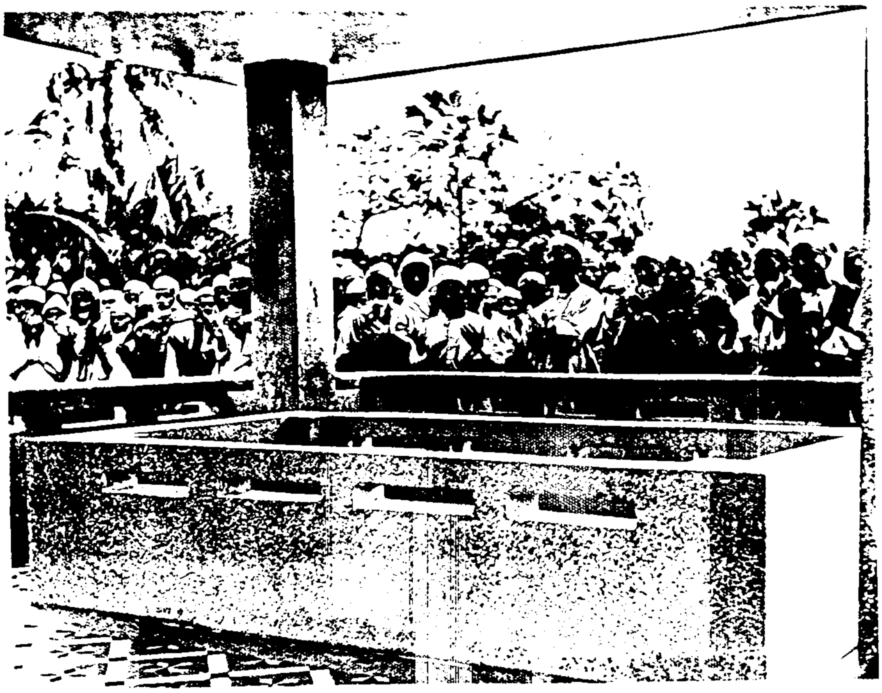

ভক্তদেরকে কবর যিয়ারত করতে দেখা যাচ্ছে

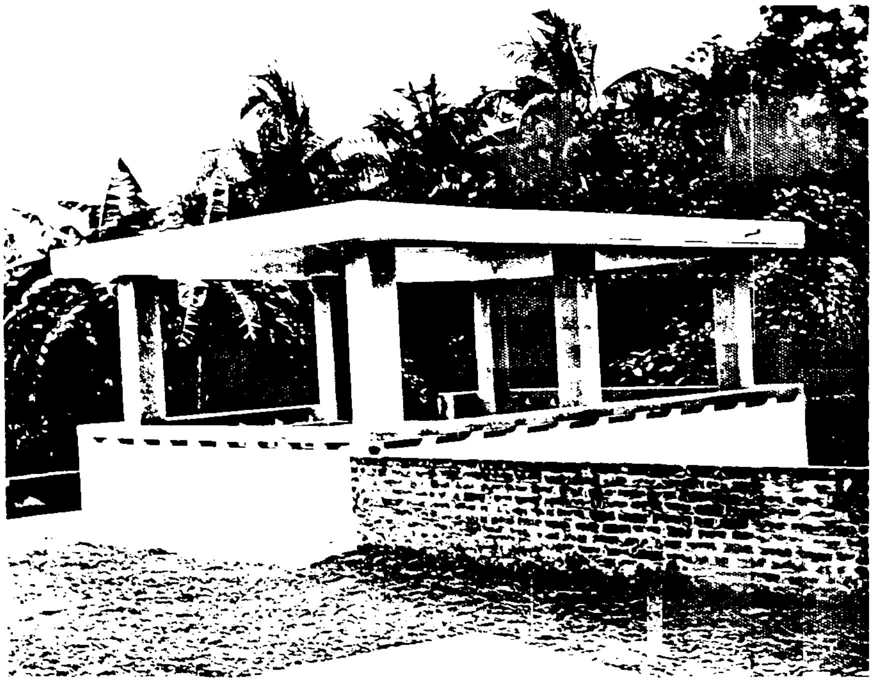

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর রওজা মোবারক

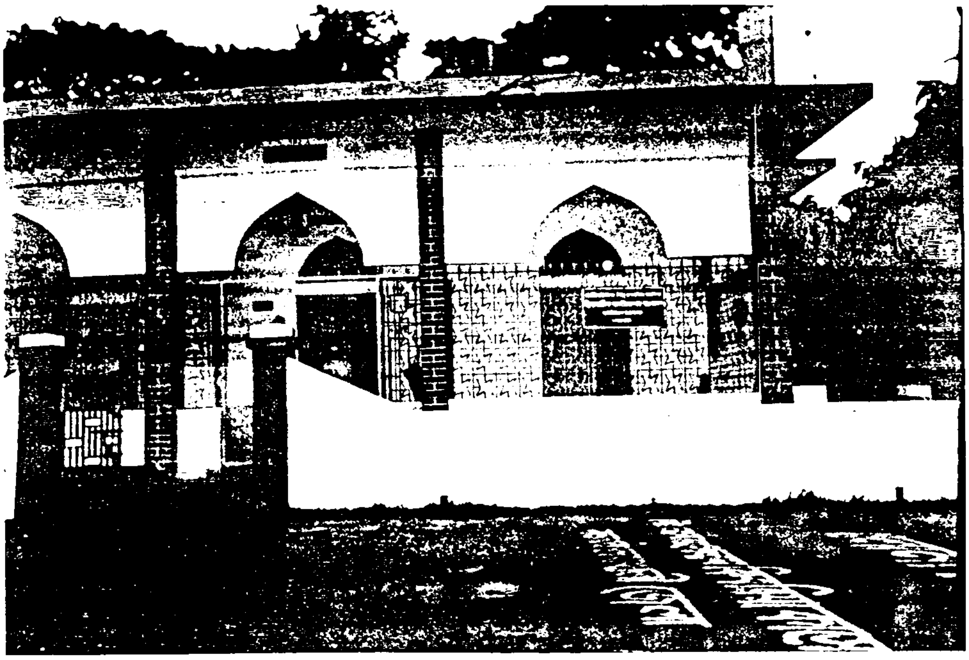

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর গ্রামের বাড়ীর মসজিদ

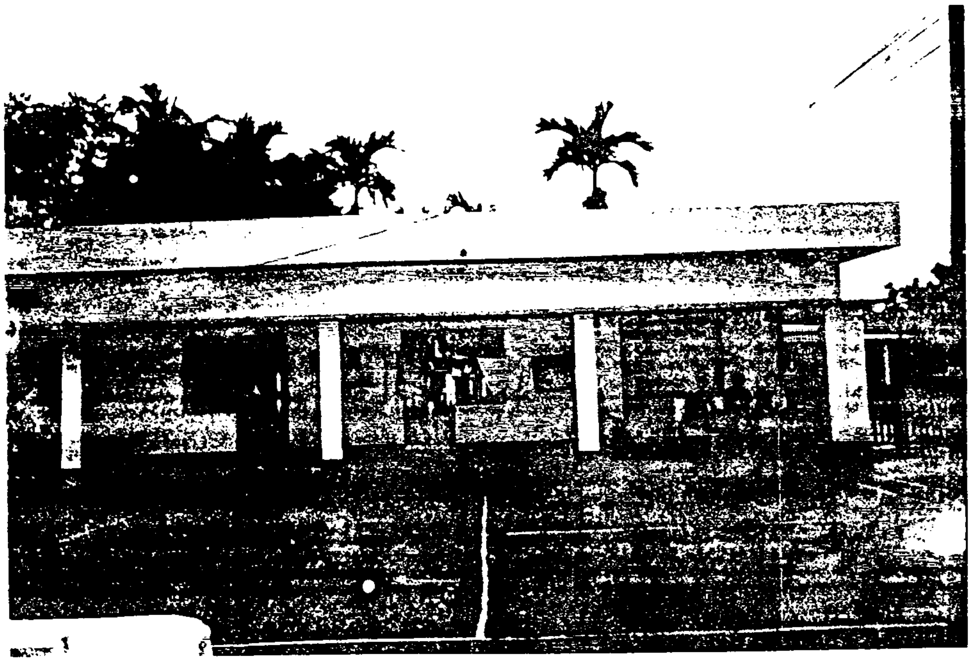

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত মক্তব

মানিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়

মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা

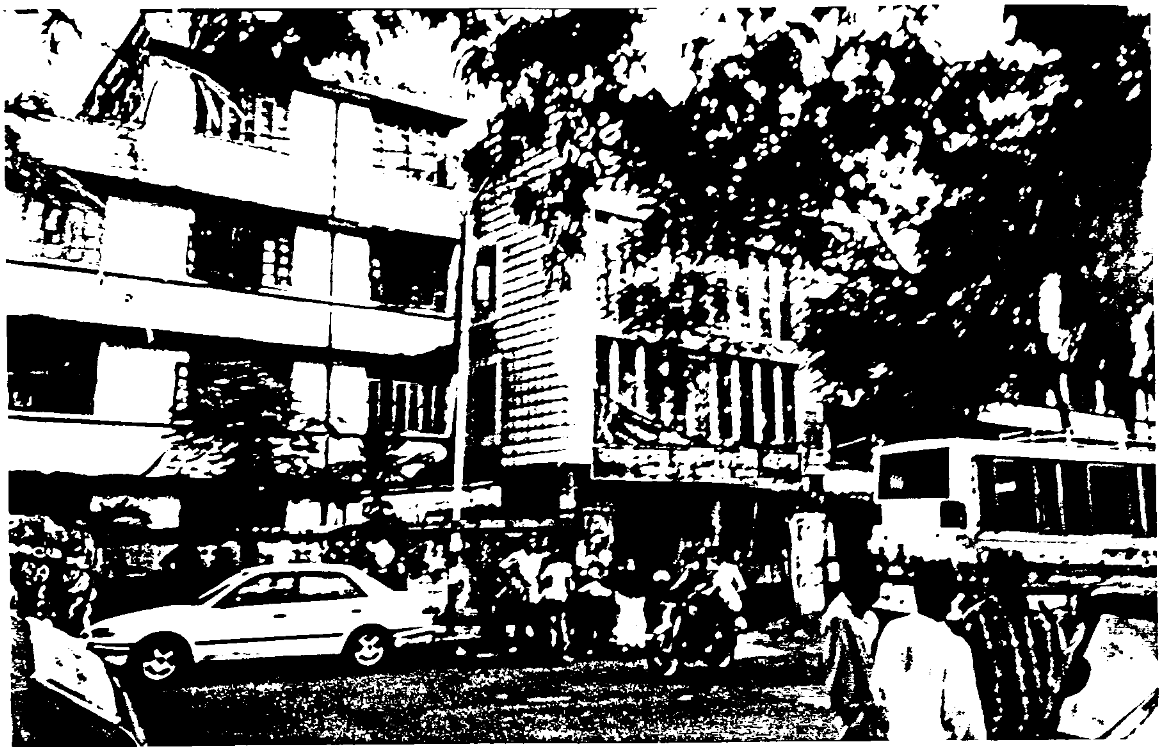

আল্লামা কাশগরী হল, মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা

পরীবাগের শাহ্ সাহেব (রহঃ)-এর মাযার, ঢাকা

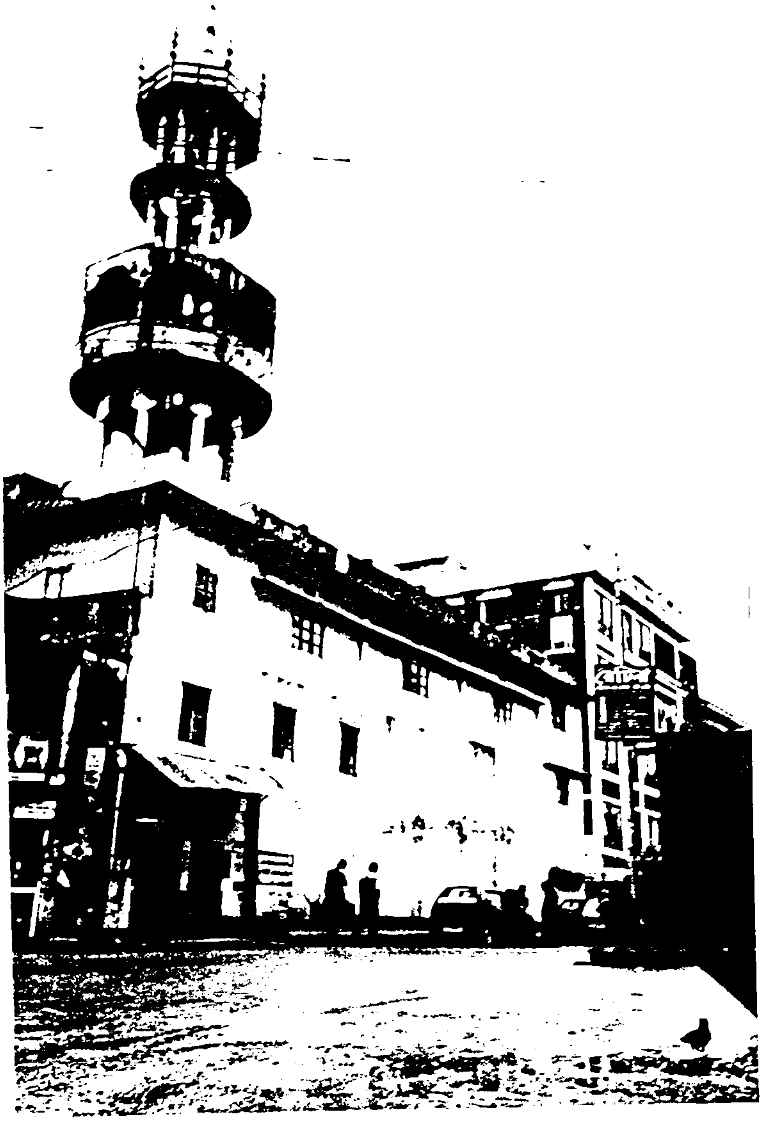

পরীবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা

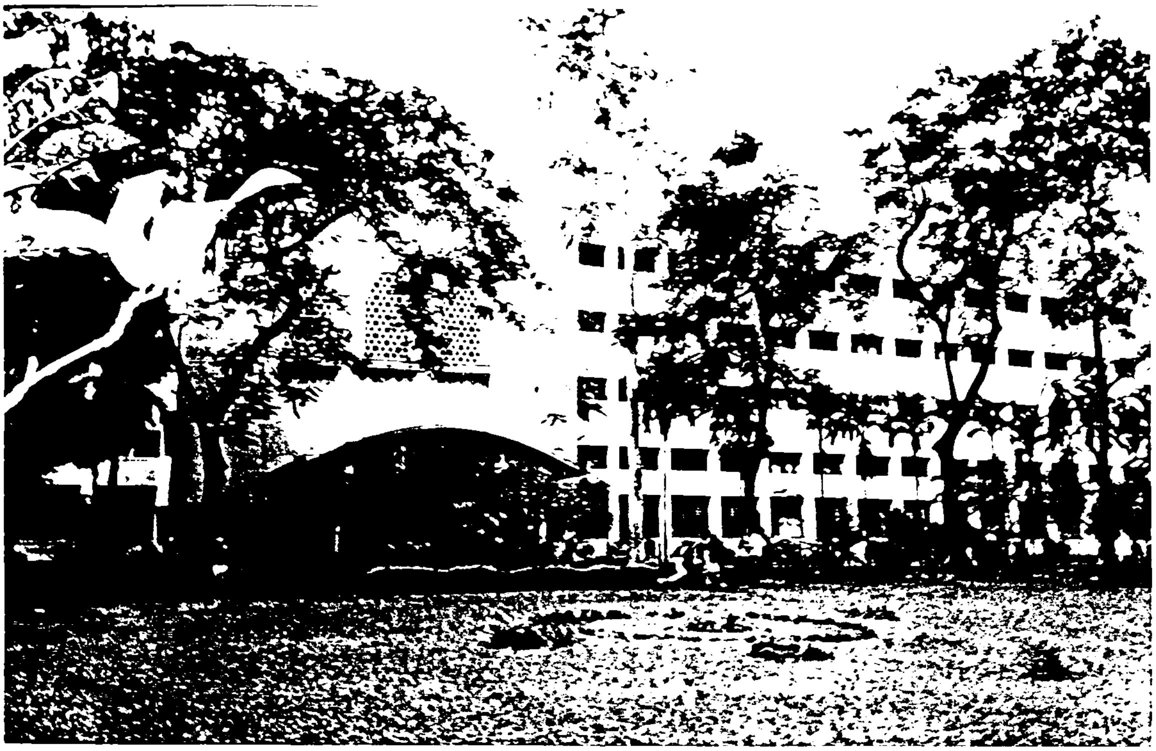

কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

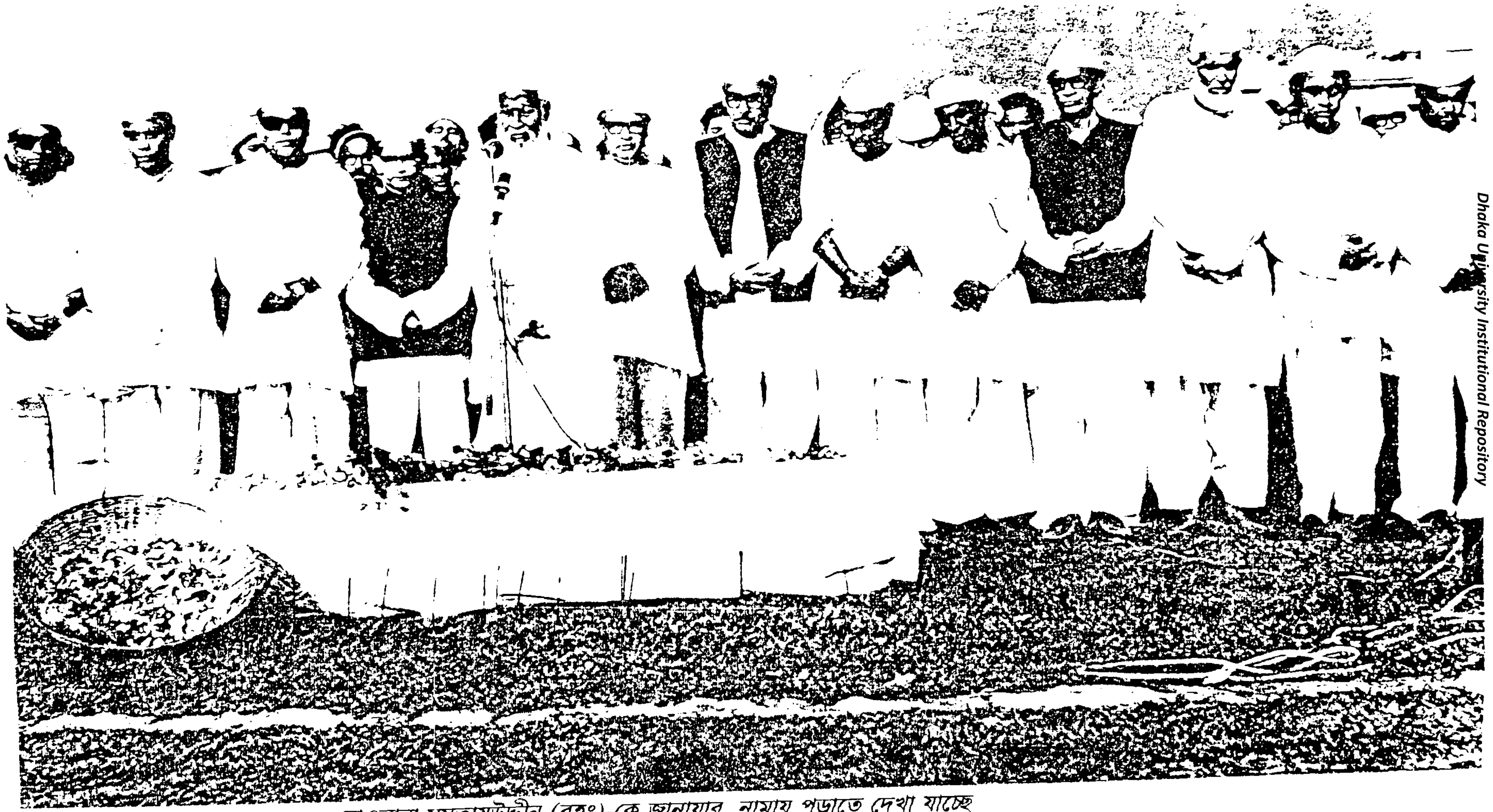

মাওলানা মমতাযউদ্দীন (রহঃ)-কে জানাযার নামায পড়াতে দেখা যাচ্ছে

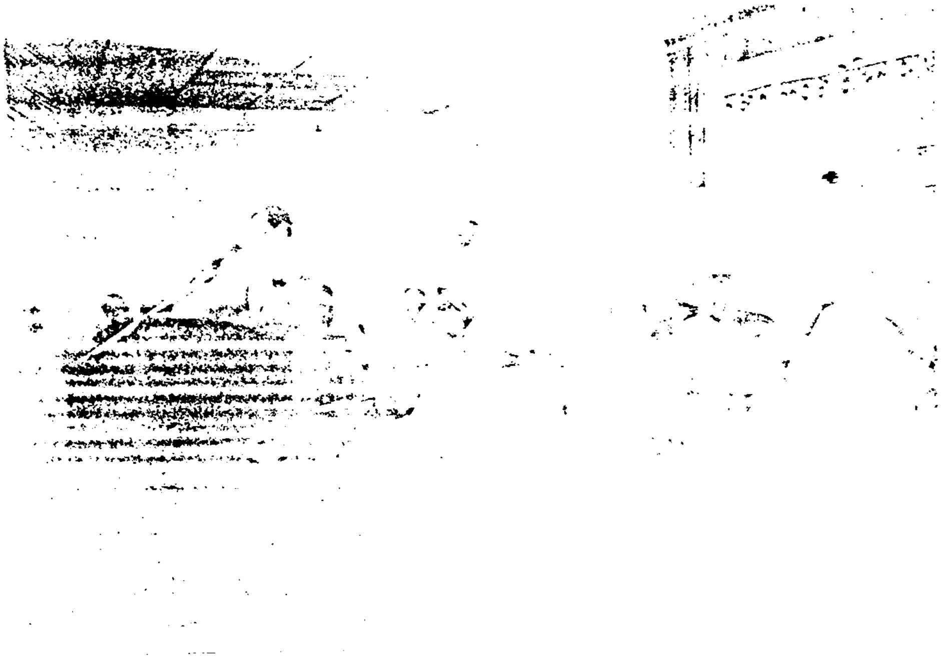

মাওলানা মমতাযউদ্দিন (রহঃ)-এর জীবন ও কর্ম শীর্ষক
সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তাঁর পুত্র
ব্যারিষ্টার মওদূদ আহমদ